দুই সমতল

কার্তিক ভট্টাচার্য



২০৬, কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রকাশক : গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬, কর্ণওআলিশ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর : নির্মল মুখোপাধ্যায়
মালা প্রেস
২৭৫, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

বাঁধাই :
দত্ত বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা-৯

বন্ধুবর শ্রীসুমন্ত ভদ্রের ক্রমাগত তাগিদ ছাড়া লেখাটা শেষ পর্যন্ত যে কিছুতেই শেষ হত না—এ-বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। ঋণটা মুখ ফুটে স্বীকার করা দরকার।

—লেখক

উৎসর্গ

স্নেহাভাজন

মেম সাব'কে

॥ এক ॥

হুড়মুড় করে ট্রেন বে-জায়গায় থেমে গেল। জানালা গলিয়ে মুখ বাড়ালে বাইরের সূচীভেদ্য অন্ধকার ছাড়া বিশেষ কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। তবুও কিছু কিছু অতি-উৎসাহী যাত্রী নেমে কারণ অনুসন্ধান করতে বাকী রাখল না। শংকরের ঘুম ভেঙ্গে গেল,—আচমকা গাড়ি থেমে যাওয়ার প্রচণ্ড ধাক্কায়।

ইতিমধ্যে হুইসিল দিয়ে ট্রেন পুনরায় ছেড়ে দিল। যারা বাইরে নেমে পড়েছিল, তারা তাদের অনুসন্ধিৎসা অগত্যা চাপা দিয়ে উঠে পড়ল কামরায়।

ট্রেন চলতে লাগলো। আধো শোয়া অবস্থাতেই শংকরের দৃষ্টি পড়ল লেবেলের দিকে। চব্বিশ জন বসিবেক। মনে মনে হাসির উদ্রেক হল। যাত্রী কিন্তু অগুন্‌তি। সে শুরু থেকে চড়েছে বলে ঠাঁই করে নিতে পেরেছে এতটুকু। উঃ কিন্তু একী অসহ্য ঝাঁকুনি ট্রেনের!

রাত্রি ভোর হতে চলছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেন শিয়ালদার চাতালে প্রবেশ করবে। তারপর শংকর উঠবে গিয়ে সেই গ্রাম সম্পর্কীয় ডাক্তার কাকার বাসায়। অধুনা গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন—কিন্তু এককালে ছিলেন গ্রামেরই একান্ত একজন, এই আশা। সেখানে ঠাঁই মেলে ভাল নইলে কোন একটা মেস অথবা ডেরা-টেরা যাহোক যোগাড় করে নিতে হবে। শুরু করতে হবে জীবনসংগ্রামের পয়লা অধ্যায়। চাকরি খোঁজা, টিউশানি কি নেহাৎ অন্য কিছু একটা। যেমন আবহমান কাল ধরে—হাঁ আবহমান কাল বৈকি—গ্রামের মধ্যবিত্ত ছেলেরা শহরের তীর্থতটে শুরু করে।

শংকর এই প্রথম গ্রাম ছেড়ে শহরে আসছে। বয়স ষোল-সতেরো; একাদিক্রমে বিদেশ-বাসের চিন্তা করতে কিন্তু এখনও তার কান্না পায়।

হায়! শহরেরা কী নিষ্ঠুর! গ্রামের শ্রেষ্ঠ কুসুমগুলি চয়ন করে নিজের ডালা ভরতি না-করা পর্যন্ত, তাদের কেন্দ্রচ্যুত না-করা পর্যন্ত, তাদের স্বস্তি নেই।

চিরকালের ঘরকুনো ছেলে সে। সে চায়নি তার স্বগ্রাম, স্বজন আর প্রতিবেশীদের ত্যাগ করতে। অথচ তা করতে হচ্ছে—এই তো ট্রাজেডী। পিতার অকস্মাৎ মৃত্যুতে সংসার হাঁ করে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। অর্ধপথে অর্ধশিক্ষা

সম্বল করে, তাকে বেরিয়ে পড়তে হল তাই অকালে—শুধু সংসারের দিকে চেয়ে। কিন্তু তবু কেন এমন হয়! হরিপুরের লোকেদের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাতে হয় গৌরীবেড়ে এসে অথবা গৌরীবেড়েকে হরিপুরে। প্রাণাপেক্ষা ভাল লাগত যে গ্রামকে, তাকে চোখের আড়াল করে, দশপুরুষের মহিমান্বিত ভিটেকে কানা করে—দূর থেকে দূরান্তে, এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটতে হয় পেটের ভাতের সংস্থান করার জন্য—এমন কেন ঘটে! এমন কেন হয় না— কারও তোয়াক্কা রাখতে হবে না, গৌরীবেড়ে যাবে না হরিপুরে। প্রিয়তম পরিচিত পরিবেশ কানা হবে না। সকলের জন্য গ্রাসাচ্ছাদনের কাজ সর্বত্রই হবে সহজলভ্য। তাহলে শৈশবকে নিশ্চিহ্ন করে, গোয়ালপাড়ার জগু পালের পাগলামি-মুখরিত, নিত্য কত না তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা-মহিমায় মহিমান্বিত শান্ত নদীর ধারের আসরটিকে চোখের আড়ালে নিঃসহায় রেখে আজ শংকরকে ছুটতে হত না।

হঠাৎ শংকরের চিন্তা-সূত্র ছিঁড়ে গেল। মনে হল, গাড়ির গতিবেগ হ্রাস হয়ে আসছে। ছোট্ট কি একটা স্টেশনে অবশেষে ট্রেন এসে সত্য সত্যই দাঁড়াল। পাশের ভদ্রলোক ঘাড় ফিরিয়ে বসা অবস্থাতেই পুনরায় নাক ডাকা শুরু করলেন। শংকর উঠে বসল। ধীরে ধীরে দরজার কাছে এসে, স্টেশনে স্টল আছে কিনা ঠাওর করার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন স্টলের অবস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু ধারণা করতে না পেরে একজন রেলের এক চোখওয়ালা লণ্ঠনধারী খালাসীকে জিজ্ঞাসা করল,—চা পাওয়া যায় ভাই এখানে?

খালাসী বলল—যায়, টিশেনে তো নয় বাবু; হুই ওখানে, টিশেনের বাইরে।

শংকর আবার প্রশ্ন করল—গাড়ি থামবে কতক্ষণ বলতে পারো?

খালাসী বলল—দিনের আলোর আগে যে ট্রেন এখান তিকে ছাড়ে বলে তো বুঝি না।—একটু ঢোক গিলে আর একটুখানি কাছে এগিয়ে এল খালাসী। তারপর গলার পর্দাটা খানিকটা খাদে নামিয়ে এনে আস্তে আস্তে বলল—গাড়ি কোথায় কখন আউট লাইন হয়ে যাবে ঠিক আছে নাকি। এখন তো আর সে স্বদেশী হুজুত নেই। এখন হয়েছে হরতালের হুজুত।

—বল কি! আউট লাইন হয়ে যেতে পারে নাকি?

—সে তো পারেই বাবু। সারা লাইনে হরতালের নুটিশ লাগিয়েছে যে সব। সেই জন্যই তো লাইন ইনস্পেক্শান না করে ছাড়বে নি।

খালাসীটি চলে গেল।

শংকর অবশ্য চিন্তা করল না, যে হরতালের নোটিসের সঙ্গে ট্রেন আউট লাইনের সঙ্গত সম্পর্ক থাকার কথা কিনা! শুধু ভাবতে লাগল—এই হরতালীরা তো আচ্ছা। আগেকার স্বদেশীদের মত এরাও তো দেশী লোককে বিপাকে ফেলবার ফন্দি আঁটছে মন্দ নয়।

খুব ছোটবেলায় পিতার মুখে শোনা গল্প মনে পড়ল। তিনি বলতেন তখন নাকি স্বদেশী সব ডাকাতের দল ছিল। আর তাদের শাস্তি দেবার অজুহাতে পুলিসও যেমন সাধারণ ভালমানুষের উপর গোলাগুলি চালাতে কসুর করত না—তেমনি ছিল তারা। একটু উনিশ-বিশ হলেই শায়েস্তা করার জন্য তারাও নাকি সব ভাল মানুষদের ধনদৌলত কেড়ে নিয়ে ফকির করত। অবশ্য ধনদৌলত যাদের আছে।

শংকর বুঝতে পারতো না স্বদেশী আর পুলিসে তফাৎ কি তাহলে। সেই স্বদেশী আর এই হরতালী এরা তবে এক কিসমেরই লোক দেখা যাচ্ছে।

আসলে একটু ভীরু ধরনের ছেলে শংকর। অবশ্য এসবই তার শোনা কথা। তার জীবনে সেই বিয়াল্লিশের পর কোন হৈ হল্লার হদিস পায়নি সে—তার গ্রামে অন্ততঃ। মনে পড়ল অনেক বছর আগে গ্রামের জেলখাটা ছেলে সচ্চিদ মিত্র বলেছিল—শংকর, কংগ্রেসের মেম্বারটা হয়ে যাও। তখন উত্তর করেছিল শংকর বেশ বড় গলা করে, দেখুন সচ্চিদ দা, একটা কথা বলি। আপনারা কেবল মাথা খেতেই আছেন। আমরা গরীব মানুষ। ভবিষ্যতে চাকরি-বাকরি করে খেতে হবে। সরকারী চাকরি যে করতে হবে না তার প্রমাণ কী! আর কংগ্রেসের ছাপ থাকলে এমনি চাকরিই কি মেলে নাকি! আপনারা খেতে দিতে পারবেন তখন?

তখন সে ছেলেমানুষ। তবু তখুনিই সে চাইত না কংগ্রেসে নাম লিখিয়ে তার একুল ওকুল দুকুল যাক। স্কুলের হেড মাস্টার মশায় তো তখন ওসব কথাই বলতেন ছেলেদের।

সচ্চিদ মিত্র ঠাট্টা করে বলেছিল, তাকে হাস্যাস্পদ করার জন্য নিশ্চয়ই, দেখব কংগ্রেসে নাম না লিখিয়েই বা কি রকম খোরাক জোটে।

সে তখন মনে মনে ভেবেছিল ঈশ্বর যদি দিন দেন তবে সে একদিন সচ্চিদ মিত্রকে ডাকিয়ে এর যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেবেই। কিন্তু হায়, তখন কি ঘুণাক্ষরেও জানতো সে, না বুঝতো,—স্বদেশীদের রাজ হবে, সচ্চিদ মিত্রই হবে খোদ সরকারী লোক। তাহলে সে নির্ঘাত সেদিন কংগ্রেসের মেম্বার হয়ে যেতো। হায় রে, সচ্চিদ মিত্রকে জুতসই উত্তর দেবার দিন আর তার আসবে না।

শংকর প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়াল। গেট পার হয়ে বাইরের দোকানে চা পান করবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু গেটে এসে শুনল, স্টেশন পুলিস হেফাজতে। অস্থায়ী ভাবে যাত্রীদের প্রবেশ-নিষ্ক্রমণ স্থগিত। পুলিসকে শংকর যে ঠিক ভয় খায় তা নয়—তবে পারত পক্ষে এড়িয়ে চলতে চায়। তাছাড়া ওর একটা ধারণা পুলিস পুলিস—ওদের স্বদেশী বিদেশী হয় না।

দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে কামরায় ফিরে এল শংকর। এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই নজরে এল, পাশের সেই নিদ্রিত ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মের মাঝে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সম্ভবতঃ ফায়ারম্যানের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। ফায়ারম্যান বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। ভদ্রলোকের হাত থেকে একটা জুতোর বাক্স নিয়ে নিঃশব্দে অন্ধকারে মিশে গেল। ভদ্রলোক কামরায় এসে আপন কোণটি অধিকার করে আলস্য ত্যাগ করে ঠিকঠাক হয়ে বসলেন।

শংকর আসন গ্রহণ করতে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ বোধ করছিল। সহসা সম্বোধন করলেন ভদ্রলোক—'তুমি' বললে চটবে না তো! আসলে তো 'আপনি' বলার উপযুক্ত হওনি এখনও। যাবে কোথায়, একেবারে কলকাতায়?

—আজ্ঞে হাঁ।

কিঞ্চিৎ আপত্তি থাকলেও শংকর ভদ্রলোকের 'তুমি' সম্বোধন স্বীকার করে নিল।

সহসা শোনা গেল যে পিছনের গাড়ির দরজা দিয়ে সদ্য নিদ্রোত্থিত কে একজন যাত্রী ঘটি হাতে প্ল্যাটফর্মে নামছিলেন সম্ভবতঃ জলের খোঁজে; তাঁর পথরোধ করে জনৈক কনস্টেবলই হবে বোধ হয় বলছে—গাড়িসে ঘুস্‌না-উৎরানা নেহি চলেগা।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কাঁহে?

—হুকুম হায়।—বলে নিরস্ত করবার সহজ উপায় ধাক্কা সহযোগে অন্দরে প্রবেশ করিয়ে দিল ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক প্রায় ছিটকে এসে পড়লেন।

শংকর বিস্ময় বোধ করে সদ্য-আলাপ-হওয়া ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার মশাই!

মশাই-এর চেহারার মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল। ছুঁচালো করে ছাটা দাড়ি আর গোঁফ-জোড়া। বাঙালীর মধ্যে ওরকম ফ্রেঞ্চকাট গোঁফ-দাড়ির প্রচলন কদাচিৎ চোখে পড়ে। চোখে রিমলেস চশমা। গোঁফে হাত বুলিয়ে নিরুদ্‌বিগ্ন ভাবে বললেন—গাড়ি সার্চ হবে বোধ হয়।

—সব গাড়ি?

—সেইরকমই তো মনে হচ্ছে।

—আমাদের গাড়িও?

—হাঁ গো বাপু হাঁ। তা ভয় পেয়ে গেলে বুঝি তুমি? তোমার ভয় কী। তুমি তো নিরপরাধ।

শংকর রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করলেও বেশ দমে গেল।

—অবশ্য নিরপরাধরা যে সাজা পায় না এদেশে এমন নয়। তবে যারা সাজা পায় তারা সবাই নিরপরাধ নয়। তোমার কী মনে হয়?

—অপরাধ করুক না করুক, একবার সাজা হলে তো সবাই ভাববে অপরাধী বলে।

শংকরের কথা শুনে সজোরে হেসে উঠলেন দাড়ি-গোঁফ। দরাজ হাসি। সহসা শংকরের মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগলো, বলল—আচ্ছা আপনি জানলেন কি করে গাড়ি সার্চ হবে? কনেস্টবলটা তো কিছু বলেনি।

—তুমি কি করে জানলে?

—আমি আপনার থেকে।

—আমিও ধর অমনি আর একজনের থেকে।

শঙ্কা তবু কমল না শংকরের।

ভদ্রলোক এবার অন্যকথা পাড়লেন।

বললেন—নাঃ তুমি পারবে না।

অবাক হয়ে শংকর শুধাল—কী?

—কী আবার! লোকের ভিতরের কথা জানতে হলে সরাসরি কী তাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করতে হয়? আগডুম বাগডুম কত কি বলে মনের কথা টেনে বার করতে হয়। তুমি পারবে না বুঝলে।

শংকর লজ্জিত হল।

—কোলকাতায় বুঝি নতুন যাচ্ছ! দেখো সেখানে দশজনের মধ্যে চলতে গেলে অমন মন আর মুখ বুঝি এক করে নাও! খবরদার, মন আর মুখ এ দুটোকে সম্পূর্ণ আলাদা করে না ফেলতে পারলে তোমার কপালে কিন্তু অনেক দুঃখ ঘটবে ভায়া।

সত্যই কি শংকরকে এত সহজে চিনে ফেললেন ভদ্রলোক! অথবা শংকরকে চেনা অতীব সহজ।

শংকরের মনে হতে লাগল, ভদ্রলোকের ঐ শৌখীন দাড়ি আর গুম্ফরাজির

অন্তরালে কোথায় যেন আছে কি এক বিরাট রহস্য—যা সে উন্মুক্ত করতে পারেনি এটুকু সময়ের মধ্যে। অনেকখানি সময় হলেও যে পারবে এমন নিশ্চয়তাকেও সে প্রশ্রয় দেবার ভরসা রাখে না।

এখন কিন্তু একদিকে পুলিস অন্যদিকে ভদ্রলোক। আগের কালের স্বদেশী অথবা একালের হরতালী এদের কারও সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। কিন্তু এদের সম্বন্ধে তার কল্পিত একটা ধারণা আছে। বাস্তবের সঙ্গে সে ধারণার সম্পর্ক থাক্ বা না থাক্—এই ভদ্রলোককে সেই পদবাচ্য ছাড়া অন্য কিছু বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না তার। কিন্তু মানুষটা তো মন্দ নয়। আর সত্যিই যদি······ সত্যিই বা কেন, একরকম নির্ঘাত—তার সহজাত বুদ্ধি বলছে।

তবে পুলিস আর এই ভদ্রলোক—এই উভয়ের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে উদ্ধারের কোন আশা নেই। সে নিজে দুর্বল। পুলিসের আতঙ্ক থেকে আত্মরক্ষার্থে ভদ্রলোক—আর ভদ্রলোকের আতঙ্ক, সত্যই যদি কিছু থাকে—তা থেকে মুক্ত হতে পুলিসের আশ্রয়—একটাকে তো শিরোধার্য করতে হবে। এখন কোন্‌টাকে সে বেছে নেবে? হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ল শংকর।

শোবার সময় বাইরের একফালি আকাশ চোখে পড়ল। বর্ণ ফিকে হয়ে আসছে। অন্ধকারকে বিদায় দিয়ে প্রভাতের আলো ফুটে ওঠবার বোধহয় আর বিলম্ব নেই। এই অন্ধকারে দিশেহারা মনের আচ্ছন্নতা তবে বুঝি কেটে যাবে। তবে বুঝি দিনের আলোয় সে পথ নির্ধারণ করতে পারবে।

দু'একটা পদধ্বনি শোনা যায় বাইরে। প্রভাত আসন্ন। উনিশশো উনপঞ্চাশের মার্চ মাসের মেঘমুক্ত আকাশের স্বপ্ন বুকে নিয়ে, ভীরু আশঙ্কার ধূলিধূমে আচ্ছন্ন এ রাত্রির অবসান আসন্ন।

॥ দুই ॥

ক্যাপ্টেন বসাক যুদ্ধ-ফেরত লোক। ডিসিপ্লিন রক্ষার দিকে তাঁর কড়া ঝোঁক। বৈকালীন চা-খাবার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি ব্যাপারে টিম্ স্পিরিটকে তিনি ছোট করে দেখতে শেখেননি। বৈঠকখানায় সন্ধ্যার চা-খাবার আর গল্পের আসর জমেছে যেমন জমে প্রত্যহ। ক্যাপ্টেন বসাক নিজে, ভ্রাতুষ্পুত্র অজয়, বেবী আর ক্যাপ্টেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রী উপস্থিত। শুদ্ধমতে পাচক পরিবেশনের কাজে নিযুক্ত।

অজয়কেই আসলে উদ্দেশ্য করে বললেন ক্যাপ্টেন,—যাই হোক বৌদি, অজয় এবার কাজকর্ম শিখুক কিছু কিছু। ডাক্তারিতে দু-দুবার ফেলেরও দাম আছে। —চায়ের বাটিতে চুমুক শেষ করে আবার বললেন—জানি তোমরা বলবে ফেলের আবার দাম! কিন্তু আমি বলি, হাঁ ফেলের দামটাও ফ্যাল্‌না নয়। অভিজ্ঞতা তো আর কেউ কেড়ে নিতে পারে না!

বৌদি জবাব দিলেন—তা কাজকর্ম শিখতে হবে বৈকি। আমি বলি কি ঠাকুরপো, পড়ল আবার কাজকর্মও শিখল।

—এদিকে এই হচ্ছে বাজার। দেশের লোকের দেশী ব্যবসায়ের উপর এসেছে একটা ভয়ানক ঝোঁক। যার জন্য আমেদাবাদেই আর কাপড়ের মিলগুলো সীমাবদ্ধ হয়ে থাকছে না। কাপড়ের চাইতে বাঙালী অবশ্য ওষুধের ব্যবসা বোঝে ভাল! কিন্তু শুধু বুঝলে তো হবে না। বাজারে বিলেত আর হালে আমেরিকার মত প্রতিদ্বন্দ্বী। সেদিক থেকে আমেদাবাদওয়ালাদের ময়দান ঢের ফাঁকা। আর শুধু কি তাই? নির্ভরযোগ্য একটা ওষুধ তৈরি করবার চেষ্টা করতে হলেও বিলেতের পানে আজও হাঁ করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই—মালমসলার জন্যে। কেবল পেটেন্ট আর পেটেন্ট। ফ্যাসাদ কি একরকম।

অজয় একটা টোস্ট মুখে পুরতে পুরতে বলল—তা আমাকে এখনই কেন এসব ফ্যাসাদের দায়ে ফেলতে চাচ্ছেন। এখন কিছুদিন একটু মুক্ত থাকতে চাই।

—ফ্যাসাদের দায় বইবার ক্ষমতা যখন হবে সে তখনকার কথা। আপাততঃ মুক্ত থেকেই আমার সঙ্গে ঘুরে পার্টিদের সঙ্গে পরিচয়-পরিচিতিগুলো করে রাখতে দোষ কী।

বেবী তার খুলে আসা খোপা বাঁ হাতে একটু চেপে বসিয়ে চায়ের বাটি শেষ করল।

—তোমাদের কারবারের কথা তো চিরকালই আছে কাকা। আমি এলাম, এবার একটু অন্য কথাবার্তা হোক।

ক্যাপ্টেন বসাক গম্ভীর হলেন।—অন্য কথাবার্তা কিই বা আছে বলার আর আমি ওসব বুঝিও না বিশেষ। বরং তোরা বল্ আমি শুনি।

অজয়ের দিকে সহসা মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে অজয়, কাল থেকেই আপিসে যাওয়া শুরু করছো কি বল।

অজয় তখন আগামী কালের অন্য একটা সামাজিক এমগেজমেন্টের কথা চিন্তা করছিল। চিন্তিতস্বরে বলল—আচ্ছা, পরশু থেকে হলে হয় না?

ক্যাপ্টেন বসাক বাঁকা চোখে চাইলেন।

—তার চেয়ে বল তোমার ভাল লাগে না। বেশ করো ঐ হাতুড়ে ডাক্তারি জীবনভোর। ওই আছে তোমার কপালে লেখা।

—না, মানে—অজয় একটু ঢোক গিলল।

—মানে-টানে নয়—গর্জন করে উঠলেন ক্যাপ্টেন।—বিজ্‌নেস্‌ হচ্ছে বিজ্‌নেস্‌। নাউ অর নেভার।

ক্যাপ্টেনসুলভ ধমককে সকলে সমীহ করে। অজয়ের আপত্তি কর্পূরের মত উবে যেতে পথ পায় না।

গলার খাদ পরিবর্তন করে স্বাভাবিকতায় এনে দাঁড় করিয়ে বেবীকে শুধালেন—বল বেবী, তোমার শ্বশুরবাড়ীর খবর।

—শ্বশুরবাড়ীর আবার খবর কী! আমি বলছিলাম, আমি একটা অনুষ্ঠান করতে চাই।

—কোয়াইট ইয়োর বিজ্‌নেস্‌।—ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ালেন তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে। বেবী চুপ্‌সে গেল। বেয়ারা ঠিক এই সময়ে একটা স্লিপ এনে হাতে দিল।—এক বাবু আয়া।

চিঠিখানা উল্টে-পাল্টে দেখলেন বসাক। শংকর গোস্বামী।—কে শংকর গোস্বামী—বোলাও—বেয়ারাকে হুকুম করলেন।

শংকরকে সঙ্গে করে বেয়ারা প্রবেশ করলো। এত জাঁক-জমকওয়ালা বাড়ীর অভ্যন্তরে শংকর বড় বেশী প্রবেশ করে নি। আশঙ্কায় তার মুখ ফ্যাকাসে, পদদ্বয় কম্পিত। সে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে বসাক হাঁকলেন—কী চাই তোমার?

হাত বার করে একখানা চিঠি অত্যন্ত কষ্টে ক্যাপ্টেনের হাতে দিল শঙ্কর এবং যা বলতে চাইল, তার পরিবর্তে বেরিয়ে এল ইচ্ছার বিরুদ্ধে—মা-মা-মানে…।—অর্ধপথে কথা ফুরিয়ে গেল।

চিঠি পড়লেন ক্যাপ্টেন এবং বললেন বৌদিকে

—দেখ বৌদি, দেশের লোক, আলাপ করে দেখ। আমার অপেক্ষা করার অবসর নেই।—শংকরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন—তুমি বস, এদের সঙ্গে আলাপ কর।

ক্যাপ্টেন বসাকের মত বলিষ্ঠ চেহারা এত অধিক বয়স অবধি খুব বেশী লোকের দেখা যায় না। লম্বায় সাড়ে ছ ফুট। বিস্তৃতিও দৈর্ঘ্যানুপাতিক।

মাথায় কাঁচাপাকা চুল। ঠোঁটে একটা উদ্ধত পৌরুষের অভিব্যক্তি। পৌরুষই হচ্ছে পুরুষকে সুন্দর করবার শ্রেষ্ঠ উপাদান। অতি ত্রস্ত বসাক স্থানত্যাগ করলেন। তার শক্ত জুতার ধমকে মেজে কেঁপে উঠল। সকলে জানল ক্যাপ্টেন বসাক যাচ্ছেন। তাঁর ভাবভঙ্গীতে তিনি কখনই বিস্মৃত হন না যে তিনি যুদ্ধ-ফেরত মিলিটারী ডাক্তার। প্রথম মহাযুদ্ধের ডাক্তার ছিলেন তিনি। সে আমলে যুদ্ধে-যাওয়া বাঙালী খুব অল্পই ছিল। তাই ক্যাপ্টেন বসাক মুহূর্তের জন্য এমন বে-হুঁশিয়ার হন না, কাজে কর্মে চলায় চলতিতে—যাতে কেউ অসামরিক মামুলী ব্যক্তি বলে তাঁকে গ্রহণ করে।

শংকর ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। এই একমাত্র বাড়ীই তার সম্বল, আশ্রয় লাভের ভরসা। বিমুখ হলে অরণ্য হতেও দুর্গম নগরীর কোথায় যে নিজেকে সে নিয়ে যাবে জানে না। বুক ঢিপ ঢিপ করছে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে সে। এই সামান্য তিনটি মানুষ ঠিক তারই মত হাত-পা-দেহ-কথাবার্তা বিশিষ্ট সামান্য তিনটি মানুষ। অথচ কী দুর্জ্জেয় আর অসামান্য ক্ষমতারই না মালিক ওরা। একটা লোককে ইচ্ছে করলে রাস্তায় দাঁড় করাতে পারে, ইচ্ছে করলে আশ্রয় দিয়ে, দাঁড়াবার অধিকার দিয়ে ভবিষ্যৎ নিঃশঙ্কও করে তুলতে পারে।

হিরণমালা বিধবা। তাই শুধু চা খাচ্ছিলেন। সামরিক নিয়ম পালন করতেই হবে। জবরদস্ত দেবর। কাঁটায় কাঁটায় বিকেল পাঁচটায় খাবার টেবিলে জড়ো হতেই হবে যে যেখানে থাকো। তবে সনাতন ধর্ম প্রাণের সঙ্গে মিশে আছে হিরণমালার। আবাল্য এই পরিবেশে বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে, একটা খুঁতখুঁত-করা সংস্কার অন্ততঃ দাঁড়িয়ে গেছে চেতনার মধ্যে—তাই মাত্র চা। আর ঔষধার্থে সুরাং পিবেৎ—অতএব চা-এ দোষ হয় না আজকাল। নির্জলা একাদশীতে পণ্ডিতেরা আজকাল চা-পানের বিধি দিয়ে থাকেন। তাছাড়া সত্যিই তিনি নিষ্ঠাবতী, শুদ্ধাচারিণী; কৃচ্ছ্রসাধনে দস্তুরমত বিশ্বাস রাখেন।

হিরণমালা তাঁর জননীসুলভ কণ্ঠের কোমল ধ্বনি উচ্চারণ করলেন, যেন কোন তারের বাদ্যযন্ত্রের কোন একটা বিশেষ মিষ্টি পর্দা থেকে উৎসারিত সে স্বর; —তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাছা, বোস।

ভয়ে ভয়ে বসল শংকর। এক একটা মানুষ থাকে প্রথম দৃষ্টিতেই যাদের আত্মীয় বলে মনে হয়। হিরণমালাকে দেখে অমনিই মনে হলো শংকরের কিন্তু ভরসা পাচ্ছিল না মেয়েটা আর ছেলেটাকে দেখে। ওরা শহরের চাঁছা-ছোলা ছেলে-

মেয়ে। ওদের প্রখর জড়তাহীন দৃষ্টিতাপের কবল থেকে সে যেন লুকিয়ে থাকতে পারলেই বাঁচে।

—তুমি সুগন্ধি থেকে আসছো?

—আজ্ঞে। —নখ খুঁটতে খুঁটতে উত্তর দিল শংকর।

ডানহাতের কাপটি টেবিলে রেখে, বাঁ হাতে চিঠি পড়ে বললেন,—ও তুমি শৈলীর ছেলে!

শংকর মাথা নাড়ল।

পুরানো সব কথা ভিড় করে উঠতে লগল হিরণমালার মনের মধ্যে। চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল সেইসব দিনগুলি যখন তাঁরা গ্রামে থাকতেন। দেশ গাঁ ছেড়েছেন, বাপ রে বাপ, সে কতদিন! সেই আটাশ সাল! ক' যুগ!

—পুরুত ঠাকুর তোমার বাবা। এই তো সেদিনের কথা যেন—তোমার মাকে যে বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলাম। শৈলীও বোধহয় বুড়ী হয়ে উঠেছে, না?

শংকর কোন জবাব দিল না। শুধু দেওয়ালের মূল্যবান বিভিন্ন তৈলচিত্রগুলির দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে লাগল। অজয়ের গোঁফের তলায় চাপা দুষ্টুমির হাসি চিক্ চিক্ করে উঠল। মাকে উদ্দেশ্য করে বেবীর পানে তাকিয়ে কথা ছুঁড়ল—মার দেশের লোক বুঝি? তাই বল।

শংকরের কানে গেল কথাটা। সামান্য কথা। অথচ ঐটুকুতেই সংকুচিত হয়ে পড়ল সে। কোথায় যে নিজেকে সরিয়ে রাখবে ভেবে পেল না।

সে পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের ছেলে। শহর বন্দর, বিশেষ করে কলকাতার পয়সাওয়ালা ঘরে হয়ত বা সে পাঙ্‌ক্তেয় বলে গ্রাহ্য নয়।

এই ধরনের একটা অদ্ভুত ধোঁয়াটে ধারণা তার চিন্তায় সর্বক্ষণ এমন প্রভাব বিস্তার করে থাকে যে স্থানবিশেষে সামান্য সহজ কথাটাও আর সহজ বলে মনে হয় না। তাই এদিক থেকে সে বেশ একটু স্পর্শকাতর।

শংকরের আরক্তিম মুখ দেখে হিরণমালা বুঝে নেন—শংকরের অসুবিধাটা কোথায়। মা যেমন বোঝেন নিমেষের মধ্যে সন্তানের কী আর্তি।

একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—অজয় আর বেবী, তোমরা দুটিতে একটু যাও তো এখান থেকে।

অজয় দূর থেকে মুচকি মুচকি হাসি অব্যাহত রেখেইবললে—কী হলো আবার!

—আমি যা বললাম শোন, যাও।

পুরোপুরি হেসে ফেলল অজয় অকপটে। তারপর চলে গেল।

বেবী শুধাল—আমিও? চোখ তার শংকরের সোনালী দুটো চোখের দিকে।

—হাঁ তুমিও।

বেবীও চলে গেল অগত্যা।

এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল শংকর। কোন রকম সংকোচের অনুভূতি হিরণমালার সামনে তাকে আর অবশ করল না। যা কিছু সমস্যা এঁর সামনে যেন স্বচ্ছন্দে বলা যায়।

হিরণমালা বললেন—শহরের ছেলেমেয়েরা অমনি ঠোঁটকাটা বাছা। ওতে তুমি ব্যথা পেও না। ওরা তো আর তলিয়ে দেখে না যে ওদের সাতপুরুষও ঐ দেশের লোক। ওরা কিছু ভুঁইফোঁড় নয় এখানে।

ইতিমধ্যেই হিরণমালা কেমন যেন মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন শংকরের প্রতি। কোন রকম ভণিতা না করেই বলে ফেললেন—তুমি আমায় 'জেঠাইমা' ব'লো। তোমার মা আমায় 'দিদি' বলতেন তো। তা তোমার বাবা হঠাৎ মারা গেলেন কি অসুখে?

—হঠাৎ পেটের ব্যারামে, আমি সবে ক্লাস নাইনে পড়ছিলাম।

—পড়া লেখা বুঝি আর হলো না তারপর? আ-হা-হা, কচি ছেলে! কটি ভাই-বোন তোমরা?

—তিন।

—তুমিই বড়?

শংকর বিনীতভাবে মাথা নীচু করল।

মমতা উপছে পড়ল হিরণমালার দৃষ্টিতে। অপরিণত এই তরুণের ম্লানমুখের পানে চোখ নিবদ্ধ করলেন খানিকক্ষণ। আর অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। সদ্য-ওঠা কচিঘাসের মত নরম দাড়িগোঁফের চুলগুলিতে সবে কালো রং ধরতে শুরু করেছে। চুলের রং ঈষৎ লালচে। ভাসা ভাসা চোখের সোনালী রঙের তারায় হরিণের মত সন্ত্রস্ত চাউনি।

ঠিক এমনিধারা আর একখানি মুখের ছবি যেন ভেসে উঠছে মনের মধ্যে। মায়ের মনে সন্তানশোক বোধহয় কখনই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় না। নয়ত তাঁর ছোট ছেলে সঞ্জয়কে তিনি হারিয়েছেন সে কি আজকের কথা! সবে তার সাত বছর বয়স তখন। একরকম আদল আর সেই অদ্ভুত সোনালী চোখ। তাঁর সঞ্জয় বেঁচে থাকলেও এতদিনে ঠিক এতবড়টিই হত তাহলে?

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাকালেন অন্যদিকে।...অথবা এক একটা ছেলের কেমন একটা লাবণ্য থাকে যা নারীমনে মাতৃত্বের মঞ্জুরি অকারণে নাড়া দেয়। আর তাকে আপন করবার নানারকম ছল খোঁজে মন।

কিছুক্ষণ পরে সুপ্তোত্থিতের মত ধীরে ধীরে বললেন—তা এখানে আমার কাছে থাকবে, এ তো তোমার দাবি। এখন তুমি বড় ক্লান্ত। বাড়ী খুজে খুঁজে হয়রান হতে হয়েছে নাকি খুব? নতুন লোক তুমি!

শংকর তার স্বাভাবিক লাজুকতা বশে অবশ্য সত্য গোপন করল। পুনরায় বললেন হিরণমালা—হাঁ তাই ভাল। তুমি বিশ্রাম করে নাও। কিছু খাওয়া-দাওয়া করে পরে কথাবার্তা বলা যাবে'খন। কেমন?

চাকর ডেকে খাবার আনতে পাঠালেন তিনি। আর বললেন উঠে দাঁড়িয়ে—এসো আমার সঙ্গে সঙ্গে। তোমার ঘর দেখিয়ে দিই।

শংকরকে ঘর দেখিয়ে দিলেন হিরণমালা। তারপর ফিরে এলেন। বেবী ঘুর ঘুর করছিল এ ঘরে। মাকে দেখে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা মা, সঞ্জুকে মনে পড়ে তোমার?

অন্যদিন হলে নাটকীয় ভাবে একথা উত্থাপিত হওয়ায় অবাক হতেন হয়ত। আজ হলেন না। কারণ পারলে তিনি ঐ কথাটাই সবাইকে জিজ্ঞাসা করে যাচিয়ে নিতেন আজ।

কিন্তু মনের ভাব গোপন করার জন্য মুখে রুক্ষতা আনলেন। ছেলেমেয়ে দুটোকে একদিক দিয়ে খানিক ভয়ই করেন তিনি। মনের দুর্বলতাগুলো জানতে পারলে ওরা বড উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করে তাঁকে।

বললেন—না।

হেসে ফেলল বেবী মায়ের বলার ধরন দেখে। বলল—ভাল করে তোমার দেশের ছেলেটির চোখের তারার দিকে তাকিয়ে দেখো তো? আমার কিন্তু বারবার সঞ্জুর সেই সোনালী চোখ দুটোর কথা মনে পড়ছিল মা।

হিরণমালা এক বিচিত্র ভঙ্গী করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। আর বেবী সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল করুণ ভাবে। সঞ্জু ছিল তার চার পাঁচ বছরের ছোট—দিনরাতের খেলার সাথী। তারও চোখে আজ সঞ্জুর সাথে শৈশবের পুতুল খেলার দিনগুলির স্বপ্ন সজল হয়ে উঠছিল কিনা কে জানে!

শংকর আস্তানা একটা পাবে ভেবেছিল। কিন্তু কল্পনাও করেনি—অভ্যর্থনা এত বেশী হবে। সে কেবল চিন্তা করছিল এ বাড়ীর ছেলেমেয়ে দুটোর কথা।

ওদের কাছে তো আর এরকম অভ্যর্থনা আশা করা সমীচীন নয়! এই নতুন জেঠাইমার অনুপস্থিতিতে সে তবে তাদের সামনে স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে তো! ওদের সামনে তার অন্তরের ভীরুতা আর কেমন একটা কাঙালপনা বড় নগ্ন হয়ে ওঠে যে নিজের কাছে। একটুখানি সান্নিধ্যেই তা সে বেশ অনুভব করেছে।

॥ তিন ॥

কেউ জানত না মনে মনে বিরোধটা চলছিল কত দিন থেকে। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় দুই মা পাশাপাশি দুই ছাদ থেকে যখন ছেলেমানুষের মত ঝগড়া করে ফেললেন প্রকাশ্যে, তখন সীতা কিম্বা রঞ্জিত কারো আর প্রকৃত ঘটনা বুঝতে বাকী রইল না। ফলে কেউ আর পুরানো সহজ দৃষ্টিতে কারো দিকে যেন তাকাতে পারল না চোখ তুলে। অনারারী শিক্ষাদাতা ও ছাত্রী উভয়েই নীচে ঘরের মধ্যে বইএর পাতা উল্টাতে উল্টাতে কাঠ হয়ে ঘামতে লাগল। প্রথমে রঞ্জিত ঘটনাটা উড়িয়ে দিতেই চাইল কিন্তু পারল না। কারণ ওদের মেলামেশার একটা নতুন অর্থ এর পর থেকে মনে বড় প্রকট হয়ে উঠল।

সীতার দাদা বঙ্কিম ছিল তার বন্ধু। মতবাদে মতান্তরই ছিল তার প্রবল। কিন্তু সেজন্য মানুষ বঙ্কিম কোনদিন ছোট হয়নি তার চোখে। পরন্তু বঙ্কিম যে পরিবারের ছেলে সে পরিবারের প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ তাকে সেদিন উদ্বেল করে তুলেছিল। সেই সূত্রেই ওদের পরিবারের সঙ্গে পরিচয়। এবং পাড়ার নতুন বাসিন্দা হয়েও এত অল্পদিনে এতখানি ঘনিষ্ঠতা।

মেলামেশা বলতে সীতার পড়াশুনায় সে নিয়মিত সাহায্য করত। এটা যে মায়ের বিরোধের বিষয় হয়ে উঠতে পারে কখনও এবং সে বিরোধ এরকম রুচি-বিগর্হিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে—একথা স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

সংসারে বাস করে, তার ক্ষুদ্রতা আর তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার সঙ্গে পাশাপাশি দিনাতিপাত করেও দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতা ও হীনতা ছাত্রজীবনে কদাচিৎ বড় হয়ে চোখের উপর আসে। কারণ ছাত্রজীবনে প্রায়ই সে অবসর সংকীর্ণ।

সকালে নিজের পড়াশুনা। দুপুরে কলেজ। সন্ধ্যায় ছাত্র আন্দোলনের সতীর্থদের সঙ্গে হৈ চৈ আর বঙ্কিমের সঙ্গে রাজনীতির তর্কের আসর জমানো। এই তো দিনের ধরাবাঁধা রুটিন।

বঙ্কিমের নামে পুলিস ওয়ারেণ্ট বেরুতে সে ফেরার হয়েছে সেই মার্চেরও দু মাস আগে। তাই ইদানীং সে খাতের সময়টা প্রায়ই ব্যয় হয় সীতার অনারারী শিক্ষকতার কাজে।

ঘটনায় অবশ্য সীতাই বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল বেশী। ঘটনার অর্থ অনুধাবন করতে গিয়ে আরও বেশী বিপর্যস্ত বোধ করতে লাগল। এর চাইতে অর্থ বুঝবার বুদ্ধি-শুদ্ধি যদি তার লোপ পেত—সে যেন রেহাই পেত।

বয়স কম বলে নারী হিসাবে আত্মসম্ভ্রম বোধের চেতনাটা তার নতুন। আর নতুন বলেই বোধহয় অত্যুগ্র। মনটাও তাই অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। ফলে সেই থেকে আত্মদাহী দুস্তর একটা অপমান-বোধ ভিতরে ভিতরে খুব বেশী পেষণ করছিল তাকে। দাহটা তত বাড়ছিল যত উপলব্ধি করছিল—কিল খেয়ে কিল চুরি করা ছাড়া এ ধরনের অপমানের কোন প্রতিকার নেই মেয়েদের।

রঞ্জিতের কাছে পড়তে বসে কিছুতেই পড়ায় মনঃসংযোগ করতে পারল না।

কিছুক্ষণ অস্বস্তিতে উসখুস করে একবার শুধু বলল অত্যন্ত নিস্তেজ কণ্ঠে—কি ছেলেমানুষী কাণ্ড বলুন তো মায়েদের?

তারপর নিজের উত্তেজনা নিঃসরণের ক্লান্তিতে কেমন যেন ঝিমিয়ে চুপ হয়ে গেল।

উভয়ের নিকট উভয়ের নতুন একটা না-দেখা দিকের আবরণ সহসা এমনভাবে উন্মুক্ত হয়ে গেল আজ যে ঘরের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

মাঝখানে বইকে সাক্ষীগোপাল রেখে দুধারে দুজন চুপচাপ বসে রইল খানিকক্ষণ।

এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য এরপর এক সময় সীতা বীজ-গণিতের সমীকরণের অধ্যায় সমাধানের জন্য বই আর খাতা এনে হাজির করল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ বোঝা গেল—এ জিনিসও জমবার অনুকূল নয়। অতঃপর রঞ্জিত অবরুদ্ধ আবহাওয়াকে হালকা করে তোলবার চেষ্টায় মনোনিয়োগ করল একটা কৌতুকাত্মক গল্প নিয়ে। খানিকটা কৌতুকাত্মক ভণিতা দিয়ে মুখবন্ধ সম্পন্ন করে শুরু করল—দেখ সীতা, যখন কলেজে ভরতি হই প্রথম, তখন বেশ লাগত কিন্তু। সদ্য স্কুল থেকে বেরিয়ে সেই স্কুলের নীচু ক্লাসের ছেলেগুলোর নাকের উপর দিয়ে একটি মাত্র খাতা আঙ্গুলে ঝুলিয়ে চলতে বুকটা ফুলে উঠত, ঠোঁটে জাগত একটা তাচ্ছিল্যের মুচকি হাসি। ওদের পানে চাইতাম তেরছা করে। ভাবে ভঙ্গীতে ওদের যা বলতে চাইতাম সেটা হচ্ছে—বালক, বালক, নেহাৎ শিশু তোরা।

সীতা ঈষৎ হাসল ; বলল—তা আসল কথাটা কী বলে ফেলুন চটপট্ করে।

—আসল কথাটা হচ্ছে, এই যে মায়েরা—এঁরা বালিকা, বালিকা ; নেহাৎই শিশু এঁরা।

সীতার ঈষৎ হাসি খিল খিল করে হেসে ওঠায় রূপান্তরিত হলো—এই কথা!

কপট গাম্ভীর্যের ভান করে রঞ্জিত বলল—শুধু এই কথা নয় আরও আছে। তারপর যেন তার অসমাপ্ত কাহিনী পুনরায় শুরু করবার ভঙ্গীতে বলা আরম্ভ করল, —তারপর যেদিন কলেজে প্রথম গেলাম, সেদিন প্রথম ক্লাস নিলেন কেমিস্ট্রির অধ্যাপক মশাই। আর কোন বক্তৃতা বা কথা বলার আগেভাগেই খানিকটা ম্যাজিক দেখিয়ে নিলেন। এই যেমন রসায়ন শাস্ত্র মাফিক নীল জল লাল, লাল জল হলুদ ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করা। আমরা তন্ময় হয়ে ম্যাজিক দেখলাম আর ভাবলাম—এ কী কাণ্ড রে বাবা! এলাম পড়তে, দেখছি ম্যাজিক। কেমিস্ট্রিও যে বকলমে ভোজবাজি তা তো আর জানি না তখন। হাঁ তারপর ম্যাজিক দেখানো শেষ হবার পর অধ্যাপক মশাই মুখ খুললেন এক আজব কথার মাধ্যমে। শোন ছেলেরা, ম্যাজিক তো দেখলে, তা বলে ভেব না রোজই এমন ম্যাজিক দেখাব আমি। এখন থেকে এই ম্যাজিকই হবে তোমাদের পড়া। আর তোমরা তা দেখাতে শিখবে। অবশ্য জানি প্রত্যেক বছরই আমার এই ম্যাজিকে আকৃষ্ট হয়ে প্রথম তিনমাস নতুন নতুন বেশ পড়াশুনো করে ছেলেরা। খুব মন দিয়ে মুখস্থ করে—হাইড্রোজেন ইজ এ……, হাইড্রোজেন ইজ এ…… ; ছ মাসে হাইড্রোজেন ইজ এ শুধু হাইড্রোজেনে পরিণত হয়, ক্রমে ম্যাজিকের প্রভাব যত পুরানো হয় তত হাইড্রোজেনের 'ড্রোজেন' ভুল হয়ে গিয়ে লেজকাটা 'হাই'এ এসে ঠেকে ; এবং শেষ পর্যন্ত 'হাই হাই' করতে করতে ফাইনালে গিয়ে 'হা' হয়ে যায় সব। তার কী কারণ জান ছেলেরা ?—ম্যাজিক দেখার চেয়ে শেখা কষ্ট……। এতক্ষণে রঞ্জিত থামে।

সীতা বেশ আগ্রহের সঙ্গেই শুনছিল গল্প, মুখ টিপে টিপে মাঝে মাঝে হাসছিলও। রঞ্জিত ভেবেছিল, যাক এইবার তবে আবহাওয়াটা তরল হল ; কিন্তু কথা ফুরবার পর মুহূর্তেই সীতা মুখ পূর্বাবস্থায় পরিবর্তিত করে শুধাল—আচ্ছা, এতবড় একটা গল্প শুনিয়ে সৎ উপদেশ দেওয়ার চাইতে, বললেই তো পারতেন, বাপু পরীক্ষা আসছে, পড়। এতে করে পড়ার সময়ই তো নষ্ট হলো খানিকটা। অবশেষে

খানিকটা হালকা হয়ে বলল—আসল কথা কী জানেন, আজ আমার পড়াশুনায় মন নেই তেমন। মনটা কেমন গুমরে আছে।

—এইতো এমন করে সহজভাবে কথা বলাটাই তো চাইছিলাম এতক্ষণ ধরে। তোমারও সুবিধা আমারও সুবিধা। এখন আমি জানি গোমরা মন ঠিক করতে হলে কী চাই।

—কী!

পকেট থেকে এক গোছা কাগজ বার করে বলল—কবিতা। কবিতা অথবা গান অথবা বাজনা এইসব হচ্ছে মন হল্‌কা করার ওষুধ। তা আপাততঃ সহজলভ্য বলে কবিতাই শোন। আর বল কেমন লাগল।

রঞ্জিতের একটু আধটু লেখার অভ্যাস ছিল। আর ফুরসত পেলেই সে তা কাঙালের মত শোনাতে বসত। এ সুযোগের সে অসদ্‌ব্যবহার করতে পারে না। শ্রোতা শুনুক আর না শুনুক, শোনানো উদ্দেশ্য করে নিজের রচনা নিজে নিবিড় ভাবে উপভোগ করার একটা আনন্দ আছে।

সীতা তা জানতো। অতএব মুচকি হেসে বলল—বেশ পড়ুন।

হয় হাতুড়ি নয় হাতুড়ি পেটা
বিজয়মাল্য না ভোগান্তিরে
বেছে নাও নেবে যেটা।

—গ্যেটের Anvil or the hammer be এর অনুবাদ কিন্তু—

সীতার বেশ লাগল কবিতাখানির অন্তর্নিহিত জোরটুকু। সহসা ক্ষণিকের জন্য আবেগের মধ্যে কালপাত্র ভুল করে প্রশংসামুখর হয়ে উঠল—বাঃ সুন্দর তো। বেশ বলিষ্ঠ, কেমন একটা জোর—বেশ গরম করে তোলে।

রঞ্জিত হেসে ফেলল এবং বলল—জোরওয়ালা কবিতা আমাদের বাংলায় বড় বেশী নেই। তাই এইসব বিদেশী কবিতার অনুবাদ আমি পছন্দ করি। যেখানে জোর আছে, যেখানে আছে দৃঢ় একটা বলিষ্ঠতা। এ থেকেই আশা করি বুঝবে আজকার মত বিষয়ের অবতারণা করে জলঘোলা করার রুচি সে আমার নয়। আর এসব নিয়ে আজকার ছেলেমেয়েদের মাথা ঘামানো নিতান্ত অশোভনও বটে।

নাম করে অবশ্য বলল না সে। কিন্তু উদ্দেশ্য যে কি, তা হৃদয়ঙ্গম করতে সীতার বাকী রইল না। এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারল বলেই মাথা হেঁট করল আর মনে মনে বলল বোধহয়—মেয়ে না হলে, এ ঘটনার বিষ কোথায় আর

কোথায় এর অপমানের কাঁটা সে বোঝা যায় না। কিন্তু বাইরে নীরব রইল।

রঞ্জিত জানাল—রাত্তির হয়েছে আজ। পড়াশুনাও তো হচ্ছে না। আমি এবার উঠব। এবং সহসা আজই প্রথম হিসাব করার কথা মনে উঠল যে সত্যই পড়ায় সাহায্য করতে এসে এরকম কতদিন নষ্ট হয়েছে! কেন মনে উঠল একথা? এতদিন তো ওঠেনি! এতদিন যে জাগেনি এ ধরনের হিসাব নিকাশ—এ কথা ঠিক। অথচ আজই বা কেন জাগল সে কথারই বা সঠিক কারণ নির্ণয় করবে কে? কিন্তু জাগল এবং হিসাবান্তে দেখা গেল অনেকদিন।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল রঞ্জিত। দরজা পার হয়ে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে জুতা পরল। একটা শব্দ হল দরজায়। সীতা বিনা সম্বোধনে এগিয়ে এসে দরজা বন্ধ করল। সহসা জানালার কাছে এসে অপসৃয়মাণ একটা ছোট্ট ছায়ামূর্তি যেন দৃষ্টিগোচর হল। আধো অন্ধকারে সঠিক চেহারাটা ঠাওর করা গেল না। কিন্তু একটা জীব কিছুক্ষণ পূর্বেও ওখানে অবস্থান করছিল এবং এইমাত্র সে পলায়ন করল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সীতা চোর-চোট্টা হতে পারে মনে করে মায়ের কাছে ঘটনা জানাল। পিতাও আনুষঙ্গিক ঘটনা-শুনে মাথা নাড়িয়ে যা বললেন তা হচ্ছে: হাঁ রাত্রে হুঁশিয়ার থাকা উচিত। চোর-ছ্যাঁচড়ের উপদ্রব বেড়েছে বটে।

রঞ্জিত রাস্তার উপর এসে দাঁড়াল। এবং একই বস্তুর প্রতি তারও দৃষ্টি আকৃষ্ট। অন্ধকার গলি—তাই স্পষ্ট কিছু বুঝতে না পেরে কিয়ৎক্ষণ যাবৎ আবছায়া জীবটির গতিপথ লক্ষ্য করার জন্য অন্ধকারে নিঃশব্দ চোখ রাখল জালিয়ে। সব চাইতে আশ্চর্য বোধ হল, জীবটি গলিপথে কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর তাদের বাড়ীর ফটকের মধ্যেই প্রবেশ করল। এবং তারপর অদৃশ্য। তারও দুর্ভাবনা জাগল চোর হওয়াই সম্ভব। এবং তাদেরই বাড়ীর মধ্যে যখন প্রবেশ করেছে তখন হয়ত তাদের বাড়ীরই আশু ক্ষতির সম্ভাবনা। অতএব একটু জোর পা চালিয়ে বাড়ী এসে পড়ল এবং তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন হদিস না পেয়ে, বাড়ীর সকলকে ব্যাপারটা জানাল। মা উড়িয়ে দিলেন, বললেন—হ্যাঁ ভর সন্ধ্যাবেলায় চোর এসেছে! কী না কী দেখেছিস! অল্প বিস্তর প্রত্যেকেই প্রায় এই ধরনের জবাব দিল রঞ্জিতকে। তখন অগত্যা চোখের সত্য দিশাহারা হল। এবং চোখের ভুল স্বীকার করে নিয়ে প্রথমেই রঞ্জিত তার অভ্যাসমত পড়ার ঘরে প্রবেশ করল। তখন রাত্রি দশটাও বাজেনি।

॥ চার ॥

রাণীদিদিমণি নোট লিখছেন—নিজের একাকী কক্ষের সন্ধ্যার একমাত্র সঙ্গী বিজলী বাতি জ্বালিয়ে।

টাউন গার্লস স্কুলের ইনি প্রধান শিক্ষয়িত্রী স্কুলের আদ্যিকাল থেকে। তারুণ্যের রং লাগা মন এখন নিশ্চিহ্ন। যৌবনের নিবিড়তম অনুভূতির ইতিহাসও এখানেই খোয়া গেছে। এখন প্রৌঢ়। তবু শৌখীন বাহারী স্যাণ্ডেল পায়ে দেন। রঙীন লেডিস ছাতা ব্যবহার করেন। বাইরে বেরুনোর আগে একখানা হাল্কারঙের শাড়ী বার করেন। আর সেখানা পরেনও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বয়সের চেয়ে ঢের হাল্কা ঢঙে। ছুট্ ছুট্ শব্দে আত্মঘোষণা করে, এই বেশেই, দশটায় গলির মুখ থেকে দিদিমণি বার হন এবং পাঁচটায় গলির মুখে পুনরায় প্রবেশ করেন। এ দৃশ্য এ পাড়ার লোকেরা দেখে আসছে—আজন্মকাল।

যেন রাণীদিদিমণি আর টাউন স্কুল এদুটির মধ্যে আবহমান কালের সম্পর্ক। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটিকে চিন্তা করা দুঃসহ।

রাণী এ স্কুলে এসেছিলেন—তখন উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীই ছিল উচ্চতম মান। পরে বৃত্তি পরীক্ষার প্রবর্তন হলো। ক্রমে দলে দলে মেয়েরা আজ প্রবেশিকা পরীক্ষার তোরণদ্বার অবলীলাক্রমে উৎরে চলেছে। সে কি আজকের কথা!

পঁচিশটি বসন্ত পেরুবার সুদীর্ঘ ইতিহাস মাঝখানে। তবুও তা' হল—দিদিমণির কর্মজীবনের দোসরহীন, সহায়হীন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎহীন কাহিনীর কালটুকু মাত্র। তাঁর পরিপূর্ণ জীবনের একটি ভগ্ন অংশ। এরও পূর্বতন আরও চব্বিশটি বসন্তাগমনের কথার পাতা উল্টে গেলে তবে পাওয়া যায় তাঁর সূত্রপাতের ইতিকথা।

ভিতরে দিদিমণি নোট টুকছেন। এ সকল অতীত চিন্তার তাঁর তিলার্ধ অবকাশ নেই। অথচ বাইরের আবছা আঁধারে দরজার সামনে এসে ভবভূতিবাবুর মগজকেই—এই সকল চিন্তা দীর্ণ করে তুলছিল। নিরস্ত করে রাখছিল কড়া নাড়া থেকে।

আজকাল উনি কদাচিৎ আসেন। যখন আসেন কেন যেন দিদিমণির এই সকল চর্বিত ইতিকথা তাঁর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে। কড়ার ঠিক সামনে

এসে তিনি কড়া নাড়লেন না। চিন্তা করে চললেন, কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন—শিক্ষয়িত্রী জীবনের পূর্বেকার দিদিমণির কথা।

সে কথা করুণ কিন্তু বড় গর্বের। কারণ—তিরিশ সালের গ্রাম্য সমাজের সনাতন বিধিব্যবস্থার দোর্দণ্ড প্রতাপের দিনে—সে কাহিনী এক অসহায় নারীর অবিশ্রান্ত তেজ-দীপ্ত বিদ্রোহের কাহিনী।

পূর্ববঙ্গের এক নগণ্য গ্রামে তাঁর জন্ম। মা শিক্ষিতা ছিলেন বলেই বোধহয় তখনকার সাধারণতঃ স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী সমাজেও খানিকটা লেখাপড়া শেখা তাঁর ভাগ্যে ঘটেছিল। কিন্তু কবিরাজ পিতার দারিদ্র্যদোষে প্রৌঢ় ধনবান পাত্রে নবমের পরিবর্তে ত্রয়োদশে গৌরীদানের হাত থেকে কোনক্রমেই অব্যাহতি লাভ সেদিন তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি।

আর এখান থেকেই সূত্রপাত তাঁর তেজস্বিতায় দীপ্ত সংগ্রামের ইতিহাস। মনেপ্রাণে যা গ্রহণ করতে পারেননি সেই চরম মিথ্যাকে আশ্রয় করে সারা জীবন আত্মপ্রবঞ্চনা করবেন—এমন ধাতুতে বিধাতা তাঁকে গড়েননি।

অতএব একদিন কুলে কালি দিয়ে বসলেন। সকলের অজান্তে কুলত্যাগ করে পাড়ি দিলেন নিরুদ্দেশের পথে।

তারপর ডুব সাঁতার কেটে ভুস্ করে এসে মাথা জাগালেন শৈশবের কোন স্বগ্রামীয় সহচরের আশ্রয়ে। তিনি তখন সবে কলকাতায় এসেছেন চাকরিতে বাহাল হয়ে। তার পর কিছু ঘটনা একান্ত নিজস্ব রাণীদিদিমণির পক্ষে। তার পর টাউন স্কুল আর রাণী দিদিমণি অবিচ্ছেদ্য।

ভবভূতিবাবু বার্ধক্যের প্রান্তসীমায় বসে অতীতের পানে তাকিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। মগ্ন থাকুন কক্ষসন্ধানী কক্ষচ্যুত গ্রহের পদে পদে অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষের রোমাঞ্চক ইতিকথায়। ফেলে আসা দিনগুলির চেয়েও কী কম উত্তাপ, কম ঔজ্জ্বল্য, কম রহস্য আছে আজকের দিদিমণির!

প্রতিদিনের সমস্ত গৃহস্থালি সমাধা করে বই পড়ার বদলে, অথবা গঙ্গার দিকে বৈকালীন ভ্রমণ বিলাসের মায়া কাটিয়ে বক্তৃতার নোট টুকতে ব্যস্ত তিনি। কাল ইস্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভা। একথা সত্য যে কামাখ্যা গুপ্তা বিশেষ করে তাঁকে জব্দ করবার জন্যই তাঁর ক্লাসের অঙ্কের প্রশ্নপত্র অত জটিল এবং সিলেবাসের বাইরের অঙ্ক দিয়ে পরিপূর্ণ করেছিল। নইলে পুষ্পের মত মেয়ের বাহাত্তর নম্বর পাওয়ার কোন অর্থ হয় না। উদ্দেশ্য তাঁর সাবজেক্টএর ফল খারাপ দেখিয়ে তাঁকে অপদস্থ করা। একথা মর্মে মর্মে অনুভব করেও

৮৮- ১৯

বাৎসরিক এই আনন্দোৎসবের দিনটিতে তাঁর হীন প্রতিশোধস্পৃহা পথ খুঁজবার চেষ্টা করে না—এটাই আশ্চর্য। সারা বৎসরের মধ্যে গোটা প্রতিষ্ঠানটির ছাত্র-মাস্টার-অভিভাবক-অভ্যাগতদের প্রীতি সম্মেলনের হাতে-গোনা লগ্নগুলির মধ্যে অন্যতম এই দিনটি। একে ছোট করে, এর গৌরবকে ইতরামি দ্বারা খর্ব করে, নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের—বিশেষ করে স্কুল কমিটির ডাঃ বসাকের সভাপতিত্বকে বিদ্রূপ করার মধ্যে বিদ্যায়তনের মান বাড়ে না। কামাখ্যা গুপ্তা কালকের মেয়ে। সে হয়ত জানে না, কিন্তু তিনি তো জানেন, আপসের ঝগড়াকে হাটের মধ্যে ভেঙ্গে দিলে, সে দুর্বলতার ফাটল দিয়ে নোনা জলই পথ পায়। ছাত্রীদের মধ্যে কু-দৃষ্টান্ত স্থাপন, প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে পার্শ্বস্থ অন্য বিদ্যালয়গুলির পোয়া বারো ইত্যাদি। অভিভাবক অভ্যাগতেরা হয়ত মুখ টিপে টিপে হাসবেন।

প্রাচীনদের মধ্যে তিনি আর পঙ্কজনলিনীই অবশিষ্ট আছেন। আর কে কোথায় কবে ছিটকে পড়েছে নিশানা নেই। সে সকল হিসাব প্রথম প্রথম স্মরণ থাকত, আজ আর খতিয়ে দেখবার ইচ্ছা যায় না। বিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে যে স্কুলের আঙ্গিনায় হাজারো ছাত্রী মানুষ হয়ে বেরিয়েছে—নতুনেরা না বুঝুক—এরকম ইতরামি সঙ্গত হলেও যে স্কুলের সম্ভ্রমকে ব্যঙ্গ করবে, ব্যঙ্গ করবে স্কুলের অতীত ঐতিহ্যকে, তিনি বা পঙ্কজ তা বোঝেন। মালিকানা সে যারই হোক, স্কুলকে তিনি ভালবেসেছেন। বার্ষিক অভিভাষণ লিখতে বসে কোন অবকাশে এই সব চিন্তা উঁকি মারে আর কলম থেমে যায় নিজের অজ্ঞাতে। ভুল হয়ে যায় রাণীদিদিমণির লেখবার কথা। আবার মনে পড়ে। আবার শুরু করেন। লগ্ন সমাগত—কাল। আর দেরি করলে চলবে না।

চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী সামনে জানালার পাশে টেবিলে রাখা আছে একটি খবরের কাগজ। টেবিলের পাশে একটি শূন্য চেয়ার। তাঁর জীবনের গত কয়েক বৎসর যাবৎ এটুকু খেয়াল তিনি প্রতিপালন করে আসছেন,—সন্ধ্যায় দেবস্থানে নিয়মিত প্রদীপ জ্বালানোর মত। বৈকালে ঘরে ফিরে খাতা দেখতে বসার আগে এ কাজটুকু তিনি পরম যত্নে সমাধা করেন। টেবিলটি সযত্নে ঝাড়েন। চেয়ারটি এনে রক্ষা করেন তার পাশে। আর রাখেন একটি সংবাদ-পত্র। কোন এক সম্মানিত অতিথির আগমন কামনায় যেন এ বেদী রচনা। বিকালের এইটুকু সময় এ বয়সেও যেন আজও রোমাঞ্চ-শিহরণের মধ্যে দিয়ে কাটে, সেই না-আসা অতিথিটিকে একান্তে পাবার আশায়। তাঁর পদধ্বনির

পানে কান খাড়া করে রাখেন। যদিও জানেন—সে অতিথি ন'মাসে ছ'মাসেও একবার আসেন না আজকাল। তবুও এ সজ্জা আর নিরর্থক কামনা তাঁর ভাল লাগে।

বেশ কিছু বছর অতিক্রান্ত। তাঁর নিয়মিত আনাগোনা বন্ধ। আর এলেও অবশ্য সে মন আর নেই, তাঁর সম্মুখেই তা পরিস্ফুট হয় বেশী করে। তাঁর সত্যিকার উপস্থিতির চাইতে তাঁর আগমন কামনার মধ্যে তিনি সেই অতীতের সজীব দিনগুলির স্বপ্নের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত ফিরে পান। সে আনন্দটুকু ফিকে হলেও বড় মধুর লাগে। যেন বাজ-পড়া জীবনের ফাঁকে ফাঁকে দু'এক ফালি সজীব মুহূর্তের স্পর্শ।

আজও লিখতে বসবার অব্যবহিত আগে তিনি সে মুহূর্তের স্পর্শানুভূতি উপভোগ করেছেন। কতবার চিন্তা করে বুক ভরে উঠেছে, সে আসবে, সংবাদ-পত্র হাতে করে সংবাদগুলি পড়বে, আর কবেকার সেই দিনটির মত বলবে—তোমার ইচ্ছাই থাক রাণী, বিকালে আমি আসবো। তুমি একটা খবরের কাগজ রেখো। তোমার জন্য না আসি অন্ততঃপক্ষে খবরের কাগজের জন্যও আসবো। কানের কাছে কতবার তার উষ্ণ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অনুভব করেছেন। পরক্ষণে আবার ভেবেছেন—কতকাল তো আসে না। সত্যই যদি আসে কেমন হয়। এইতো এখানেই থাকে। সীতার কাছে একটা খবর দিলেও তো হয়। সীতা এবার প্রবেশিকা দেবে। চিন্তা করতে তাঁর বুকের মধ্যে মুচড়ে ওঠে। নিজের অতীতের দিকে তাকাতে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। একটা অব্যক্ত ব্যাকুল আশঙ্কা আর গর্বে হৃৎপিণ্ডটা যেন কেমন করে ওঠে। দিদিমণি আবার চিন্তার এই উদ্‌ভ্রান্ত গতিতে লাগাম টানেন। লেখা শেষ করতেই হবে।

পুরাতন বলেই না আজ তাঁর দায়িত্ব। আজ তো আর আগেকার হেড মিস্ট্রেস কুসুমদি নেই। আহাহা! কি মানুষ! আর কি ভাবেই না শেষটা মারা গেল। আচ্ছা এমন কেন হয়? মনের সংকল্প ও ইচ্ছা আর জীবনের গতি—এদের কেন মিল করা যায় না? অর্থাৎ তাঁর যায়নি। যায়নি কুসুমদির। আরও অনেকের।

কড়া নাড়ার আওয়াজ এল। ভ্রূক্ষেপ নেই দিদিমণির। প্রাক্তন সেক্রেটারী জ্যোতির্ময়বাবু ছিলেন দেবতুল্য লোক। তাঁরও তো হয়নি। তিনি তো স্পষ্ট বলতেন।

আবার। ঢক্ ঢক্ ঢক্।

চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়। বসে বসেই শুধান—কে?—মনে মনে বিরক্তও হন কম নয়। ভাবেন নিশ্চয়ই সেক্রেটারীর বেয়ারা মারফৎ অভিভাষণের তাগাদা।

দরজা খোলেন। চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা যায় না।

ভবভূতিবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে ঠিক চেয়ারটিতে আসন গ্রহণ করেন। যেন তাঁর নিয়ত গতায়াত-মুখরিত নিজ বাড়ী। উনি জগতে দুটি লোকের পানে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকান। প্রথম স্ত্রী, দ্বিতীয় রাণীদিদিমণি। তা ছাড়া সচরাচর আলাপ কালে সম্মুখস্থ ব্যক্তির মুখাবয়ব দেখবার কৌতুহল তিনি খড়্গহস্তে দমন করতে অভ্যস্ত। আলাপরত প্রতিপক্ষের চক্ষু যখন তাঁর উপর থেকে ঈষৎ এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত তখনই মাত্র তিনি এক ঝলক দৃষ্টিতে মুখাবয়বটি দেখে নেন—ক্যামেরায় ফ্লাশ মারার মত অবিকল ভঙ্গীতে। এই একটি দৃষ্টিকটু মুদ্রাদোষ ছাড়া ভবভূতিবাবু বড় সজ্জন ব্যক্তি।

সুতরাং অনেককাল পর উনি এই দ্বিতীয় প্রাণীর উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করার অবকাশ পেয়ে তার সদ্‌ব্যবহার করলেন। বললেন—মনটা বড় ভাল লাগছিল না তাই চলে এলাম।

টেবিলে রাখা সংবাদপত্রের পানে নির্দেশ করে দিদিমণি বললেন—বেশ করেচো। মন-টন যখন খারাপ-টারাপ লাগবে আসবে বৈকি। ঐ যে খবরের কাগজ আছে ঠিক জায়গায়। পড়। আমার হাতে একটু কাজ আছে। সেরে নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব। আর পাশের তক্তপোশে স্থান করে সীতাকে বললেন—তুই এখানটায় বোস্, সীতা।

ভবভূতি বসে সংবাদপত্রের উপর হাত রাখলেন। সারা কক্ষের আসবাবের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে একটু ব্যাকুল ভাবেই বললেন—তুমি কি এখনও খবরের কাগজ রাখ নাকি ঠিক তেমনি করে?—হঠাৎ সীতার অবস্থিতিতে সচেতন হয়ে সামলে নেন ভাবাবেগ।

কিছুক্ষণ কলম চালানো অব্যাহত রেখে মুখ তুলে বললেন দিদিমণি—স্মৃতিকে আঁকড়ে থাকা অনেকের স্বভাব থাকে—কী বলিস সীতা—অ্যাঁ।

পিতা সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করার চেষ্টায় রত। ইনি লেখায়। সীতা অস্বস্তি বোধ করে। চুপ করেই যদি থাকতে হয়, এই বেড়াতে আসার কি অর্থ সে ভেবেই পায় না। সে শুরু করে দিদিমণির উদ্দেশ্যে—সে তো থাকেই মণিমা। নইলে দাদার যেখানটায় পড়ার আলমারি ছিল সেখানটা মা রোজ ধুয়ে মুছে ঝকঝকে রাখবে কেন?

লিখতে লিখতে মুখ না তুলেই জবাব করেন মণিমা—করে নাকি তোর মা।

—জানেন মণিমা, দাদা ধরা পড়েছে বলে খবর বেরিয়েছে। বিনা বিচারে আটক থাকতে হবে নাকি এখন বছরের পর বছর।

রাণী দিদিমণি সবিশেষ সংবাদ রাখতেন কিনা তার নিশানা পাওয়া গেল না।

—বলিস কী! সেইজন্যই বুঝি তোর বাপের মন খারাপ। সোজাসুজি বিনা বিচারে বলছিস তো,—বিচারের নামে অবিচারের চাইতে ঢের ভাল। অন্ততঃ ভণ্ডামি নেই—। নিজে কতখানি ব্যথিত বোধ করলেন সে পরিচয় কথায় রইল অপ্রকাশ।

পুনরায় শুরু করলেন কলম চালানো।—দাঁড়া দাঁড়া আর একটুখানি। আর একটুক্ষণ শুধু বকাসনি।

সীতাকে অগত্যা চুপ করতেই হোল। মৌন ভেঙ্গে মুখর হয়ে উঠলেন ভবভূতিবাবু।

—ভাল লাগে না কিছু। তোমার কথা মনে পড়ে গেল, ভাবলাম যাই একবার। সীতাও নাছোড়। একা আমায় ছাড়বে না কিছুতেই। বললে, আমিও যাব।—ভবভূতিবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারি শুরু করলেন। আরও কত কী বকে চললেন। দিদিমণি কিন্তু হাতের কাজ শেষ না হতে কোন কথারই কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে হাতের কাজ শেষ করে দিদিমণি শুধালেন—তা ছটফট না করে বস তো এক জায়গায় স্থির হয়ে। বল কি বলছিলে।

—বলছিলাম ছেলের আশা তো ছেড়ে ছেড়েও ছাড়তে পারছিলাম না। এবার ছাড়া গেল,—তারপর পাংশু হাসলেন একটু।

—হুঁ। তারপর।

—তারপর সীতারও যে বিয়ে দিতে পারবো এমন পুঁজি কিছু নেই। আমার যা শরীরের অবস্থা, ও শেষটায় দাঁড়াবে কোথায় সেইটাই আমার উপস্থিত দুর্ভাবনা।

—শুধু দুর্ভাবনা ভেবেই কি দাঁড়ানোর জায়গা বার করবার ইচ্ছে আছে নাকি।

ভবভূতিবাবু একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান।—না সেজন্যেই তো এলাম তোমার কাছে। পরীক্ষাটা শেষ হলে তুমি ওকে একটা চাকরি-বাকরি দেখে দাও। আর পরমুখাপেক্ষী থাকা আজকাল মেয়েরাও তো বড় পছন্দ করছে না।

—আমিও তাই বলি যে মন খারাপ লাগলো আর মন সারাতে একেবারে

সোজা চলে এলে আমার কাছে। এমন নিঃস্বার্থপরতা তোমার!—তারপর সীতার পানে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন—কীরে সীতা, বাপের কথাবার্তা শুনছিস তো। তা হলে চাকরি-বাকরি করবি নাকি?

—মেয়েদের চাকরি-বাকরির পথ বেছে নেওয়া—আর যারই হোক আমাদের যে অমনঃপূত নয়, আপনি থাকতে এমন কথা বললে মিথ্যে বলা হবে যে।

—মেয়ে যে খুব ট্যাক্ ট্যাক্ কথা শিখেছে দেখছি।

কথায় কথায় সন্ধ্যা বেশ ঘনিয়ে ওঠে। সীতার উপস্থিতি রাণীদিদিমণির মনের স্বপ্নময় কলগুঞ্জন আর অতীত স্মৃতির জের টেনে জাবর কাটাকে দমিয়ে এক মহিমময় শিক্ষয়িত্রীর সত্তা জাগ্রত করা তোলে। বলেন—তা এখন আর তোর চাকরি-বাকরি নিয়ে ভেবে কাজ নেই। তুই পরীক্ষায় পাস করার কথা ভাব। টেস্টে যা রেজাল্ট করেছিস তার পর আর বাজে দশটা ভাবনা মাথায় ঢুকলেই মেয়ের পাস করা হয়েছে। ফাইনালের আর কটা দিন।

ভবভূতিবাবুরও কথা জমে না আর। নাকের ডগায় চশমা চড়িয়ে সংবাদ-পত্রখানার উপর চোখ রেখে অন্যমনস্কভাবে সাত পাঁচ আকাশ পাতাল চিন্তা করা ছাড়া আর কোন কাজ খুঁজে পান না।

অতীত নিয়ে জাল বোনার ইচ্ছা থাকলেও ফুরসৎ কৈ তাঁর। এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই মারোয়াড়ীর গদি, পাটের হিসাব। কর্তার মোসাহেবী, দৈনিক হাজিরা—উঃ রেহাই কোথায়!

এতটুকু সাহায্য করার জনমানব নেই পাশে। বড় একা, বড় অসহায় মনে হয় নিজেকে। আঘাত পেলে দার্শনিকতা এ বয়সে প্রবল হয়ে ওঠে মাথার মধ্যে। অতএব জীবনের সংজ্ঞা রচনা করবার চেষ্টা করেন ভদ্রলোক। খানিকটা দুঃখ, খানিকটা তৃপ্তি, খানিকটা অশান্তি, খানিকটা ঠকা, খানিকটা ঠকানো, খানিকটা ভণ্ডামি, খানিকটা সততা—এই তো তাঁর অতীত। তবে এই কি জীবন! জীবনের পঞ্চাশ বৎসরের বেশী অতিক্রান্ত। জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে সারা জীবন দিয়েও আজ জীবনের সংজ্ঞা হাতড়ে ফেরেন ভদ্রলোক।

বর্তমানের চেয়ে সকলেরই অতীত বুঝি উজ্জ্বল। তবু এই মুহূর্তে বর্তমানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অতীতের সে উজ্জ্বল আলোকমুখর দিনগুলির স্পর্শ অনুভব করতে পারেন না দিদিমণি। ভবভূতি তাঁর সামনে। অতীত যে তাঁর ছিল তার জীবন্ত স্বাক্ষর। জোর করে উঠে পড়েন দিদিমণি। শিক্ষয়িত্রীসুলভ উপযুক্ত গাম্ভীর্যের স্বর বজায় রেখে সীতাকে বলেন—কাল প্রাইজ মনে আছে তো।

তোমার তো প্রাইজ ট্রাইজের বালাই নেই কোনকালে। কিন্তু গান আছে খেয়াল রেখো।

সীতা ঘাড় নাড়ে।

—তোমার কিন্তু উচিত ছিল আজ আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া ঠিকমত।

সীতা বিছানার চাদরের শিল্পকাজ লক্ষ্য করতে করতে উত্তর করল—উচিত ছিলই তো মণিমা। কিন্তু বাবা—

—হুঁ বাবা তোমার কচি খোকা কিনা।—পরে গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠ অপ্রতিহত রেখে ভবভূতির উদ্দেশ্যে বললেন—কাল আমার প্রাইজের ব্যাপার রয়েছে। এখুনি একবার সেক্রেটারীর বাড়ী যেতে হবে। তোমরা বরং বস, দেরি হতে পারে ফিরতে।

ভবভূতিবাবু চশমার উপর দিয়ে দৃষ্টিপাত করেন। কোন কথা বলেন না।

সেক্রেটারীর বাড়ী যেতে হলে আর দেরি নয়। অজ্ঞাতসারেই দরজার পানে এগিয়ে যান খাতাপত্র হাতে নিয়ে। পেছন থেকে ভবভূতি শুধান এতক্ষণে,—কৈ কিছু বললে না?

—কী বলবো আবার। রাত পোহাতেই তো আর মেয়ে চাকরি করতে যাচ্ছে না। সে যা হয় পরে দেখা যাবে। শুধু ঘোড়ায় চাবুক মারলেই তো হয় না সব।

ভবভূতিবাবু চিরকাল ওঁর ঐ বিশেষ ধরনের কথায় অভ্যস্ত। অতএব চুপ করে যান। দিদিমণি রাস্তায় নেমে পড়েন।

॥ পাঁচ ॥

যুদ্ধের সময় রাজা বসাকের ওষুধের কারখানা রাতারাতি শহরতলির বস্তিজীবী মানুষের মাঝখানে চিমনি তুলে জেঁকে বসেছিল। শোনা যায় আগের দশ বৎসর যাবৎ বসাক তাঁর হাসপাতালের বাইরের ঘরের ছোট্ট লেবরেটরীর উন্নতি সাধন করতে বহু চেষ্টা করেও যা সম্ভব করতে পারেননি, যুদ্ধের স্বল্প এই কয়েকটি বছরের মধ্যেই সেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল।

সেই থেকে নতুন আসর জমিয়ে বসতে—কোথা থেকে কেমন করে কারখানার প্রবেশপথের দুপাশে নিত্য নূতন বস্তির সারি গজিয়ে ওঠা শুরু হয়েছিল—তার শেষ আজও হয়নি।

কারখানাও ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। শোনা যায় ব্যাণ্ডেজ তৈরির তুলো-

পেঁজা মেশিনগুলি অতি শীঘ্র পুরোদমে চালু হবে। ব্যাণ্ডেজ তুলোর প্রকাণ্ড অর্ডার নাকি কোম্পানী আগাম নিয়ে বসে আছে।

বস্তির সারিতেও নতুন একখানি ঘর অবিলম্বে বাড়বে। বাবুর বাগানের ইসাক মিঞা। ইনি চারখানি ঘোড়ার গাড়ির মালিক। এ অঞ্চলে প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে গণ্য। তিনি নিজেই একখানা ঘর তোলবার তোড়জোড় শুরু করেছেন। কিছু বাঁশ, দরমা আর টালি, কারখানার প্রবেশপথের মুখে জড়ো করা হয়েছে। জায়গাটা বেশ লাগসই। এতদিন খালি পড়ে ছিল। বস্তির ছেলেপুলেগুলো একটু আধটু খেলাধুলো নষ্টামি দুষ্টামি করত এতদিন। কোম্পানীর কাছ থেকে ঠিকা ব্যবস্থা নিয়েছে ইসাক। উদ্দেশ্য বিড়ির কারখানা করা। দু' একদিনের মধ্যে স্থানটিতে একটি জুতসই ঘর উঠবে।

ইসাকের ডেরা এখান থেকে বেশী দূরে নয়। জমিদারের জায়গায় এই একই রকম ঠিকা ব্যবস্থা নিয়ে কয়েকখানি টালির ঘর তুলে সে তা ভাড়া খাটায়। অতএব ক্ষুদে বাড়ীওয়ালা। ভাড়াটেরা সমীহ করে। সম্মুখের সব চাইতে বড় ও সুদৃশ্য ঘরখানিতে সে নিজে থাকে। দুনিয়ায় তার কে কোথায় থাকে তা বোঝা যায় না। সারাদিনভ'র দরজায় তালা চড়িয়ে সে বাইরে বাইরে কোথায় কাটায় কে জানে। আর ফেরে সেই মাঝ রাত্রে। চারিদিক তখন প্রায় নিঝুম। কোন কোন রাত্রে অন্যান্য ভাড়াটিযাদের কারও সঙ্গে দৈবক্রমে সাক্ষাৎ ঘটলেও তারা বাৎচিৎ করতে সাহস করে না। ইসাক তখন বুঁদ।

দক্ষিণ দিকের কোণের ঘরটিতে কাঠের মিস্ত্রীদের টুকটাক হাতুড়ি আর ছেনির আওয়াজ গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে তখনও অন্যান্য প্রতিবেশীদের কানে তাদের নিরলস কর্মের ঘোষণা জানায়। পুকুরের পানে মুখ-করা কামরাখানির বাসিন্দা হচ্ছেন বামুনদিদি। তিনি দু'একবার উসখুস করে মিস্ত্রীদের ডেকে বলেন—রাত যে পুইয়ে এল গো।—ওঁর অমনি স্বভাব। এত বড় বাড়ীর প্রত্যেক বাসিন্দার টুকটাক অসুবিধার তথ্য নেওয়া তাঁর নিত্য কর্মতালিকা থেকে কখনই বাদ পড়ে না। বামুনদিদির স্বামী আছেন। স্বামী স্বামীই কিনা সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও এ সমাজে তা আলোড়ন জাগায় না। শোনা যায় বামুনদিদি আসলে বামুনই নন। উনি হচ্ছেন জেলের মেয়ে। মাছ বিক্রি করতে বসে কেমন করে যেন তেলেভাজা দোকানের মালিক জগৎ ঠাকুরের কাছে আত্মবিক্রয় করে বসে আছেন। এখন মাছ বিক্রি করেন না। জগৎ ঠাকুরের সংসার আগলান। এ সংসারও করছেন প্রায় দশ বৎসর। বয়স

পড়ন্ত। দেহগঠনের বাঁধুনিটি কিন্তু ঠিক আছে। সন্তানসন্ততির বালাই নেই। তবু কাজ ফুরোয় না সারাদিন।

. বামুনদিদির লাগোয়া ঘরটিতে ভাড়াটিয়া হচ্ছে, ঠাণ্ডারাম আর তার স্ত্রী। জাতিতে কেওট, কাজ করে বেন্টম্যানের। অন্য একটি কারখানায়। অনেক-গুলি পরিবারের মধ্যে সম্ভবতঃ এই একটি মাত্র পরিবার স্ত্রীবর্জিত নয় বলেই বামুনদিদির সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কিন্তু তাই বলে রামাধর আর লক্ষ্মণ কখন হরিমটর করল সে তথ্য বামুনদিদির অগোচর থাকে না। ওঁকে হয়ত সেই রাত্রি এগারোটায় পুনরায় নতুন করে চালে ডালে চড়িযে দিতে হয়। জগৎ তখন ঘরে ফেরে। ক্লান্তিতে ছেঁড়া শতরঞ্জি বিছান চৌকির উপর, খাটমলকে অগ্রাহ্য করেও চুপচাপ গা দেয় এলিয়ে। বামুনদি বকর বকর করেন জগৎকে শুনিয়ে—তোমার সঙ্গে ঘর করতে এসে যে এত জ্বালা, কে জানতো আগে; যতো রাজ্যের মাগ নেই, চুলো নেই, চাল নেই সব মানুষের মাঝে এসে এখন মরণ।

জগৎ অভ্যস্ত হয়ে গেছে, চুপচাপ মটকা মেরে পড়ে থাকে।

একমাত্র ইসাকই বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে কম। সে কোথায় আহার করে কোথায় গোছল যায় তা সকলেরই অজানা। শুধু বামুনদি মাঝে মাঝে বকবক করেন,—মেয়েমানুষের অভাবে মানুষ আর মানুষ থাকে না; মেয়েমানুষ হচ্ছে ব্যাটাদের গোয়াল ঘর। ঘোর আর ফের আর যতই চ'রে খাও, এখানটিতে ঠিক ঠিক আসতেই হবে নিয়মিত। সুতোর গোড়া যে বাঁধা এখানে। আর একবার নির্ঝঞ্ঝাটে চ'রে খেতে শুরু করতে পেলে আখেরে এমন তো হবেই।

বাইরের ঘরে বৈরাগীটি সারাদিন ভিক্ষে-সিক্ষের পর অধিক রাত্রে কোন কোন দিন ক্ষুদিরামের গানটি ধরে, একতারার টুং টাং আওয়াজে বামুনদির নিদ্রাভঙ্গ হয়; কোনদিন বা শ্রীরাধার বিরহ সঙ্গীতের কলিগুলি একতারার আওয়াজের সঙ্গে বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে ওঠে। সে কান্না বাবুপুকুরের চতু-পার্শ্বস্থ অন্যান্য বস্তিবাসীদের উদ্‌ভ্রান্ত করে কিনা কে জানে—কিন্তু নিঝুম নিশীথের ঝিঁঝি ডাকা স্পন্দনের মধ্যে দিবসের কাঠিন্য আর দুঃখ, দারিদ্র্য আর অনশনের স্মৃতিগুলিকে মলিন করে বামুনদির বুকের মধ্যে কেমন করে পাকিয়ে ওঠে। খুলে আসা অবিন্যস্ত বেশবাস অগ্রাহ্য করে বামুনদি তক্তপোশের লাগোয়া জানালার সঙ্গে কানটি চেপে উৎকর্ণ হয়ে শোনেন। পাশে জগতের পেশীবহুল বাহু আর শিরাবহুল কপালের উপর শুক্ল পক্ষ হলে জ্যোৎস্না এসে পড়ে।

গভীর নিদ্রায় অভিভূত জগতের নিঃশ্বাসের শব্দ নিরালা রাত্রিতে ঝড়ের আওয়াজ বলে ভ্রম হয়। তাকে জীর্ণ টাইমপিসের টিক্ টিক্ শব্দ অবিরাম চলতে থাকে।

মুহূর্তের জন্য বৈরাগীর প্রতি গভীর সহানুভূতিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে বামুনদির মন। মনে মনে চিন্তা করেন কাল বাবাজীকে একটি দোসর জুটিয়ে নেবার পরামর্শদেবেন।

ইতিমধ্যে জগতের কথা মনে হয়। নিদ্রার পূর্বে তার শেষ আতপ্ত আলিঙ্গনের কথা মনে হয়। আর মনে হয় বৈরাগীর কথা, আতপ্ত আলিঙ্গনের সুধা থেকে বঞ্চিত হয়ে যে শেষরাতের অন্ধকারে একাকী কাঁদে। ওঁর মনে হয় শ্রীরাধার বিরহ সংগীত ও নয়। ও বৈরাগীর নিজস্ব বিরহের কান্না। গান কখন শেষ হয়ে যায়। জগতের দৃঢ় বাহুর বেড়িতে উনি সুখী। শঙ্কা হয় বৈরাগীর উষ্ণ অতৃপ্ত নিঃশ্বাস তাঁর এই সুখ আর ঘরকন্নাকে আক্রমণ করবে। সহসা বামুনদিদি পাশ ফেরেন। জগতের আরও কাছে এগিয়ে নেন দেহশয্যা। জগৎ বিরক্তিসূচক উঃ শব্দ করে পাশ ফেরে ঘুমের ঘোরে।

তারপর উষার রক্তাভ সূর্য নিখিল সৌরমণ্ডল পরিক্রমার পথে পৃথিবীকে আলোকিত করার সঙ্গে সঙ্গেই বামুনদিদি তাঁর বিরামবিহীন গৃহস্থালি শুরু করেন। প্রত্যেক ঘরের কাছে গিয়ে ডেকে ডেকে ঘুম ভাঙ্গান সকলের। এমনকি ইসাকেরও। ইসাক,—তার নেশার ঘোর হয়ত ভাঙ্গেনি তখনও—জবাফুলের মত লাল চক্ষুদ্বয়ের জড়তা না ভেঙ্গেই আধো জড়ানো সুরে পাশ ফিরতে ফিরতে বলে,—কে বাবা, রাত দুপুরে। বামুনদি হাসেন। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সরে আসেন এবং বলেন,—মরণ আর কি মিন্সের।

ছত্রিশ জাতের এই অপূর্ব সমন্বয়ই—বাবুর বাগান বস্তি-সমাজের আসল ভিত্তি।

দিনভ'র কারখানায় অবিশ্রান্ত ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ঘরে ফেরার পথে অতি আচম্‌কা শংকরের সঙ্গে ঠাণ্ডারামের সাক্ষাৎ। শৈশবে ঠাণ্ডারাম শংকরের সহপাঠী হিসাবে কিছুদিনের জন্য একই পাঠাশালায় পড়েছিল। সেই সূত্রে ঠাণ্ডারাম প্রায় টেনে তাকে হাজির করল নিজের আস্তানায়। গ্রাম্য সমাজের পরিবেশ থেকে সদ্য আসা শংকরকে তার বর্ণাভিমান প্রথমটা বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু ঠাণ্ডারামের নিঃসংকোচ আত্মীয়তা আর শংকরের নিজের মতামত জাহির করার লাজুকতায় তা বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারল না। বস্তির পাঁচ হাত লম্বা আর তিন হাত বিস্তার বিশিষ্ট ঘরের রাস্তা থেকেও নীচু লেভেলের কাঁচা

স্যাঁতসেঁতে মেজেয় যখন সে পদার্পণ করল, তখন বাইরের দিনের আলো নিষ্প্রভ হবার বেশ বিলম্ব আছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে একগাদা অন্ধকার জমে উঠেছে।

বাইরের আলোর বাধা চোখ থেকে কেটে যেতেই কিঞ্চিৎ ফিকে হল আঁধার। এই অবসরে চক্ষুর শক্তি দ্বিগুণ বর্ধিত হারে জ্বালিয়ে ঠাণ্ডারাম তক্তপোশের উপর শংকরকে বসিয়ে বলল,—শোন শংকর ঠাকুর, ভয় নেই, এখানে কেউ তোমাকে দেখবেও না আর বলবেও না কিছু। কলকাতার শহর। এখানে জাত বিচারের চেয়ে পয়সার বিচারই কড়াক্কড়।

শংকর ঠাণ্ডারামের দিকে চোখ তুলে তাকাল না। বুঝল—ঠাণ্ডারাম তার অন্তরের সংস্কার-সঙ্কীর্ণ দ্বিধাগ্রস্ততা টের পেয়েছে। কিন্তু নিজের এ দুর্বলতা যে ন্যায় নয় তা সে বোঝে। এ দুর্বলতা সত্যই যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে ওর কাছে সে হবে বড় লজ্জার। তাই মুখে বলে,—না, মানে ঠিক তা নয়।

ঠাণ্ডারাম তার সোঁদা গন্ধযুক্ত পোশাক খুলতে খুলতে বলল—বুঝতে নিশ্চয় পেরেছো এতদিনে, জাত আজকাল দুটোই—বড়লোক আর গরীব।

কথাটা শংকরের মনে বেশ ধরে। সে তো রাজা বসাকের বাড়ীর অন্ন ধ্বংস করতে করতে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে। গ্রামের অপপল্লীর প্রণাম ঠোকা ঘরের ঠাণ্ডারামকে তার সঙ্গে একাসনের যোগ্যতায় বসাতে সে পারছিল না ঠিক, তবু আপনার নিরর্থক সংস্কার-জীর্ণতার পরিচয় এর সামনে উন্মোচন করতে কুণ্ঠা জাগল। যেন সে ওসব কিছুই গ্রাহ্য করে না এমনিভাবে আগের চাইতে কিঞ্চিৎ সাবলীল সুরে বলল—আচ্ছা ঠাণ্ডা, তোর বউ চা করতে পারে তো। খাওয়া না এক পেয়ালা।

ঠাণ্ডারাম জবাব করল—আমিও বলব বলব ভাবছিলাম, কিন্তু ভরসা পাচ্ছিলাম না। হাজার হোক বামুনের ছেলের মন, ক্ষেপে যাও শেষে।

—আরে দূর—এই প্রথম সচেতন ভাবে সে তার অন্তরের ছুঁৎমার্গকে দূরে ঠেলে দিল। ঠাণ্ডারাম বউএর উদ্দেশ্যে হুকুম করল এবং পরে মুখ ঘুরিয়ে শংকরকে বলল—পেয়ালা কিন্তু নেই, গ্লাস বাটিতে চলবে তো?

ঘরের দরজায় কে যেন উঁকি মারল।

—কে বামুনদি নাকি—ঠাণ্ডারাম হাঁকল।

বাইরে দাঁড়িয়েই সাড়া দিলেন বামুনদিদি—

—বউটা আছে কি নেই, খোঁজ নিলি না, হুকুম তো দিয়ে গেলি খুব লাট-সাহেবের মত।

—কেন বাইরের একটা লোক এয়েছে, আজ তেনার হোল কী আবার।

—না হয়নি কিছু, দেখছিলাম যে মিন্‌সেরা নিজের বেলা ষোল গণ্ডা বোঝে, তুইও তেমনি কিনা।

—কী দেখলে ?

—দেখলাম এক নিক্তি সব।

—আচ্ছা বামুনদি, তুমিই না হয় করে দাও। একটা ভদ্দরলোকের ছেলে ঘরে। ও তো চা করে না, পাচন। আর একটা লণ্ঠন। কি বিদ্‌কিচ্ছি অন্ধকার ঘরে। বাপরে। —ঠাণ্ডারাম তক্তপোশের এক পাশে ঠাঁই করে নিয়ে বসে পড়ে।

—তা বুঝেচি, বামুনদির সবেতেই মরণ।

কিছুক্ষণের মধ্যে আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না কারও।

শংকর শুধায়—বামুনদিদিটি কে রে ঠাণ্ডা ?

—কে, তা জানিনে বাপু। তবে পাশের ঘরে থাকে। দশ জায়গার চোদ্দজন এসে একত্রে বাস—কে কার কুলঠিকুজির খবর নেয় !

শংকর যখন বিব্রত বোধ করে তখন চট করে তার কথা যোগায় না। কোন রকমে ঠেকা দেয় জুতসই জবাবের বদলে,—না কুলের কথা বলছি না—মানে ইয়ে।

ঠাণ্ডা বোঝানোর স্বরে বলে—ইয়ে টিয়ে নয়, বুঝলে শংকর ঠাকুর। রুজি রোজগারের ঠাঁই। আমার কুলঠিকুজি ওরা জানে না—আমিও জানতে চাই না ওদের। কী দরকার। যতদিন বনবে থাকবো, নইলে পথ দেখবো। ব্যস্।

শহরের পরিবেশে অনভিজ্ঞ গ্রামের ছেলে শংকরকে দুটো উপদেশ, একটু সৎকথা বলে নিজেও গর্ব অনুভব করে ঠাণ্ডারাম।

শংকরের বেশ রোমাঞ্চ লাগে। বেশ তো ! অতীত নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না এখানে। কুলঠিকুজির জন্যও লাঠালাঠির প্রয়োজন ঘটে না। বর্তমানের প্রতিবেশিত্বই সেরা পরিচয়। আর তারই ভিত্তিতে বামুনদিদি হন ঠাণ্ডারামের আত্মীয়া।

ইতিমধ্যে ঘোমটা টেনে ছোট্ট একটা বউ এক হাতে লণ্ঠন আর অপর হাতে দু'বাটি চা এনে হাজির করল সামনে। পেছন পেছন শালপাতায় জড়ানো তেলেভাজা ফুলুরির ঠোঙা হাতে বামুনদিদি।

সামনে এসেই শংকরের চেহারা দেখে বামুনদিদি কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে পড়লেন।

সেদিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডারাম আরও বিব্রত করবার জন্যই যেন বলে—রাখো, বামুনদি, রাখো। জগৎ কোম্পানীর তেলেভাজা বুঝি!

চোখের এক কটাক্ষ করে অতি ত্রস্তে ঠোঙাটি রেখে বাইরে এসে পড়লেন বামুনদিদি। ঠাণ্ডার বউও দাঁড়াল না। বামুনদি বাইরে যেতে যেতে ঠাণ্ডার বউএর উদ্দেশ্যে বললেন—হ্যাঁলা এযে ভদ্দর নোকেদের ছেলে লা। তা আগে বলতে হয়।

ঠাণ্ডার বউ মোহিনী ঠিক বুঝতে পারে না, বোকার মত জিজ্ঞাসা করে—ক্যানে?

—আ ছুঁড়ী। এক গা ময়লা আর এমনিতর কাপড়-চোপড় নিয়ে নাকি কেউ ভদ্দর নোকেদের ছেলের সামনে বেরোয়। ওরা নিন্দে করে যে।

বামুনদি তার দেহের বিশেষ করে বক্ষদেশের এলোমেলো কাপড়ের ভাঁজগুলি টেনে টেনে ঠিক করেন আর মৃদু হাসেন। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে মোহিনীকে শোনান,—আমি না হয় বুড়ো মাগী। তোর সোয়ামীরই বা আক্কেলটা কী! জোয়ান বউ রয়েছে ঘরে—তা গ্রাহ্যির মধ্যেই নেই।

পেছন থেকে বৈরাগী বাবার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—ও বামুনের মেয়ে, দুটো আলু দিতে পার, আর একটা কি দুটো লঙ্কা? বামুনের মেয়ে নন বলেই বামুনদিদি এই ডাকটিতে খুশী হন বেশী, তা বৈরাগী বাবা জানে।

বামুনের মেয়ে গলায় মধুবর্ষণ করে উত্তর করেন,—সাত দোরে ভিক্ষে মেগেও একটা পেট যদি না চালাতে পারো, কেন, কেন তেমন ভিক্ষে করা। বলেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন।

বৈরাগী ঘাবড়ায় না। সে বামুনের মেয়েকে দেখে আসছে আজ কম দিন নয়। আরও একটু অগ্রসর হয়ে বামুনদিদির দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ায়। গলা একটু খাটো করে ভেতরের মানুষটিকে উদ্দেশ করে বলে—আর থাকে তো জগৎ ঠাকুরের এষ্টক থেকে দুটো বিড়ি ফেলে দিও।

কয়েক মুহূর্ত কোন সাড়া নেই। বৈরাগী বাবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী সহযোগে মুখের কাছে তুড়ি দিয়ে হাই তোলে—জয় গুরু, জয় গুরু। মুখমণ্ডলের কাঁচা-পাকা দাড়ির জঙ্গলের মধ্যে মুখ হাঁ করার সময় চিবুকের সঙ্গে সঙ্গে দাড়ি এসে বুক স্পর্শ করে।

বামুনদিদি গুটিচার আলু আর কয়েকটি লঙ্কা তার সামনে এনে রাখেন। বিড়ি দুটি টান মেরে ছুড়ে দেন। বলেন—আর গুণ নেই ছার গুণ আছে। বিড়ি। লজ্জা করে না! ভাতের ঠিক নেই বিড়ি।—দুব্ দাব্ করে আবার ঘরে ঢুকে যান উনি। বৈরাগী বাবা মাথা নীচু করে মুচকি হাসি হেসে ঠোঁট দুখানি ঈষৎ বাঁকিয়ে আলু আর লঙ্কা তুলে নেয়। বিড়ি দুটি কুড়িয়ে একটি কানে গোজে অপরটি দাঁতে চেপে, ঠাণ্ডারামের বারান্দার জ্বলন্ত চুলোর পানে অগ্রসর হয়। চুলোর পাশে রান্নার কাজে ব্যাপৃত মোহিনীকে একটা কাগজের টুকরো এগিয়ে দিয়ে বলে,—দাও তো বউমা কাগজটা জ্বালিয়ে।

বউমা কাগজ জ্বালিয়ে দেন। বৈরাগী বিড়ি ধরায়। প্রথম টানের সঙ্গে সঙ্গে এক হেঁচ্‌কা তামাকে কাশির ধমক গলাধঃকরণ করতে করতে তার নির্দিষ্ট ঘরের দিকে পা বাড়ায়। উঠোনটি একেই প্রায়ান্ধকার, আর কাশির ধমকে বৈরাগী ঠাকুর চোখে আরও অন্ধকার দেখছিল। পা বাড়াতেই কার সঙ্গে একটা ভীষণ ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। জগৎ ঠাকুর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে,—আচ্ছা লোক তো মাইরি। এসেচ, এসেচ। তা বলে লোক চোখে দেখবেনি। উঃ হুঁ হুঁ হুঁ। একদম ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছো মাথাখানা।

বৈরাগীর কাশির ধমক তখনও শান্ত হয়নি। সেই বিষম কাশির তুফানের কিয়দংশ বুকের মাঝে চাপতে চাপতে আর কিয়দংশ কোনরূপে বাগ মানাতে না পেরে—একটা অদ্ভুত তাল ও লয়সম্পন্ন আওয়াজ সৃষ্টি করতে করতে নিজের ঘরে এসে ওঠে। কোন কথারই জবাব করতে পারে না।

কথায় কথায় ইতিমধ্যে রাত্রি বেড়ে ওঠে। এখানকার প্রতিটি ঘটনার অনাড়ম্বর অভিব্যক্তি শংকরের মন স্পর্শ করে। সে দরিদ্র—এরাও। কিন্তু এরা কত সহজ আর অনাড়ম্বর। আর তার আছে শুধু অভিমানসর্বস্বতা।

শংকরের যারা তার আস্তানা দিয়েছে তাদের উদারতা ধন্যবাদার্হ। দুবেলা আহার আর আশ্রয় সংস্থানের পক্ষে গ্রাম্য সম্পর্কের ওই ধরনের সামান্য আত্মীয়তা-সূত্র খুবই অযথেষ্ট। কিন্তু তবু যে শংকর ঠিক ঠিক কোথায় বুভুক্ষু তা সম্ভবতঃ ঠাণ্ডার আস্তানায় না এলে নিজের কাছেই এতটা পরিস্ফুট হ'ত না। তার টলমলে ভুয়া বর্ণাভিজাত্য-বোধকে কোথাও কোথাও নাড়া দিলেও এখানে এসে সে যেন হাত পা মেলে বাঁচল। ওখানে সহজ আর সাবলীল হওয়ার চেষ্টা সর্বত্রই যেন পোশাকে ঢাকা। সর্বদা ভয় এই বুঝি ঠিকমত ব্যবহার হোল না, ঠাট বজায় রাখার চেষ্টা বুঝি ধূলিসাৎ হয়ে গেল! অনুক্ষণ আড়ষ্টতাকে সঙ্গী করে

মানুষ বাঁচে কী করে। চারদিকে সেখানে প্রাচুর্য। প্রাচুর্য ও বিলাসের মুখোমুখি, তার নিজের, তার মা এবং পরিবার পরিজনের শতছিন্ন অভাব আর দারিদ্র্যকে, বড় বেশী কুৎসিত বলে মনে হয়। তাকে যেন অহরহ মাথা উঁচু করতে দেয় না। হাজার অকৃপণ আদর যত্নের মধ্যেও অনবরত যদি মনে হয় নিজেকে কৃপাপ্রার্থী বলে, নিজেকেই বা সেখানে টেকাতে পারবে কত দিন! কৃপাপ্রার্থী বোধের এ লজ্জা থেকে অব্যাহতি লাভ তাকে করতেই হবে আপন ক্ষমতায়। কিন্তু পথ কৈ!

সাত পাঁচ চিন্তায় তার চিত্ত উদ্‌বেল হয়ে ওঠে। হঠাৎ রাত্রি বেড়ে উঠবার চিন্তায় ত্রস্তে বলে—তাহলে উঠি ভাই।

ঠাণ্ডা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়, বলে—এসো মাঝে মাঝে। ক্ষুদ্দুর লোক হয়ত কাজেও লাগতে পারি বা।—একটুখানি খোঁচা দিয়ে কথা বলতে ইচ্ছা যায় ঠাণ্ডার। আর হি হি করে উজবুকের মত হাসে।

—কি যে বলিস।—শংকর বেশ খানিকটা দূর থেকে উত্তর করে।

অন্ধকারে বিশেষ ঠাওর করা যায় না। শুধু কোন রকমে আঁচ করা যায় একটা আবছামূর্তি অন্ধকার কেটে বাঁক ঘুরল। ফিরে এসে গালের মধ্যে 'তুঃ তুঃ' করে একটা সমবেদনাসূচক শব্দ করে খাটের উপর বসে ঠাণ্ডারাম। গাঁয়ের গোসাঁই ঠাকুরদের ছেলের প্রতি দুস্তর একটা সমবেদনায় আপ্লুত হয় তার মন। কারণ ও বুঝতে পারে শংকরের অসংগতি তার চাইতেও অনেক বেশী। শংকরকে অচেতনভাবে সেও কৃপা করতে চায় নাকি!

॥ ছয় ॥

নতুন কারখানা ঘর চালু হবার পর থেকে রাজা বসাকের বাড়ী আসা আরও সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। অদ্ভুতভাবে পরিশ্রম করে যেতে পারেন উনি এই বয়সে। অজয়ের তত মন না থাকলেও কাকার চাপে কাজকর্ম দেখাশোনা করার কাজে তাঁকে সহায়তা করতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। শংকরকে একটা কাজ দেওয়া হয়ত চলতো। কিন্তু হিরণমালা কারখানার মেশিনের কাজে শংকরকে ছেড়ে দিতে সম্মত নন। হাজার হোক গুরু পুরোহিত বংশের ছেলে তো। এ নিয়ে সন্ধ্যে বেলা অজয়ের সঙ্গে খানিকটা বচসাই হয়ে গেল। মা বলছিলেন,—অজয় এসে

সবে দাঁড়িয়েছে—তা হলে তোরা খোলাখুলি বলে দে ওকে কাজকর্ম দিতে পারবি না।

—সে কথা উঠছে কিসে, কাকা তো বলেই দিয়েছেন মেশিনের কাজ শিখতে এই বেলা। ভবিষ্যতের দুনিয়াই তো কলকব্জার।

—কলকব্জার কাজ ছাড়া ভদ্দর লোকের ছেলের মত কাজ নেই কিছু। ওইটুকু ছেলে, পুরুত গোসাঁই বংশ, তুই বলিস কী!

—কেরানীগিরি? তা সেও তো অল্পবিস্তর লেখাপড়া জানার দরকার। অন্ততঃপক্ষে কেরানীর কাজ কিম্বা ল্যাবরেটরীর কাজ, তার জন্যও তো অন্ততঃ পক্ষে ম্যাট্রিক পাস হওয়া চাই। এ জিনিসটা কি মা কিছুতেই তোমাকে বোঝানো যাবে না।

এসব উত্তর অন্যান্য দিনের মত আজও মায়ের মনঃপূত হল না তা বোঝা গেল। তিনি রাগতভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

হিরণমালার ধারণা আসলে শংকরকে এ বাড়ীর কেউ এতটুকু সমীহের চোখে দেখতে পারে না। অথচ কত বড় পণ্ডিত বংশের ছেলে। বরঞ্চ দুপুরুষ আগে যখন এখনকার মত রাক্ষুসে শহর আর দৈত্য দানবের মত এত কলকব্জার সৃষ্টি হয়নি—তখন এবাড়ীর বংশের লোকেরা ধরতো লাঙ্গলের মুঠো। আর শংকরের বাপ পিতামহ সেই আমলেই টোলে অধ্যাপনা করেছেন। গ্রহের ফেরে আজ সেই বংশের ছেলেকে লেখাপড়ার জন্য অবহেলা হজম করতে হচ্ছে। তাঁরই ছেলে, তাঁরই দেবর—অথচ বেচারার বিহিত করতে তিনি নিজে অসহায়। তিনি মুখে কিছু বললেন না অবশ্য এ সব কথা। ক্ষোভে খানিকটা ঝাল ঝাড়লেন ছেলের উপর,—বেশ তোরা না করিস, আমিই করবো।

গলার টাই খুলতে খুলতে অজয় একটু হাসল শুধু।

পুত্রের প্রতি রাগত দৃষ্টি হেনে বিধবা প্রস্থান করলেন। অজয়ও মায়ের এ দৃষ্টির সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত। তাই অযুক্ত কথা চেপেই নিরুত্তরে মায়ের গমন পথে তাকিয়ে রইল। বেবী অন্য পাশের দরজার মধ্য দিয়ে এসে উপস্থিত। পেছন থেকে মুচকি হাসতে হাসতে দাদাকে বললো—কী ব্যাপার দাদা। না আসতেই বাধিয়েছো তো কুরুক্ষেত্র।

অজয় বেবীর দিকে দৃষ্টি ফেরালো। দৃষ্টিপাতে বিরক্তি।

—দেশের ছেলেটিকে কেন্দ্র করে মাকে নিয়ে নিত্য এই কুরুক্ষেত্র। পারিস তো মাকে একটু বোঝা দিকিনি।

স্বভাবসিদ্ধ চটুল বাক্যবিন্যাসের মাধ্যমে বেবী বলল,—তা কি আর করা যাবে। মা একটু প্রেমেই যখন পড়ে গেছেন ছেলেটির।

চৌকাঠের বাইরে কি একটা কাজে এসে শংকর এসকল কথোপকথন শুনছিল দাঁড়িয়ে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শেষ পর্যন্ত সে শুনবার জন্য অপেক্ষা করল। একথা সত্য হিরণমালার নেহাৎ অনাত্মীয়কে আত্মীয় করে নেবার ক্ষমতা এবং বিশেষ করে শংকরের উপর তাঁর স্নেহের ঈষৎ পক্ষপাতদুষ্টতা শংকরকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানে। বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যেও বন্দীত্ব স্বীকার করায়। হয়ত এই আস্তানাটুকু বজায় থাকার রহস্য একমাত্র তিনিই। ফলে অহরহ একটা অসম্মানের কাঁটা কোথায় খচ খচ করে বেঁধে। মুখোমুখি অবশ্য কেউ বলে না কিছু। অজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, কথাও বলে। কিন্তু সমপর্যায়ভুক্ত লোকের সঙ্গে কথা বলার সুর কী তার কণ্ঠে! কোনদিন রাজা বসাকের পাশেও আহারের ঠাঁই হয়। কিন্তু আজ তার বিশেষ করে মনে হচ্ছে—আসমান জমি মাঝখানে, অনুগ্রাহক আর অনুগ্রহভাজন সম্পর্কের আসমান জমি।

মা ছেলের বাদানুবাদ তাকে উপলক্ষ্য করে। তার কানে আসে—আর সে মনে মনে তার শিল্পী সামর্থ্যের কথা চিন্তা করে। এবং তার চেয়েও শিল্পী আত্ম-নির্ভরতা তাকে ধিক্কার দেয়। অসম্মানের মর্মান্তিক জ্বালা জুতার কাঁটার মত দংশন করে। একটা প্রচণ্ড অভিমান ডুকরে ওঠে। হিরণমালার অকৃত্রিম স্নেহের আকর্ষণ সে ঝেড়ে ফেলে দেবে মনস্থ করে। কি দাম তার! তবুও আশ্চর্য মনের এ অবস্থায় হিরণমালার উপর অভিমান বিরূপতায় পর্যবসিত হয় না।

হঠাৎ নিজের উপরই নিজের মন বিরূপ হয়ে ওঠে। সত্যিই তো। কি আছে তার? দেহ নাই জন মজুরের মত অকাতরে গতরপাত করতে পারে। শিক্ষা নাই কলম পিষতে পারে। অথচ সম্মানবোধটুকু আছে পুরাদস্তুর। আর আছে অক্ষমতার বাহন আহ্লাদী দুস্তর অভিমান। তার এই অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, লাজুকতা, অভিমান আর অনভিজ্ঞতার এক দঙ্গল বোঝা নিয়ে সে কী করবে—কে বলে দেবে! কান্না পেয়ে যায় ওর। নিজের উপর অভিশাপ বর্ষণের ইচ্ছা জাগে।

ইতিমধ্যে হিরণমালা চৌকাঠ পার হয়ে আসতেই ওকে এই অবস্থায় দেখে ফেলে বলেন—শুনলে তো সব নিজ কানে। তুমি ওদের আপন বলে ভাবলে কী হবে, ওরা তো আর তা কেউ ভাবে না।—এই পর্যন্ত অনেকটা সাধারণ ভাবে

বলে হঠাৎ তাঁর কণ্ঠের ঝাজ তীব্র করে তুলে শেষের কথাগুলো উচ্চারণ করলেন—আমি একা তোমার প্রেমে পড়লে কী হবে বাবা।—বেবীর কথার প্রতিধ্বনি করে নিজের ক্রোধ ব্যক্ত করতে চান উনি। শংকর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে না। ঘাড় নীচু করে স্থানত্যাগ করে।

শংকর চলে যেতেই হিরণমালার হুঁশ হয়—এটা কী কাণ্ড করে বসলেন তিনি! কোথায় দেবর আর পুত্রের এই ব্যবহার আড়াল করে দাঁড়াবেন তিনি। বেচারার সঙ্গে মোলায়েম ব্যবহার করবেন। কিন্তু উত্তেজিত হয়ে একী করে বসলেন। শংকর হয়ত তাঁর কাছ থেকে এরকম অপ্রত্যাশিত কটু ব্যবহার আশা করে না। আর অজয়কেই বা কী মনে করছে সে। তাঁরই পেটের ছেলে। আর বেচারা শংকর যদি সকলের কাছ থেকেই এরকম কালো মুখ দেখবে—তাহলে থাকবে কী করে। শোচনা আসে মায়ের অন্তরে—উভয়ের জন্য। শংকরের বেদনা উনি অনুভব করেন আর মরমে মরে যান অজয়ের এরকম পরিচয় অত্যন্ত অসতর্ক মুহূর্তে শংকরের সামনে ফাঁস হয়ে পড়ায়। কী লজ্জা! গভীর অস্বস্তিতে উসখুস করেন দাঁড়িয়ে। বেবী এ ঘরে আসে।—কার সঙ্গে কথা কইছিলে মা।—মুখঝামটা সহকারে উত্তর তখনও অব্যাহত—যার প্রেমে পড়েছি।—তারপর দুমদাম আওয়াজ করে সুমুখ থেকে সরে যান। বেবী হাসে।

দরদলান অতিক্রম করে শংকর তার নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করে। কিছুদূর থেকে মা সেদিকে একান্তভাবে তাকিয়ে থাকেন। তাকিয়ে থাকেন আর ভাবেন। ছেলে না হয়ে মেয়ে হলেও শংকরকে মানাতো। শৈলীর ছেলে। হাত পায়ের গঠন আর শ্রীর মধ্যে কেমন যেন শৈলীর সেই সহজ মেয়েলী ছাপ। তার উপর সঞ্জুর সেই সোনালী চোখের তারা। আর সেই জন্যই তো বন্দী হয়েছেন বেশী করে। কিন্তু ওকে এবাড়ীর আপন করে নিতে পারলেন কৈ? কিন্তু না নিতে পারলেও তো স্বস্তি পাবেন মনে হয় না। একবার ইচ্ছা হয় এখুনি ছুটে গিয়ে বলে আসেন. সংশোধন করে আসেন ত্রুটি:—আমাকে ভুল বুঝোনা বাবা। তোমার দুঃখ আমি সত্যই বুঝি।

কতরকম করে উনি দেবর আর পুত্রের এই অবহেলার দৃষ্টি আড়াল করে ঢেকে রাখতে চেয়েছিলেন এতদিন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন কৈ। ওদের ঔদাসীন্যকে তাচ্ছিল্য ছাড়া অন্য কোন চোখে যে দেখতে পারেন না হিরণমালা।

শংকর ঘরের তক্তপোশে এসে বসল। বাড়ীর বাহির মহল। পাশাপাশি পরস্পর-বিরোধী দুটো চিন্তা এই সদ্য আঘাতের মধ্যে দিয়ে আবার মাথা তোলে।

দীর্ণ করে তোলে মগজকে। একদিকে হিরণমালা আর বেবীর আন্তরিকতার স্পর্শাতুর তার অনুভূতি জাগ্রত ; অন্যদিকে রাজা বসাক আর অজয়ের ঔদাসিন্যের ভঙ্গীতে সে আহত। হিরণমালা যে তার মা নন একথা এক মুহূর্তও চিন্তা করবার অবকাশ দেন না তাকে। এই মুহূর্তেও তিনি যে আক্রোশ ব্যক্ত করলেন —সেও যে তাঁর স্নেহধারারই আর এক রকমের অসহায় প্রকাশ এটুকু সে এতদিনে বুঝেছে। আর বেবী—সে তো মা নয়। কিন্তু মায়ের মেয়ে। বিবাহিতা এবং শিক্ষিতা। অথচ কৈ শংকর এবং রাজা ও অজয়ের মধ্যস্থ যে ব্যবধান—সে ব্যবধান শংকর ও বেবীর সম্পর্কের মধ্যে তো প্রাচীর তুলতে পারলো না। সদা হাস্যময়ী এই মেয়েটি তার আপন মহিমায় সর্বদা তাকে পাগল করে তোলে। বয়সে বেবী শংকর অপেক্ষা বেশ কিছুটা বড়। বেবীর এই চঞ্চল প্রাণস্পর্শের তলায় আর কী আছে বা নেই অত বিশ্লেষণ করার বুদ্ধি তার নেই। কিন্তু সে যে শকংরকে তার প্রাণের সজীব স্পর্শে অহরহ মাতিয়ে রাখতে চায় এটা স্পষ্ট ; অথবা নিজেকেই মাতিয়ে রাখতে চায় তাই বা কে বলবে। শংকর বাস্তবিক পক্ষে তাদের আশ্রিত একটা ছেলে। তার জন্য বেবীর কিই বা দায় থাকতে পারে। সময় অসময় নেই—হয়ত রাত্রি দুপুরে এসে জাগিয়ে তুলবে তাকে আর অত্যন্ত সহজে অত্যন্ত উদ্ভট এক প্রস্তাব করে বসবে—চল তাস খেলতে হবে। শংকরেরও সেই স্বভাব। কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাজার অসুবিধা হলেও স্ব-ইচ্ছা প্রয়োগের অক্ষমতা। সেজন্য সে নিজেও নাজেহাল হয় কম নয়। তবে একটা জিনিস সে বারবার অনুভব করেছে—এ বাড়ীর মেয়েমহল যত সহজ প্রাণের আত্মীয়তার আবেদনে তাকে বেঁধে রাখছে—পুরুষ মহল তত সহজ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে তাকে দূরে ঠেলছে। যখন সে হিরণমালা ও বেবীর কাছে থাকে সংকল্প করে—না না, এদের ত্যাগ করে অনিশ্চিত অথৈ জলে গিয়ে পড়া অর্থহীন। আর যখন রাজা বসাক আর অজয়ের নিটোল ঔদাসীন্যের সম্মুখীন হয় পুনরায় সংকল্প গিয়ার পরিবর্তন-উন্মুখ হয়ে ওঠে—না না না, এই আশ্রয়লাভের নিগ্রহ আর নয়। এ বাড়ী ত্যাগ সে করবেই। অনায়াসকে আর প্রশ্রয় নয়। স্বাবলম্বনের পথ খুঁজতে জনারণ্যে সে নেমে দাঁড়াবেই।

অর্থাৎ এই যে পরস্পর স্নেহের আকর্ষণ ও ঔদাসীন্যের বিকর্ষণ, এ দ্বন্দ্বের দাঁড়িপাল্লার—দুটি ধারই এমন সমান ওজনের যে সে ছাড়ি-ছাড়ি করেও ছেড়ে উঠতে পারছিল না। কল্পিত অসম্মান-বোধে বিদ্ধ হবার পরমুহূর্তে হিরণমালার আর বেবীর আত্মীয়-পরায়ণতায় বার বার ভুল হয়ে যেত সে অসম্মানের জ্বালা।

ভুল হয়ে যেত উত্তেজনার মুহূর্তে শপথের কথা। এতবড় একটা সামনাসামনি ঘটা দুর্ঘটের পরও এই দ্বন্দ্বের দাঁড়িপাল্লায় জয় পরাজয় অনিশ্চিতই থাকত যদি এর পরই অন্য বিপর্যয়টি একই দিনে না ঘটত। রাজা বসাকের পরিবারের সঙ্গে আবদ্ধ হবার দুর্ঘটনা, তার চেয়েও একটা অভাবনীয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে অবসান হোল অবশেষে সেই রাত্রেই।

॥ সাত ॥

বৈঠকখানা ঘরের দুয়ারে বড় গাড়িখানা এসে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন বসাক আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরলেন। সঙ্গে একজন বড় ব্যবসায়ী। তাঁর ব্যবসায়েরও অন্যতম একটা মোটা অংশের অংশীদার শিউনারায়ণ মারোয়াড়ী। জাঁদা ব্যবসাদার, শেয়ার বাজারের মুকুটমণি। ওঁরা এসে বৈঠকখানায় বসলেন। চাকর এসে আলো জালিয়ে দিয়ে গেল। পাশাপাশি অনেকগুলি করে কৌচ দ্বারা পরিবেষ্টিত কতকগুলি ছোট ছোট গোল টেবিল। একটি টেবিলের দু'পাশের কৌচে ওঁরা মুখোমুখি বসলেন। শিউনারায়ণ তার গৈরিক বর্ণের পাগড়িতে মাঝে মাঝে হাত বুলিয়ে ঠিক আছে কিনা দেখে নিতে লাগল। তারপর ছুঁচোর মত গোঁফ পাকিয়ে শুরু করলো।

—তা ডাগ্দার, ভ্যাক্সিনের অর্ডার তোমার মারে কে? ভ্যাক্সিনের ব্যাপারে সারা বাঙ্গালমে কোটেশানে কম্পিট করনেওয়ালা দোস্‌রা কোই আছে তোমার সঙ্গে?

বসাক তাঁর নিভে যাওয়া চুরুট ধরালেন। ভ্রূ কুঁচকে বললেন—তা হয়ত নেই; কিন্তু কোটেশানে কম্পিট করতে পারাটাই যদি এসব ব্যাপারে একমাত্র কোয়ালিফিকেশান হতো, তো বাঁচা যেতো। যাক কালকার ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিংই সে সব আলোচনার প্রপার জায়গা। এবার কিন্তু তোমাকে ডুব মেরে থাকলে চলছে না।

—আমাকে নিয়ে অত ভাবনার কী আছে। ওষুধের কারবারে আমরা বাঙ্গালী লোককে নির্ভর করি, ব্যস। কারণ ও কারবারে, আমার বিশ্বাস, আমরা মারওয়াড়ীরা হেরে গেছি। নইলে তুমি কি আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলে বাহাল তবিয়তে থাকতে পার ডাগ্দার।—বলে হো হো হো করে উচ্ছল হাসি হাসল শিউনারায়ণ।

—সে কথা ঠিক। কাপড়ের কারবারে তোমাদের হাতযশ যেমন একচেটিয়া, বাঙালীরও খানিকটা হাতযশ ওষুধের কারবারে আছে বৈকি। এই ধর বেঙ্গল ইম্যুনিটি, বেঙ্গল কেমিক্যাল, বড় বড় কারবার সবই বাঙালীর মাথা।

—কে না করছে ডাগ্দার সে কথা!

ডাক্তারের চুরুট ইতিমধ্যে আবার নিভে গিছলো কথার তোড়ে। দেশলাই জ্বেলে আবার নিভন্ত চুরুট ধরালেন। শিউনারায়ণ তার বক্তব্য শেষ করে নি তখনও।

—লেকিন বাৎ হচ্ছে কী জান! বাৎ হচ্ছে সিভিল মার্কেটে একদম নজর না দিয়ে সির্‌ফ্ সরকারী সাপ্লাই ধরে বসে থাকলে আপাততঃ রূপাইয়ায় দিক থেকে নাফা হবে বটে। কিন্তু ডাগ্দার, সিভিল পিপলের মার্কেট হাত-ছাড়া হয়ে যাবে. সরকারী সাপ্লাই বন্ধ হোলে—এই সিভিল মার্কেটই তো ব্যবসা বাঁচিয়ে রাখবে তোমার?

—নিশ্চয়।—ক্যাপ্টেন বসাক সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

—তাই বলছিলাম সেদিকেও থোড়া বহুত নজর রাখা বহুত জরুরী কাম—

—নিশ্চয়, শিওর। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া শুধু সিভিল মার্কেটে নির্ভর করলেই যদি ব্যবসা বাঁচতো। যাকগে—সে আমাকে বুঝতে দাও ব্রাদার। কালকার ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

—আলবৎ। তোমার ব্যাপার, তুমি যা ভাল বুঝবে কর। আমি একটু দোস্‌রা ব্যাপারে ব্যস্ত।—হঠাৎ গলাটা বাড়িয়ে কানের কাছে ফিস ফিস করে বললো শিউনারায়ণ—চাল!

—চাল! রট্। চাল আবার কী হবে,—বসাক অবাক হলেন।

—হাঁ চাল।—কণ্ঠে অপূর্ব আত্মবিশ্বাস।—আমার মনে হচ্ছে যে চালের ব্যাপারে বিরাট একটা সম্ভাওনা আসছে। তুমি ডাগ্দার মানুষ তোমাকে বলি না। কণ্ট্রোলভি উঠিয়ে দেবে গভর্ণমেণ্ট। রিলায়েব্‌ল সূত্রের খবর।

মুচকি হাসলেন বসাক।—কোয়াইট ইয়োর বিজ্‌নেস্। হাউয়েভার, তোমার চালের ব্যাপারে যদি সম্ভাবনা এসে থাকে তবে রিলিফের বিজ্‌নেসের জন্যও তৈরী থেকো। চাল আর রিলিফ পরস্পর কম্প্লিমেণ্টারী। যুদ্ধের সময় মনে আছে তো। কিন্তু যতই বল ব্রাদার, চালের ব্যাপারে যুদ্ধের মার্কেট আর ফেরৎ পাওয়া যাবে না এটা নিশ্চিত।—কথায় টিটকারি প্রচ্ছন্ন।

—এই তো কোরিয়ার যুদ্ধ জমে উঠল। শেয়ার মার্কেটের কথা মনে

পড়ছে? চাই কি আরও বড় যুদ্ধ লাগবে না হলফ করে কেউ বলতে পারে না।

—তবে এটা হলফ করে বলা যায় গত যুদ্ধের মরশুমের মত চাল আর রিলিফের ব্যবসা নেভার নেভার।—বসাকের একথার মধ্যেও কটাক্ষপাত ছিল কিনা কে জানে। শিউনারায়ণ বসাকের প্রতি কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ বোধ করল কিনা সে বিষয়ও তার কথা দ্বারা পরিষ্কার বোঝা গেল না।

—মারওয়াড়ীদের সম্পর্কে বাঙ্গালীদের মধ্যে বড় অ্যান্টি প্রোপেগাণ্ডা। যখন ভাল কাজ ভি করি, তার মধ্যেও ওই রকম সব উদ্দেশ্য খুঁজে বার করবেই করবে তোমরা। হতে পারে মারওয়াড়ী বংশে জন্ম। তোমাদের জল হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলিনি নিজেকে?

—না মিশিয়ে ফেলতে পারলে বাংলার শেয়ার মার্কেটের সুতো আর তোমাদের হাতে যায় কী করে। তবে আই মাস্ট ছে, তোমার চালের বিজ্‌নেস্ ইজ নো বিজ্‌নেস্। একটা ছ্যাঁচড়া ব্যাপার।

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙালী ব্যবসাদার হিসাবে মারওয়াড়ী ব্যবসাদারদের প্রতি একটা সুপ্ত বিরোধ, ক্যাপ্টেন বসাকের মধ্যেও হয়ত ছিল। ফাঁক পেয়ে সন্তর্পণে সে একবার মাথা তুললো।—যেন তেন উপায়ে টাকা কামানো মাত্রই বিজ্‌নেস্, আই ডোণ্ট থিংক ছো।

শিউনারায়ণ এ কর্ণমূল থেকে ও কর্ণমূল অবধি বিস্তৃত এক হাসির দ্বারা সে কথা ডুবিয়ে দিল। বললো—যাক সে সব কথা। তাহলে তুমি কাল মিটিং-এর আগে আমার বাড়ী হয়ে আমায় তুলে নিয়ে এসো বরং—

—ও শিওর।—

—বেশ তাহলে উঠি।—

—এখনই?

—হাঁ এখনই।

—বেশ।—

শিউনারায়ণ চলে যেতে বসাক একটু আয়াস করে বসে নিলেন। পা দুটো টেবিলের উপর তুলে দিয়ে মৃদু মৃদু নাড়া দিতে লাগলেন। আর চোখ বুজে কি যেন গভীর চিন্তা শুরু করলেন কাউকে না ডেকে। দাঁতে জ্বলন্ত চুরুট অব্যাহত।

ইত্যবসরে বেবী শংকরকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে এনে হাজির করল সেখানে। দরজার ওধার থেকেই বলল শংকরকে—কাকা নিজমুখে তোমাকে বলেছেন কিছু?

আজ তোমাকেই বলতে হবে মুখ খুলে। —কি বলা প্রয়োজন তা সম্ভবতঃ সে নিজেও খানিকটা শিখিয়ে দিয়েছিল শংকরকে। শংকর তবুও কিছুতেই আর অগ্রসর হতে চায় না। অবশেষে অতিকষ্টে পেছনে এসে দাঁড়ালো। বসাক কিন্তু টের পান নি বিন্দুবিসর্গ। কারণ নিজের চিন্তায় নিজেই তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন। এত কাছে এসেও শংকর ভরসা করে ডাকতে পারলো না। সোজা করে সোজা কথা বলা যে এত কঠিন কেন ও ভেবে পায় না। কিছুতেই গলা থেকে স্বর বেরুতে চায় না। অগত্যা ব্যাপার লক্ষ্য করে বেবীই এসে ডাকলো—কাকাবাবু!

কাকাবাবু ধড়মড় করে উঠে বসলেন। —কিরে

—শংকর কিছু বলতে চায় আপনাকে।

শংকর ঘেমে উঠলো। হঠাৎ এরকম অবস্থায় পড়ে কথা বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বলেই ফেললো আড়মোড়া ভেঙ্গে—মানে—আপনাদের কি সব ওষুধের কারখানা আছে। সত্যিই নাকি……

দুই চোখ বিস্ফারিত করে বসাক সোজা হয়ে বসে নিলেন—সত্যিই নাকি। হোআট ডু ইউ মিন? মিথ্যে বলে মনে হয় নাকি তোমার?

—না মানে ঠিক তা নয়… —অর্ধপথে তার অসম্পূর্ণ বক্তব্য সম্পূর্ণ হয়ে যায়। অবশ্য বুঝতে কষ্ট হয় না ঠিক ঠিক যা বলতে চেয়েছিলো তা বলে উঠতে পারে নি শংকর। হঠাৎ মাঝপথে সকল কথা তার তালগোল পাকিয়ে গেছে।

যেটুকু সে বলে ফেলেছিল তার জন্য পারিশ্রমিক দিল প্রচুর। অর্থাৎ লাল হয়ে উঠল। কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে রাইট্ অ্যাবাউট টার্ণ করে ইংরেজীতে যাকে বলে এক অক্ওআর্ড ভঙ্গীতে নিষ্ক্রান্ত হলো।

বসাক সেদিক পানে তাকিয়ে বললো—পাগল নাকি ছেলেটা। তারপর বেবীর দিকে দৃষ্টিপাত ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—ব্যাপারখানা কী বল তো।

শংকরের জন্য বেবীর লজ্জা বোধ হচ্ছিল। এমন অকর্মণ্য আর জটিল ছেলে সে দেখে নি। অন্যদিকে মমতায় তার হৃদয়ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল কম নয়। অতএব ওকালতি করতে হল তাকে—ব্যাপারখানা হচ্ছে—আপনার অফিসে একটা চাকরি চাই ওর।

—চাকরি! ও কী চাকরি করবে? ওর মাথারই ঠিক আছে কিনা আমি ভেবে পাচ্ছি না। ও আবার চাকরি করবে কী।

বেবী ব্যথিত হল। বলল হঠাৎ দার্শনিকভাবে।

—চোরকে চোর ভেবেই আপনারা খুশী। একবার খতিয়ে দেখবেন না বেচারা চুরি করে কেন।

—কি বলতে চাস তুই—

—বলতে চাই মাথার ঠিক থাকবে কী করে। ওই তো ছেলে। তারই উপর নির্ভরশীল এক মস্ত সংসার। তাদের অন্নবস্ত্র জুটছে কী জুটছে না সে এক দুশ্চিন্তা, তার উপর অন্যের অনুগ্রহভাজন হয়ে বাস করার সুখও রয়েছে।

—কি ব্যাপার, ওকালতিতে এতটা পঞ্চমুখ হয়ে উঠলি কেন তুই।

সে কথা বিশেষ গ্রাহ্য না করে বেবী বলে—কাজেই মাথা ঠিক করার জন্যই ওকে একটা চাকরি অর্থাৎ উপার্জনের উপায় আপনাকে করে দিতেই হবে!

—হুকুম নাকি তোর।

—কেন, হুকুম না হোক দাবিও তো করতে পারি।—সহজাত আবদার বসাক ঠিক অগ্রাহ্য করতে না পেরে বলেন,—আচ্ছা সে হবে'খন। আর এ সব নিয়ে অজয়কেই বলতে পারিস। কারখানার ভেতরের ব্যাপার তারই দেখাশুনার দায়িত্ব এখন হিসেব মত। আমি আজকাল আর রোজ গিয়ে উঠতেও পারি না। বুঝলি তো আমি একটু ফরেন পলিসি নিয়ে ব্যস্ত।

—সে তো কানেই তুলতে চায় না তেমন করে।

—তা বেশ আমি বলে দেব'খন।

—কবে?

—আরে বাপরে। এখুনিই দিতে হবে নাকি? আমি কথা দিচ্ছি।

—তাহলে শংকরকে জানিয়ে রাখি।

—এখুনি না জানিয়ে রাখলেই কি নয়?

—খানিকটা স্বস্তি বোধ করবে।

কখন চুরুট নিভে গিয়েছিলো পুনরায়। পকেট থেকে দেশলাই বের করতে করতে নিজে নিজেই বললেন—এই চুরুট জিনিসটার মত বিশ্বাসঘাতক আর দ্বিতীয় নেই। চার্চিল সাহেব যে কি সুখে এদের এত পছন্দ করেন বুঝিনা।

—চার্চিলের চুরুট আপনার মত বার বার নেভে নাকি—বেবী হাসতে হাসতে কথার জবাব করল।

বসাক ততক্ষণে চুরুট জ্বালিয়ে নিয়েছেন। সস্মিত হাসিতে মুখমণ্ডল ভরে তুললেন কিন্তু উত্থাপন করলেন পুরাতন প্রসঙ্গ—শংকরকে খবরটা দিতে যাচ্ছিস তো।

—নিশ্চয়—বেবী ছদ্ম গাম্ভীর্যের আড়াল টানল।

—তাহলে দেখছি এবার সংসার ধর্মটর্ম ছেড়ে রামকৃষ্ণ মঠটঠ কোথাও তোর যাওয়া প্রয়োজন।—এবারও মস্করার উত্তর মস্করা করেই দিল বেবী—দেখুনই না অতদূর না গিয়ে বাড়ীটাকেই এবার মঠ করে ফেলবো।

॥ আট ॥

সন্ধ্যার বেশী বাকী নেই। মনে মনে যা কিছু ভাবে কোন এক রহস্যাবৃত কারণে মানুষের সামনে এসে তা যে এমন উল্টে পাল্টে জট পাকিয়ে যায়—গুছিয়ে বলে উঠতে পারে না—এ অক্ষমতা সত্যই আজ অসহ্য পীড়া দিতে থাকে শংকরকে। ঘরে পৌঁছে তক্তপোশের উপর শতরঞ্জি টেনে বসে পড়ল। ঘরে মন টিকতে চায় না অথচ বসে বসে মনে মনে হয়রান হওয়া ছাড়া কাজও কিছু নেই। বিপর্যস্ত দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকায়। ম্লান হয়ে আসা আলোকে আড়াল করে প্রবেশ করছে বেবী। মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর। চলন থমথমে। উচ্ছ্বাসের কানায় কানায় ভরা সংক্রামক প্রাণ-রসে পুষ্ট বেবীকে দেখতেই সে সচরাচর অভ্যস্ত। এ মূর্তিতে নয়।

সোজা বেবী শংকরের তক্তপোশের পাশে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, কয়েকটা প্রশ্ন করবো শংকর। কথা দাও তো ঠিক ঠিক উত্তর দেবে।

কোল-আঁধারে ভরা এই নিরালা ঘরের মধ্যে এ সোজা প্রশ্নের আঘাতে কেমন যেন জড়তা অনুভব করে। কি একটা অজানা চাপা স্নায়বিক দুর্বলতা তার সারা শরীরের উপর ঝিঁঝি ডেকে যায়। সহজ প্রশ্নের জবাব কঠিন মনে হয়; ঢোক গিলে আমতা আমতা করে—কি, মানে কি হয়েছে!—

—হয়নি কিছু। ঠিক ঠিক উত্তর দাও তো!—শংকর অভিভূতের মত ঘাড় নেড়ে ফেলে অসতর্ক ভাবে।

—আচ্ছা শংকর, বল তো তুমি এত জটিল কেন?

ঘাবড়ে যায় প্রশ্নে।— জটিল! আমি কী জটিল?

—হাঁ তুমি জটিল।

—তা হলে, হবো হয়ত!—নির্বিকার জবাব।

—এই দেখ, আবার জটিল হয়ে উঠছ; অন্ততঃ আমার কাছে জটিল না হয়ে তুমি তো সহজ হতে পার। কি তোমার প্রয়োজন, কোথায় তোমার বাধা—এসব

আমার কাছে গোপন করতে লাজ না হয়ে উঠলে উপকার বৈ ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, সম্মান অসম্মানের প্রশ্নও অবান্তর—একি এতদিনেও তুমি বোঝনি ?

শকংর শক্ত হয়ে নেয়। একটা ঠুনকো আত্মসম্মানবোধ গর্জে ওঠে তলায় তলায়। চাপা একটা তেজ ভীরুতার নীচে আড়মোড়া ভাঙ্গে। একটা মেয়ে, একটা মেয়ে যে তাকে সহানুভূতি দেখাতে চাইছে! সহসা শক্ত হয়ে নেয়। পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে—আমায় মাপ করো ভাই। আমি সহজ নই অতএব সহজ হতে পারবো না। আমি বলতে পারবো না কিছু ব্যস্।

ঈষৎ হাসলো বেবী কিন্তু ছাড়ল না।—কেন পারবে না সেটাই নাহয় বল। আমরা যে তোমার সঙ্গে আমাদের অন্তঃপুরের দরজা খুলে তোমাকে এত অন্তরঙ্গ করতে চাইলাম সে কি কিছুই নয়!

নাঃ একি শুধুই সহানুভূতি? কণ্ঠে আন্তরিকতার এই যে যাদু-স্পর্শ একি সহানুভূতিই শুধু। তার বেশী কিছু নয়! অতএব অনুভূতির শিরা পার্শ্ব পরিবর্তন করে—শংকরের। মনটা হঠাৎ ব্যথিত হয়ে উঠতে চায়। হৃদয়ের উত্তাপ মেশানো আবেদনের কাছে আপন দুর্বলতা যেন চাড়া দিয়ে ওঠে মুহূর্তের মধ্যে! বলে—বলবো?

—বলবেই তো?—বেবীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কিন্তু কী যে বলবে, কি জন্য যে নিজেকে খুলে ধরতে পারে না, নিজেই কি হাতড়ে পায় বেচারী! ঠিক ঠিক হাতড়ে না পেলেও যতটুকু হদিস পায় প্রথম অকপটে বলবার সাহস অর্জন করে। মুখ কাঁচুমাচু করে বলে,—কী বা বলবো। এই ধর, আমি গরীব; আমার কেমন মনে হয় সকলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে প্যাট্ প্যাট্ করে; হয় শাসাচ্ছে, নয় টিট্‌কারি কাটছে হেসে হেসে। মনে কি যে লজ্জা কোথা থেকে ঝড়ের মত এসে আমায় গ্রাস করে—কি বলবো···। —অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে বেবী শোনে। বলে,—তুমি যে সত্যই এতটা অকপটে জড়তা কাটিয়ে আমাকে বলতে পেরেছো এজন্য আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু দারিদ্র্যকে তুমি লজ্জার বিষয় বলে মনে কর কেন—বল তো? গরীব হওয়া তো লজ্জার নয়। কিন্তু গরীব বলে লজ্জা বোধ করা যে সত্যই মানুষকে খাটো করে।

শংকর বেবীকে হতাশ করে উত্তর দেয়—কিন্তু আমি কী করবো। এখানকার এই পরিবেশে ওই সব ছাড়া আর কিছুই যে আমার মনে আসে না ছাই। আমি কি ইচ্ছে করে·········।

অসহায় ছেলেমানুষের মত নিজের অক্ষমতাকে সঁপে দিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ লাগে না বেবীর কাছে।

।—রূঢ় হও। উদ্ধত হও এখন থেকে। অন্তর থেকে দরিদ্র হবার লজ্জাকে প্রশ্রয় না দেবার চেষ্টা কর। দেখবে কত সহজ হয়ে উঠছে ক্রমে। নইলে পৃথিবীর, আমার মত দু' একজন ছাড়া কেউ যে তোমায় বুঝবে না।

বেবীর কণ্ঠে আন্তরিকতার প্রকাশে ক্রমশঃ আবেগ প্রাধান্য পাচ্ছে, অভিভূত শংকরের তা লক্ষ্য এড়ায় না! কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল তার। সন্দেহ উঁকিঝুকি মারতে লাগল। এত আত্মীয়তা একী ভাল। উঠে দাঁড়ালো। অভিভূত ভাব এক ঝটকায় কাটিয়ে ফেলে বেবীকে বিস্মিত করে বলে উঠল—বাইরে বেরুতে হবে। একটু কাজ আছে।—বেবী কিছু বলবার অবকাশ পাবার পূর্বেই সে দরজা পেরিয়ে সিঁড়িতে নেমে দাঁড়ালো।

বেবী তক্তপোশের উপর বসে হতবাকের মত ভাবতে লাগল, সত্যই শংকর একটি অদ্ভুত জীব।

তারপর অনেক রাত্রে শংকর চোরের মত ফিরে এল। কেন যেন নিজের অস্তিত্বের বিজ্ঞপ্তি সে বেবীর নজর থেকে সরিয়ে রাখতে চায়। অত জেরা, অত আত্মীয়তা এসবকে কী ভয় করবার কিছুই নেই। অন্ধকার ঘরে আলোর সুইচ টিপে সে দুঃস্বপ্নের মত এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে থ হয়ে যায়। যাকে এড়াবার জন্য এত আত্মগোপন করার ছল, সেই বেবী যে তক্তপোশের উপর বসে থাকবে এখনও অবধি, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে কে জানতো। কাঠ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারল না। সত্যিই তো, সে কাঁদে কেন? বেবীরও কী আবার দুঃখ আছে নাকি। কাঁদার মত দুঃখ। দারিদ্র্য আর অভাবের যন্ত্রণাদায়ক স্থূল দুঃখ ছাড়াও কি আরো দুঃখ থাকে,—যা বিত্তবান পরিবেশের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং হৃদয়কে পীড়িত করে, কাঁদায়! শংকর এই প্রথম জানল। জিজ্ঞাসা অধীর হয়ে উঠল—বেবীরা কাঁদে কেন? বিত্তশালীদের ক্রন্দনের উৎস কি বিত্তহীন থেকে আরও গভীর মাটির তলদেশে তার জট নামিয়ে দেয়? অসীম সহানুভূতিতে শংকরের হৃদয় আপ্লুত হয়। কি একটা ভাষাহীন অভিভূতি তার চেতনায় শির শির করে। এতদিন সে কেবল সহানুভূতিই কুড়িয়ে ফিরেছে। আজ সহানুভূতি প্রদর্শনের এক বিচিত্র অনুভূতিতে সে গভীর তৃপ্তি বোধ করে। কিন্তু এই নতুন ধরনের একফালি তৃপ্তির উপলব্ধি

উপভোগ্য হলেও তার পক্ষে অর্থ হাতড়ে পাওয়া বেশ দুষ্কর হয়ে ওঠে। পরিশ্রান্ত চিন্তা ও টনটন করে ওঠা পদদ্বয়ের অবকাশ নেবার প্রয়োজনীয়তায় অগত্যা তক্তপোশেরই একধারে স্থান করে নেয়।

অতি কষ্টে কণ্ঠ হতে স্বর বার করে ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে ডাকে—কি হলো তোমার—

উত্তর নেই। আরও দু'চারবার ডাকে। কিন্তু ক্রন্দনের চাপা শব্দ ছাড়া কোন জবাব পাওয়া যায় না।

অতএব সাহস সঞ্চয় করতেই হয়। ডান হাতের দুটো আঙ্গুল বেবীর ঝিম-ধরা হাতের উপর আলতো করে ছোঁয়। স্পর্শশঙ্কাতুর স্পর্শদ্বারা ভয়ে ভয়ে নাড়া দেয়। —কী হলো তোমার—শঙ্কাতুর কণ্ঠস্বরের মধ্যে সমবেদনার উত্তাপও কিঞ্চিৎ এসে মেশে।

জবার মত চোখ দুটো তুলে বেবী এতক্ষণে তাকায়। শংকরের হাত চেপে ধরে আবার কান্নার আবেগে ভেঙ্গে পড়ে। স্পর্শশঙ্কাতুর স্পর্শ তার হাতের মধ্যে আটকে যায়। গভীর সমবেদনায় সে না পারে ছাড়িয়ে নিতে, না পারে হাতখানি নিশ্চিন্তে সমর্পণ করার ভরসায় নিজেকে সঞ্জীবিত রাগতে। ফলে খানিকটা এগিয়ে বসতে হয়। ক্রন্দনোচ্ছ্বাসের প্রতিটি ধমকে আর দেহের ছোঁয়ায়, কেশের বিচিত্র গন্ধে—ক্রমশঃ শংকরের দেহমনে রোমাঞ্চ সঞ্চারিত হয়। বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করে ওঠে।

রোমাঞ্চ পর্যবসিত হয় ধূমায়িত উত্তেজনায়। আপন ইচ্ছা হয়ে ওঠে স্তিমিত। কেমন একটা না জানা আশঙ্কা আর আয়াসের পাশাপাশি দ্বন্দ্ব তাকে অন্তর্দ্ধ করে রাখে। তার পাশে যে একজন যুবতী, পরিপূর্ণ দেহভার ক্রমশঃ যে তার দেহ ঘেঁষে উঠছে, এ অনুভূতি সজাগ অথচ নিরস্ত করার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলে।

নিমেষে কী হতে কী হয়ে যায়। কাঁচপোকা যেমন করে অবহেলায় আরসুলাকে টেনে নিয়ে যায়, বেবী শংকরের সমস্ত ইচ্ছাকে আচ্ছন্ন করে শংকরের মুখখানিকে তৃণখণ্ডের মত নিজ করতলে এক সময় চেপে ধরে—যেন ছোট্ট ছেলে কোন। ওষ্ঠাধর অঙ্কিত করে দেয় তার কপালে। শংকরের অবচেতন মনের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠা এই নারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পুঞ্জিত হয়ে ওঠে। অথচ কী যেন তাকে শক্তিহীন করে রেখেছে, সে বুঝতে পারে না। আপাত-অনুভূত আয়াস আর উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলীর আবেগের রোমাঞ্চ বেবীর এই আচমকা বিশ্বাসঘাতী আক্রমণের বিরোধিতা করার প্রয়াসকে দাবিয়ে রাখে।

এই মুহূর্তগুলি চিরকালের নয়। সময় আসে যখন এই প্লাবিত মুহূর্তের অবসান ঘটে। শংকর—তার কপালের উপর তখনও ঈষদুষ্ণ একখানি কমনীয় স্পর্শের আর লোনা জলের স্বাদ অনুভব করে তখনও।

বেবী উঠে দাঁড়ায়। উদ্‌ভ্রান্তের মত টলতে টলতে বলে—শংকর, ভুল বুঝোনা যেন লক্ষ্মীটি।

পরে টলতে টলতেই উত্তরের অপেক্ষা না করে বার হয়ে যায়। সহসা শংকর সব কিছু নীতিবোধের প্রেরণা কাটিয়ে উঠে দাঁড়ায়। অপ্রত্যাশিত জোর দিয়ে সে কথা বলে পিছন থেকে ক্ষিপ্তের মত—আমি ভীরু, বড় গলা করে কিছু বলবার আর বড় সাহস করে কিছু করবার শক্তি আমার নেই। তা বলে তুমি কী আমায় ঠাট্টা করচ, তুমি কী ঠাট্টা করচ ?

এত স্পষ্ট ও এত অস্বাভাবিক ধরনের সংলাপ শংকরের মত ছেলের মুখ থেকে বেরোয় এক মাতাল হলে আর কখন তা বেবী জানে। তাই বুঝতে পারে অসহায় উত্তেজনা-প্রপীড়িত শংকরের মানসিক অবস্থা। ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্বিঘ্নে দুই হাতে তার কাঁধ ধরে নাড়া দিয়ে বলে অনেক স্বাভাবিক সুরে—ছিঃ অত চঞ্চল হতে আছে না কী ভাই।—যেন শংকর ছোট্ট ছেলেটি, কনিষ্ঠ স্নেহাস্পদ কোন।

শংকর মিইয়ে যায়। বেবী কম্পিত পদে কক্ষ ত্যাগ করে। এবার শংকর লজ্জায় মরমে মরে যায়। সমস্ত ঘটনাটি আনুপূর্ব মাথায় ঘুরে আসে। কোন কিছু স্থির নিশ্চিত করে বুঝবার ভরসা সে হারিয়ে না ফেলে পারে না এর পর। বেবী তার বয়োজ্যেষ্ঠা। যত কিঞ্চিৎই হোক। সে বিবাহিতা। তার আচরণ প্রথমে সে বিশ্বাস করে না উঠতে পারলেও বিভ্রান্ত হয়েছিলো। পরে হতবুদ্ধি এবং তার দুর্নীতিপরায়ণতাকেও সে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে পেরেছিল। সেও ছিল ভাল। বেবীর বৃহত্তর ব্যক্তিত্বের ঘায়ে তার সদিচ্ছা শক্তিহীনের মত অথর্ব হয়েছিল সত্য তবু এ হেঁয়ালির চেয়ে সেও ছিল ভাল। প্রথম যে দুর্নীতিপরায়ণতার জন্য মনে মনে বেবীকে অনুকম্পা করতে উঠেছিলো—সেই দুর্নীতির দুর্নিবার আকর্ষণে নীতিবোধের সংযত চিন্তা হারিয়ে সে নিজেই নির্লজ্জ হয়ে উঠল। ভাবতে মরমে মরে যেতে ইচ্ছা করলেও—সেও ছিল ভাল। কিন্তু বেবীর শেষের সম্বোধনগুলি তাকেই যে দুর্নীতিপরায়ণতার দায়ে ফেলে গেল শেষ পর্যন্ত। এর পর কি করে মাথা তুলে আর চোখ মেলে বেবীর সামনে দাঁড়াবে সে ? অথচ তার বিজয়ী দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে বলিষ্ঠ শেষের দৃষ্টিপাতে কৈ অপরাধের কোন ছায়া তো সে খুঁজে পেল না। যে অপরাধে বেবীকে অভিযুক্ত করার

কথা—সেই অপরাধ তারই ভাগে রইল অবশিষ্ট। শত বৃশ্চিক জ্বালার মত মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে কি যেন ঘুরে বেড়াতে লাগলো শির্ শির্ করে। অনেক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিন্তা করেও বেবীর আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে বার করতে না পেরে আপন অপরাধ-প্রণবতায় প্রায় নিঃসন্দেহ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর না পেয়ে গুম হয়ে বসে রইল। ভাবনা তোলপাড় করে ফিরতে লাগল, কী করে সে বেবীর চোখে চোখ রেখে কথা বলবে এর পর?

মাসাধিক যাবৎ যে দ্বন্দ্বের কিনারা মেলে নাই, আজ সে দ্বন্দ্বের একটা ফয়সালা হয়ে গেল। পথ একটি মাত্র। নিজের শতছিন্ন দারিদ্র্যের লজ্জা, দুর্নীতিবোধের লজ্জা, কাপুরুষতার লজ্জা, সকল লজ্জার অবসান করবার একটি পথের দ্বার সহসা উন্মুক্ত হয়ে গেল চোখের সামনে।

পরদিন সূর্য আটটার কোঠা ছাড়িয়ে নটায় উন্নীত হল। বাড়ীর চিরাচরিত প্রথামত নিদ্রাভঙ্গের পর একসঙ্গে চা পানের আসরে শংকরের অনুপস্থিতির জন্য খোজ পড়ল। কিন্তু কোন সন্ধান মিলল না। ক্রমে দুপুর, সন্ধ্যা ও রাত্রি ঘুরে আসে। শংকর তার ক্ষীণ উপস্থিতির দুর্বার বোঝা টেনে বসাক বাড়ীর কোন সভ্যের সম্মুখীনই আর হয় না। বেবীর চোখ দুটি বারংবার ঘুরে ঘুরে শংকরের শয়ন গৃহের দুয়ার অবধি এসে বৃথাই ফিরে যায়। মায়ের চিন্তা উদ্বেগে পরিণত হয়।

কোন একটা দুঃস্বপ্ন অথবা কুগ্রহ যেন কিছুদিন বসাকদের প্রাসাদে ভর করেছিলো। আজ প্রাসাদ অনেক দিন পর রাহুমুক্ত।

॥ নয় ॥

কলেজ থেকে অনিয়মিত সময় ফিরে, প্রথমেই রঞ্জিত ঘরে ঢুকে হাতের খাতা ও বইপত্র রাখল। স্যুটকেশ খুলে ঠিকানাটি বার করতে হবে এখুনিই। যতীনদের আড্ডায় আজ যাওয়ার একান্ত তাগাদা আছে। যতীনের কথা মনে হতেই একটা ভাবালুতা ওর ভাবনাকে কাঁপায়। এরা বেশ। দেশের ভগ্ন মৃত্তিকায় মাথা ঠুকে হা পিত্তেশ করার কাজ, সে এদের নয়। হতভাগ্য জীবনের ক্লেদাক্ত বোঝার পাশ মুক্ত হয়ে মজ্জমান জাহাজের মাস্তুল জাগিয়ে রাখবার জন্য এদের কর্মকাণ্ড।

রঞ্জিতের অবশ্য এদের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য নেই। কিন্তু মামুলী জীবনের গতানুগতিক পথ, সব কিছুকে নির্বিবাদে স্বীকার করে নেবার পথ, কোন রকমে দিন

গুজরান করে, বিরাট পৃথিবীর কোন এককোণে একটুখানি অস্তিত্ব যেমন তেমন করে বজায় রাখবার নির্জীব পথ,—গ্রহণ করতে রঞ্জিতের মনে আতঙ্ক জাগে। আশা নেই, নীতি নেই, প্রতিবাদ নেই, প্রতিরোধের স্পৃহা পর্যন্ত অবদমিত, বন্দীত্বের অসহায়তা বোধ পর্যন্ত স্তিমিত। সেই কিছু পাস করা, সেই ভাগ্যক্রমে উপার্জনের একটি শাখা আঁকড়ানো, সেই বিবাহ, সংসার, সন্তানসন্ততি, বৃদ্ধত্ব, দারিদ্র্য—অবশেষে মৃত্যু। অপূর্ব পরাজয়। পরাজয় বোধের গ্লানিটুকু পর্যন্ত নেই। নিজের জীবনকে এমনিতর কল্পনা করা আর হিন্দুবধুর অকালবৈধব্য—উঃ কী ভীষণ! সমস্ত ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সূর্যালোকের উপর যেন ঘনায়মান একখানি কালো রাত্রির পর্দা। আর কিছু না থাক—বর্তমানের সামাজিক শৃঙ্খলকে অস্বীকার করার স্পর্ধা আর যতটুকু শক্তি শেষনিঃশ্বাস অবধি লড়াই করে জয়ী হবার দুরন্ত বেগ লীলায়িত থাক তার অসহ্য রক্তে।

নইলে বাঁচবার কি আছে। সে ক্ষণিকের জন্য এমনিতর সামাজিক জোয়ালের তলায় নিজেকে কল্পনা করে—আর মনে হয় সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। বৃদ্ধের মতই বাঁচার সকল সম্পদ তার খোয়া গেছে।

—এই যে তুমি এসেছ—কাকা যেন কোন্ সময় ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন।

—হাঁ একটু সকাল সকালই এসে পড়েছি আজ—নিজের আত্মস্বপনা সে সংযত করে নেয়।

—তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল কিনা তাই। অবশ্য তোমার মতামত নেবার জন্য নয়,—তোমাকে জানাবার জন্য।

রঞ্জিত একটু শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করল—কী ব্যাপার বলুন তো—আমাকে না জানালেই কী নয়? —কথা বলার ধরনটা একটু কেমন কেমন লাগে।

রঞ্জিতের কাকা বসে নিলেন ইজি চেয়ারটায়। সম্মুখে তাকের উপর পড়ার বইয়ের ফাঁকে 'সেভেন ডেজ হ্বাট শুক দি আর্থ' বইখানার 'শুক দি আর্থ' কথা কটিই প্রথমে নজরে আসে। সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন—ও বইখানিও কি কোর্সে আছে নাকি!

—কোর্সে না থাকলেই যে পড়া যাবে না এমন কিছু আইন তো নেই।

—তা নেই বটে; কিন্তু ছাত্রদের নিজেদেরও একটা নৈতিক আইন থাকা দরকার। পড়ার বই পড়ে যে ক্লাসে সময় থাকে না, সেখানে বাইরের বই পড়ার আইন সত্যিকারের ছাত্রদের থাকা উচিত নয়।

অন্য ছেলের মত রঞ্জিত কাকাকে সমীহ করলেও স্পষ্ট কথা বলতেও ভয় পায় না, অমনঃপুত হলে। থমকে দাঁড়িয়ে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে বলে,—আমি স্কুলের ছাত্র নই যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে বলে দিতে হবে, কোন্‌টা পড়বো, কোন্‌টা পড়বো না, কোন্‌টা করবো, কোন্‌টা করবো না। আমার একটা নিজস্ব মতামত নিজের ভালমন্দ বিবেচনার ক্ষমতাও এতদিনে হওয়া উচিত বলে কী আপনি মনে করেন না?

—ছেলেদের এটা একটা চিরকালের অনুযোগ। আমরাও করেছি আমাদের অভিভাবকদের কাছে। যখন আমাদের হিতাহিত বিবেক বিবেচনা জন্মেছে তখনও তাঁরা তা স্বীকার করেন নি। সেই মত চলতে দেন নি। কিন্তু এখন এই বয়সে এসে বুঝেছি তোমাদের ও বয়সে নিজস্ব মতামত আর বিবেচনার একটা অভিমান থাকে—আসলে মতামত কিছু থাকে না।

রঞ্জিত বুঝবার চেষ্টা করে—কাকা এমন আচমকা তার উপর আক্রমণ করছেন কেন। তিনি পুনরায় শুরু করেন,—কোন্‌টা করবে কোন্‌টা করবে না সে সম্পর্কে কিছুই তো বলিনি এখনও। শুধু কোন্‌টা পড়বে কোন্‌টা পড়বে না, তাই নিয়ে সামান্য বলেছিলাম। তাতেই দেখছি তোমার অভিমানে লেগেছে। কাজেই এরপর কোন্‌টা করবে আর করবে না সে সম্পর্কে কিছু বললে কি আর রক্ষা রাখতে বাপু!—শেষের দিকে টেনে একটু ম্লান হাসার চেষ্টা করেন।

রঞ্জিত এই আঘাতে একটু আহত হয়। কিছু একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করবার পূর্বেই কাকা উঠে দাঁড়ান, বলেন—দেখ, তোমায় আমি এই মাসের শেষেই বিয়ে দিতে চাই। পাত্রী আমি স্থির করেছি। তুমি আসছে সোমবার গিয়ে দেখে আসবে।—এ যেন ধান ভানতে এসে শিবের গীত গাওয়া।

রঞ্জিত গাছ থেকে পড়ে,—বিয়ে!

—হাঁ বিয়ে। নিজস্ব মতামতের উপযুক্ত হয়েছে। আর বিয়ে করবার উপযুক্ত হওনি বলে তোমার ধারণা নাকি!—কাকার কণ্ঠে শ্লেষের আভাস স্পষ্ট।

—আমি এখনও ছাত্র। এ অবস্থায় পড়াশুনা সম্বন্ধে আপনার ঐ সব উপদেশ বরঞ্চ মেনে নেওয়া সম্ভব, কিন্তু পড়ালেখার ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে······

—সে বিবেচনা আমার। আমি অভিভাবক। তোমার পিতৃস্থানীয় কেন, বলতে গেলে পিতাই। নিশ্চয়ই তোমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই করবো যা করি।—রঞ্জিতের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কাকা উত্তর করলেন।

কিন্তু রঞ্জিতও শুধুমাত্র অভিভাবক বলেই দমে যাবার ছেলে নয়। সেও বলল, কোন্ অভিভাবক আর স্বীকার করেন, যে তিনি সন্তানের অমঙ্গলের জন্য কিছু করছেন।—

—রঞ্জিত—কাকার সুরে ধমক প্রচ্ছন্ন।

—বলুন—

—এর বেশী আমার বলার নেই। তোমার পড়ালেখা যেমন চলবার চলতে থাকবে। তোমার পড়া বন্ধ করার কোন ইচ্ছা আমার নেই। পড়ালেখায় তো তুমি খারাপ ছেলে নও। তবে এটুকু আমি বুঝেছি বলেই জানবে, যে এখন বিয়ে না দিলে তোমার পড়া আপসেই বন্ধ হয়ে যাবে, গোল্লায় যাবে। এর চেয়ে স্পষ্ট তোমার কাছে আমি হতে চাই না।

—আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা, আমার মতামত কিছুরই তোয়াক্কা করবেন না?

—করতাম যদি মতামত মতামত হতো। তোমাকে জানাতে এসেছি এইজন্য যে তুমি অনেকখানি বড়ো হয়েছো। নইলে তাও করতাম না। আমার ইচ্ছা দ্বারাই তোমার ইচ্ছা এখনও চালিত হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। সুতরাং তুমি প্রস্তুত থেকো। —কাকা বেরিয়ে গেলেন পূজোর ঘরে খড়ম পায়ে চট্ চট্ করতে করতে। খালি গা। সারাদিন মক্কেলের স্বার্থে সত্য মিথ্যার প্যাঁচ কষেন বলেই বোধহয় পূজো সন্ধ্যের ঝোঁক বেশী। রঞ্জিত নিজের মনে গজরাতে গজরাতে বসে পড়ল। প্রথমে কিছুক্ষণ আচমকা এই ব্যাপারটার উপর ভাবতে শুরু করল। পরে ক্লান্ত হয়ে সান্ত্বনা দিল মনকে, বিয়ে তো করার মালিক সে। উপর থেকে অমনি চাপিয়ে দিলেই তো আর হয় না অত সহজে। ঘটনাটা আরও ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা প্রয়োজন। আপাততঃ যতীনের ঠিকানার চিরকুটটা বার করাই হচ্ছে জরুরী। আজ রাত্রে তার সঙ্গে দেখা না করলেই নাকি নয়।

সুটকেশের উপর থেকে বই আর খাতার রাশ টেনে বার করে। যদিও বা কাকার দরুন খিচড়ানো মেজাজটা খানিক পরিমাণে ঠিক করে এনেছিলো—কিন্তু সুটকেশের ডালা খুলতেই আর একদফা বিগড়ে উঠলো মেজাজ।

তার অনুপস্থিতিতে সুটকেশ খোলা হয়েছে এবং কে বা কারা কাগজপত্তর সব তচ নচ করে ফেলেছে। সে চিন্তাই করতে পারে না বাড়ীর মধ্যে এতটা দুঃসাহস কার। তার অজ্ঞাতে তাকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত না করে তার সুটকেশ হাতড়ায়, তচনচ করে।

কাকীমা ও মায়ের কণ্ঠস্বর মাঝের পার্টিশানের কাঠ ভেদ করে ওর কর্ণগোচর

হয় হঠাৎ। ওঁরা বোধ হয় জানেন না, রঞ্জিত ইতিমধ্যে কলেজ থেকে ফিরেছে। অথচ কাকার সঙ্গে এতো চড়া গলায় তর্ক বিতর্কের পরও তো তাঁদের অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। হবেও বা হয়ত, নিজেদের কথায় নিজেরা এতই মশগুল হয়ে আছেন যে কিছুই কানে যায় নি ।

ওঁরা কিন্তু বেশ নিঃসংকোচে আলোচনা চালান ও ঘরে। হাতের সুটকেশের ডালা ছুঁয়ে তাকে কান খাড়া করে রাখতেই হলো—আলোচনার কতক অংশ তার কর্ণগোচর হলো। কাকীমার স্বরই অধিক তীক্ষ্ণ—না বাপু আমার মনে হয় ঘটনা তুমি যতটা ভাবছো অতদূর গড়ায় নি। দু'একটা চিঠিপত্তর কি আর থাকতো না তা হলে—

—তুই দেখেছিলি ভাল করে—

—আর কত গোয়েন্দাগিরি করা যায় বল তো। হাজার হোক ছেলে তো। ছোট ছেলেটা রাতদিনই তো ও বাড়ীর চৌকাঠে পা রাখা থেকে চোখে চোখে রাখছে, কোথায় কখন কী করে না করে। এদিকে একলজ্জা পরিত্যাজ্য করে আমি ছেলের সুটকেশটা অবধি হাতড়ে এলাম। আর তুমি আমায় কী করতে বল দিদি।

রঞ্জিত কান খাড়া করে হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করে—এসব আলোচনার সঙ্গে সুটকেশ খোলার কি ও কতটুকু সম্পর্ক। সন্দেহ দৃঢ় হয়। অগত্যা শেষ অবধি শুনবার জন্য উৎকর্ণ রাখতে হয় কান।

মায়ের কণ্ঠ শোনা যায় আবার—এ সব রোগের ওই এক ওষুধ। মিত্তিরদের মেয়ের সঙ্গে সামনের মাসেই। ঠাকুরপোকে বলেছি। ওমা একী কথা! আমার বংশে কেউ যা করেনি।—

—এ কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি দিদি। মেয়েদের সঙ্গে মিশলেই ছেলে খারাপ হবে—রঞ্জিত কি সেই ছেলে? আর তা ছাড়া স্কুলে, কলেজে, আপিসে, বাইরে সর্বত্রই তো মেয়েদের সঙ্গে মিশতে হবে তোমার ছেলেকে। সর্বত্রই বা কি করে তুমি চোখ রাখবে শুনি।

—কী জানি বোন, মায়ের প্রাণ। সর্বদা ভয়, এই বুঝি মানুষ হোল না ও। সেই এতটুকু থেকে এতবড়টি করেছি। উনি যখন স্বর্গে যান তুই তখনও এ বাড়ী আসিস্‌নি। আমার যে শাঁখের করাত, তাই তো রাতদিন ভুক্ ভুক্ করে মরি—শেষের দিকে ভারী হয়ে উঠল মায়ের গলা।

—কী জানি দিদি, ভুক্ ভুক্ করলে মঙ্গলই হয়, না অমঙ্গল—সে হিসাব করার

সময় ভগবান করুন একদিন আসুক। বুড়ো ছেলেকে চোখে চোখে রাখতে গিয়ে কি যে বিসম্বাদ ঘটাবে জানি না······

আবার অস্পষ্ট হয়ে আসে আলোচনা। ধৈর্য ধরে আর চেষ্টা করল না রঞ্জিত। এতক্ষণে নিঃসংশয় হওয়া গেল। তার অকল্যাণ আশঙ্কায় ভীত মায়েরা স্যুটকেশ তল্লাশী করে, সীতাদের বাড়ী গতায়াত সম্পর্কীয় গোপন তথ্য আবিষ্কারের তুচ্ছ চেষ্টা করেছেন। মায়েদের মনের এই ক্ষুদ্রতা—তা সে যত মহৎ কারণেই হোক, তাকে ব্যথিত করল। আর কাকার ধমক ঠিক তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্ন আত্মসম্মানকে ইতিমধ্যেই করেছে আঘাত। সবচেয়ে মুশ্‌কিলের ব্যাপার এই,—এটা এমন একটা বিষয় যা নিয়ে গুরুজন ও সন্তানদের মধ্যে খোলাখুলি ফয়সালা করা অত্যন্ত অশোভন।

কায়দাটা কিন্তু চমৎকার! এ-বাড়ীর মেয়ে মহলে ও-বাড়ীর মেয়ে মহলে কোন্দল। তারই পেছু পেছু ছোট ভাইবোনদের গোয়েন্দা নিয়োগ। মাঝে মাঝে স্যুটকেশ পরীক্ষা ইত্যাদি মারফৎ গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস। এসব তাহলে অনেকদিন ধরেই চলছিল। আজ একেবারে আক্রমণ—কাকার ধমক। ঠিক যুদ্ধের কায়দা। প্রথম সীমান্ত নিয়ে ছোটোখাটো গোলোযোগ। পরে পঞ্চম বাহিনী কার্যকলাপের স্তর; পরে শত্রুপক্ষের গোপন দলিল দস্তাবেজ অপসারণের প্রচেষ্টা এবং সর্বশেষে চরমপত্র ও যুদ্ধে অবতরণ।

একটু মুচকি হাসে রঞ্জিত। অথচ বিরক্তি ও রাগে সারা দেহ তার নিশ পিশ করে। তার পেছনে এসব জঘন্য কার্যকলাপ তাহলে সত্যি বলেই মানতে হবে তাকে। ভিত্তি থাক বা না থাক, প্রকৃতই যদি অভিযোগ কিছু কিছু জমা হয়ে থাকে মায়েদের মনে—তা তার সামনে এসে বিবৃত করলেই তো ছিল রুচির পরিচয়। ছোট ছোট ভাইবোনদের দাদার কল্পিত কীর্তিকলাপের পিছনে লেলানোর দ্বারা তাদের একী সুন্দর ভবিষ্যৎ তৈরি কচ্ছেন এইসব অভিভাবকেরা? দাদার উপর কী গভীর শ্রদ্ধার বীজই না বপন করছেন সুকুমারমতি বালকদের অন্তরে? হায় দুর্ভাগা স্নেহান্ধতা!

কল্পিত সর্বনাশ রোধ করতে এমন সুন্দর সর্বনাশ সাধনের দুঃসাধ্য আয়াস যে প্রকৃত পক্ষে তার এই ছোট্ট জীবনে আর দেখে নি। তার ইচ্ছা হয় এই মুহূর্তে গিয়ে বলতে—মা, এসব কী তোমরা শুরু করেছো বল তো? কিন্তু ইচ্ছা সে সংবৃত করল। আজ এই প্রথম সে অনুভব করল যে রুচি ও লক্ষ্যের কি গভীর তারতম্য তাকে একই পরিবারের অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে রেখেছে।

অভিভাবকেরা তাঁদের পক্ষে সঙ্গত কারণেই হয়ত চান—তাঁদের সন্তানেরা তাঁদের সংস্কারের মূর্ত প্রতীক হিসেবে বেড়ে উঠুক। অথচ সন্তানদের তরফেরও যে যুগোপযোগী সঙ্গত কারণ জমা হয়ে উঠতে পারে—নিজেদের ইচ্ছা আর রুচি মাফিক নিজেদের গড়ে তুলবার—তা কী তাঁরা ভাবেন! এই মীমাংসা কি শুধু কোন্দল দিয়েই সম্ভব! তাতে লাভের মধ্যে উভয় পক্ষ উভয়ের নিকট আরও অশোভন নগ্ন হয়ে উঠতে পারে মাত্র। তার চেয়ে এই ভাল—দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তি একই গৃহে বৃদ্ধি পেতে থাক ততদিন পর্যন্ত—যতদিন পর্যন্ত সংঘর্ষের দাবাগ্নি একেবারে ফেটে চৌচির না হয়ে পড়ে। সে জানে সে সংকটকাল অবধারিত, সেই ফেটে পড়ার সূত্রপাত হয়েছে। তবু চৌচির হয়ে ফেটে ছড়িয়ে পড়ার দিন যতদূর সম্ভব বিলম্বিত করতে চায় সে। কারণ এই বছরই ফাইনাল পরীক্ষা। সন্দেহও জাগে—বিলম্বিত করা যাবে কী আর বেশী দিন?

সীতা-রঞ্জিতের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে কোন সন্দেহকর চিন্তা মাথায় আসে নি রঞ্জিতের এতদিন। যেদিন সে প্রথম জানতে পারল,—সে যখন পড়াতে ব্যস্ত থাকে, তখন তার বাড়ীর কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত গোয়েন্দা কনিষ্ঠ ভ্রাতাভগ্নীর দল তার উপর অপ্রকাশ্যে নজর রাখে—প্রকৃতপক্ষে সেদিনই প্রথম তার সাদা চিন্তা-রাশিকে বিসিয়ে মাথা তুলতে শুরু করলে একটা নতুন চিন্তা। রঞ্জিত-সীতার ঘনিষ্ঠতার আর একটা দিকও থাকা সম্ভব। তারপর যতদিন অতিবাহিত হয়েছে, যতই সন্দেহের নজীর তার সন্দেহোত্তর কার্যকলাপকে দিগ্‌ভ্রান্ত করেছে ততই সীতা ও তার সম্পর্কের না-ঘটা দিকের আবরণ উন্মোচনের চিন্তা তার দুর্বলতম মুহূর্তে মাঝে মাঝে তার ভাবনার গলিপথে উঁকিঝুঁকি মেরেছে। আজকের ঘটনায় সে হাল ছেড়ে দিল। এবং সেই উঁকিঝুঁকি-মারা পালিয়ে-থাকা চিন্তাকে অন্তঃস্থল কাঁপিয়ে ঝড়ের মত মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে দেবার বিপক্ষতা করল না। স্বপক্ষে মনের মধ্যে আপনা আপনিই একটা যুক্তির জাল সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে গেল—কেন, অসঙ্গতই বা কেন?

এতে করেও মন যে খুব শান্ত হলো বলে মনে হয় না। কিছুক্ষণ ছটফট করে অবশেষে মায়ের কাছে ছুটে গেল। মাকে অবাক করে গিয়ে ডাকল, মা—

হন্তদন্ত হয়ে রঞ্জিতকে আসতে দেখে মা ভাবলেন সে সম্ভবতঃ ক্লান্ত হয়ে কলেজ থেকেই ফিরলো। অতএব খাবার সাজিয়ে আনতে কক্ষান্তরে গেলেন।

কাকীমাকে নিভৃতে পেয়ে রঞ্জিত শুধালো—কাকা কোথায়—

—কোথাও গেছেন হয়ত। এইতো ছিলেন এক্ষুনি। তোর হয়েছে কী বল্ তো। অমন ঝ'ড়ো কাকের মত এলি কোথা থেকে!

—ও ঘর থেকে সুটকেশ হাত্‌ড়ে।

কাকীমার মুখ পাংশু হয়ে উঠল। তিনি কথা বললেন না। সেদিকে বিশেষ গ্রাহ্য না করে রঞ্জিত বলল—সরাসরি মাকে জিজ্ঞাসা করলে ব্যথা পাবেন। তাই তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি। সোজা জবাব দাও তো। তোমরা আমার সম্বন্ধে ঐ সব বিশ্বাস কর?

একটু আমতা আমতা করে কাকীমা বললেন,—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কী আছে। তা বাপু ও বাড়ীতে মাস্টারি করতে না গেলেই তো পারিস। মাস্টারি না করলে উপোস করবি—ব্যাপারটা তা এমন নয়। তাছাড়া বাইরের দশজন তেমন কিছু মনে করতেও তো পারে।

—তবু সোজাসুজি বলবে না যে বিশ্বাস করি না। তোমাদের ভেতরে ভেতরে যে এত প্যাঁচ তা আমার ধারনা ছিল না কাকীমা। আমি জানতাম সাধারণ মেয়েরা সহজ সরল মানুষ। কাকাকে এতদূর ধারণা জন্মে দিতে তোমাদের এতটুকু আটকালো না।

কাকীমা হাসলেন—কী রকম?

—তিনি আজ আমার আত্মসম্মানের প্রশ্নকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পিছপাও নন। অথচ তোমরা ঘটনাটা যাচাই করে দেখলে না পর্যন্ত!—অভিমানে গলা বুজে উঠল রঞ্জিতের।

কথা শেষ না হতেই কাকীমা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—থাক। আমরা তোকে পেটে ধরেছি, না তুই? অত উপদেশ দিসনি বুঝলি। আমরা তোর চেয়ে তোর ভালমন্দ বেশী বুঝি।

যেটা চাইছিল না সেইটাই ঘটে গেল। খাপ্পা হয়ে উঠল রঞ্জিত এ কথায়। সংঘর্ষ বুঝি আর এড়ানো যায় না। —তা যদি বোঝই। তা পেছন পেছন ঘুর ঘুর না করে সামনাসামনি আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেই পারতে।—আরও বক্তব্য অতি কষ্টে সংযত করল।

—কী করলে কী হবে, তুই আর শেখাস নি বাপু—হ্যাঁ।—বলে কাকীমা কৌটা থেকে পান বের করে মুখের মধ্যে গলিয়ে দিলেন।

রঞ্জিত ঘুরে দাঁড়ালো। বলল বেশ সংযত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে—বেশ যা ভাল বুঝেছো করেছো। আর আমিও......। —মা এসে ঘরে ঢুকলেন

খাবারের রেকাবী নিয়ে। —কী হোল আবার। হলুস্থূল করছিস যে তোরা এদিকে।

মাকে দেখে হঠাৎ যেন রঞ্জিতের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়লো হু হু করে। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে মায়ের সামনে দাঁড়াল পথরোধ করে। দুটো কাঁধ ধরে একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে উচ্চারণ করলো,—শোন মা···। আরও কিছু বলার জন্য উঁচু হওয়া ঠোট জোড়া হঠাৎ ব্রেক-কষার মত করে থেমে গেল। যেন নিজের নাটকীয়পনা সম্পর্কে এই মুহূর্তেই হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলো রঞ্জিত। নিজের নাড়ী নিজে নিবিড়ভাবে অনুভব করতে পারছে সে। মস্তিষ্কের চাইতে হৃদয়াবেগ এত বেশী কাজ করতে শুরু করেছে যে তার বক্তব্যের সূত্রপাতটুকু তার নিজের কানেই অত্যন্ত কটু শোনাল। আলাপ পুনরায় সংলাপে পরিণত হয় এই আশঙ্কায় সে ছেদ টানল তার কথায়। এবং তারপর নিজের উপর নিজের সংযম প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যয় করল কয়েক মুহূর্ত। অবশেষে সংযতকণ্ঠে বলল মাকে—বলছিলাম কি জান মা—মা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।—বলছিলাম, বেশী নিষেধই বেশী করে নিষেধ ভাঙ্গবার প্রেরণা যোগায়। আর বেশী সন্দেহ······—

মা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠলেন—তুই কী মায়ের সঙ্গে পর্যন্ত কবিতা করতে এলি নাকি বাপু।

রঞ্জিতের বক্তব্য অসমাপ্তই রয়ে গেল। কাকীমা হাসতে হাসতে বললেন—ছেলে যে তোমার কবিতা লেখে।

রঞ্জিতের বুঝতে অসুবিধা হল না যে অত্যন্ত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও তার বক্তব্য নাটকীয়পনার হেঁয়ালিবর্জিত হয় নি। আসল বক্তব্য বিষয় কেউই কিছু বোঝেন নি সম্ভবতঃ।

অগত্যা বেকুব ব'নে শুধু কটমট করে একবার কাকীমার দিকে আর একবার মায়ের দিকে তাকিয়ে কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে দাঁড়ির মত ছেদ টেনে ক্ষিপ্রপদে সটান পড়ার ঘরের ভিতর চলে গেল। মা দূর থেকে হাঁকলেন—ওরে মুখের খাবারটা খেয়ে যা—

মা ছেলের রুদ্রমূর্তি দেখে আর খাবারের কথা বলতে ভরসা করলেন না আপাততঃ। কাকীমা তাঁর হাত থেকে খাবারের থালা ছিনিয়ে নিয়ে বললেন,—আমার হাতে দাও তো দিদি। খাবে না আবার।

দোর গোড়ায় এসে মা রইলেন দাঁড়িয়ে। ভিতরে প্রবেশের কেন যেন ভরসা পাচ্ছেন না তিনি। ছোট জা খাবারের থালা হাতে রঞ্জিতের সম্মুখীন হলেন ;

দেখলেন রঞ্জিত স্যুটকেশের তছনছ করা কাগজপত্র গোছাতে ব্যস্ত। একটুখানি মুচকি হাসলেন নিজের মনে। থালাটি সামনে রেখে বললেন,—খেয়ে নাও তো দেখি লক্ষী ছেলের মত।

মুখে স্মিতহাস্য কাকীমার লাগানোই আছে। অতি গুরুতর এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ কথার পরও এই স্মিতহাস্যটুকু কাকীমার বৈশিষ্ট্য। রঞ্জিত কাকীমার সেই হাসিটুকুর পানে একেবার মুখ তুলে তাকাল। তারপর বলল,—না খেলে হয় না?—খুব গম্ভীরভাবে।

—তার মানে? তুই কী সত্যি সত্যি ঝগড়া করতে চাস নাকি?

আর একবার আর একটা বিদ্যুৎ কটাক্ষে কাকীমার মুচকী হাস্যরেখা বিদ্ধ করলো রঞ্জিত। তার পর নিজের কাজ করতে লাগলো।—ঝগড়া! ঝগড়া-টগড়া আমার ধাতে সয় না। ওর জন্য তো তোমরাই আছো। আমি যদি করি তো একেবারে বোঝাপড়া করবো বুঝলে। —বলে খাবারের থালাটি তুললো এবং গোগ্রাসে খাবারটুকু গলাধঃকরণ করে ফেলল।

—এইবার তোর যতক্ষণ ইচ্ছে, যা ইচ্ছে কর্ বাপু। —বলে কাকীমা খালি রেকাবীখানা হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। মুখের স্মিতহাস্য ক্রমশঃ উজ্জ্বল হতে হতে উদ্ভাসিত হাস্য হবার জন্য উন্মুখ হলো বড় জায়ের চোখাচোখি হতেই।

বাইরে এসে দিদি বললেন,—আমার তো প্রায় বুক কাঁপছিল ছেলের দিকে চেয়ে।

—তোমার এই যখন তখন বুক কেঁপে কেঁপে লাভের মধ্যে হবে এই যে, বুক কাঁপার সময় এলে তখন বুকই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মুখের মৃদু হাস্যের ভাঁজ অব্যাহত ছোট জায়ের।

সেদিকে চেয়ে বড় জা বললেন—তুই বোধহয় মানুষ খুন করেও এমন হাসতে পারিস।

—খুন করে তো দেখিনি এখনও।

বড় জা মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকালেন।

॥ দশ ॥

এতক্ষণে ঠিকানার চিরকুটটা খুঁজে পাওয়া গেল। উত্তেজনার মুহূর্তেও তার মন পরিপূর্ণ সজাগ ছিল। যতীন মিস্তিরের ডাক সন্ধ্যাবেলা। ঠিকানার চিরকুটটা বুকপকেটে ফেলে মা ও কাকীমার ব্যস্ত ও আর্ত দৃষ্টিপাত বিশেষ গ্রাহ্য না করেই বেরিয়ে পড়ল রঞ্জিত। পেছন থেকে মায়ের স্বর শুনতে পাওয়া গেল—ধুলো পায়েই চললো ছেলে। বাড়ীর উপর যখন এত অপশ্রদ্ধা বাড়ী না এলেই তো হয়।

মায়েদের গজর গজর করাকে এখন আমল দিলে চলবে না। রঞ্জিত মনে মনে বেশ একটু আতঙ্কিত বোধ করে। সত্যিই তো দিনের পর দিন পিছন থেকে এই ধরনের ঘুষ্ ঘুষ্ আর জঘন্য সন্দেহাক্ত নোংরা গজর গজর যদি চলতে থাকে, তবে জীবন ভ'র বেচারীদের গজর গজরই না করতে হয়।

অতি সন্তর্পণে রাস্তায় নেমে দাঁড়াল। বিকেল। সুন্দর গোধূলির একান্ত কাছাকাছি এই সময়টা। গোধূলি—সুন্দর কথাটি। গোরুর খুরের ধূলায় আকাশ আচ্ছন্ন হবার লগ্ন। সে গোরুরা নেই, রাখালরা অন্তর্হিত, সে আকাশও হারিয়ে গেছে। কিন্তু সে গোধূলির আস্বাদ আজও অপরিবর্তনীয়। গোধূলি নামের মাহাত্ম্য যেন রঞ্জিতের অনুভূতিতে উত্তেজনা আর উত্তাপ দেয় খানিকটা তরল করে।

স্থানটি শহরতলির প্রান্তদেশে অবস্থিত। এক সারি বাড়ীর ওধারে এক সারি চিমনি উদ্ধত ভাবে দাঁড়িয়ে গল গল করে ধোঁয়া উদ্‌গিরণে ব্যস্ত। সেদিকে চোখ পড়ে আর রঞ্জিতের মনে একটা নতুন চেতনা চিক্ চিক্ করে জন্ম নিতে থাকে। ছিঃ ছিঃ এসব কী ভাবছিল সে। এইসব কাকার সঙ্গে তিক্ততা, পরিবার প্রসঙ্গীয় কৃচ্ছ্রতা এসব কেন তাকে স্পর্শ করবে। তাকে ডাকছে যতীন মিস্তিররা, ডাকছে কলের কালো ধোঁয়া, ডাকছে শোষিত অগণিত মানুষের দল, যাদের রক্তের নির্যাসে আধুনিক সভ্যতার বনিয়াদ সৃষ্টি। এখন এইসব ঘরোয়া জীবন তাকে প্রভাবিত করলে চলবে কেন? মনকে সে প্রবোধ দেয় আর যতীন মিস্তিরের জন্য প্রস্তুত হয়ে সেদিকে পা চালায়। সে জানে যতীনের পরিবেশে যেতে হলে মানসিক প্রস্তুতির ও প্রয়োজন আছে।

যৌবনের রং-লাগা চোখ আর আদর্শের ভাব-জাগা চিত্তে সে সব দেখতে থাকে। গ্যাস বাতিগুলো অজ্ঞাতে কখন জেলে দিয়ে গেছে কারা। একটা

ডাস্টবিন। পাশে এক গাড়িবারান্দাওয়ালা ফুটপাথ। তলায় একদল পেশাদারি ভিক্ষুক বন্য জানোয়ারের মত কিচমিচ আর ঝগড়া শুরু করেছে। বাড়ীটা কোন মারোয়াড়ীর নিশ্চয়ই। মারোয়াড়ীদের বাড়ীগুলো দেখলেই এক ডাকে বলা যায়। কেমন একটা উৎকট বিশেষত্ব আছে এদের নির্মাণ ভঙ্গিমায়। একটা গলি এসে বড় রাস্তায় মিশেছে। গলির বাঁ ফুটে বস্তিরাজ্য। ডান ফুটে প্রধানতঃ মারোয়াড়ীদের বড় বড় অট্টালিকার মহল্লা। যেন দুই বিরোধী রাজ্যের সীমান্ত—এই গলি। পাশাপাশি দারিদ্র্য আর সম্পদের এই চেহারায় হঠাৎ চোখ আটকে যায়।

বহুদিন এই পথে গেছে। কিন্তু আজ এই বিশেস মুহূর্তের মাহাত্ম্যে সেই পুরোনো দৃশ্যই যেমন একটা নতুন অর্থ, একটা নতুন সৌন্দর্য নিয়ে তার দৃষ্টির সামনে আবির্ভূত হল—এমনটি আর কখনও হয়নি। সে অভিভূত।

প্রাচুর্য আর ঘাটতি—এই দুই সতীনের এক ঘরে বাস করা নিয়ে যতীন মিত্তিরের সঙ্গেই কী কম তর্কটা হয়েছে তার। কেমন যেন পীর মনে হয় যতীন মিত্তিরকে। বাড়ীঘর আর চালচুলোর প্রতি মমতা কতখানি বোঝা শক্ত কিন্তু সম্পর্ক সামান্য। এই একনিষ্ঠতা বেশ লাগে রঞ্জিতের। ও যত বাড়ী থেকে যতীনদের নিকটতর হচ্ছে ততই যেন নিজের কাছে নিজের কর্তব্যপথ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অথচ বাড়ী থেকে বাবুর বাগান বস্তী কতটুকুই বা দূরত্ব। কিন্তু কি যে পরিবেশ। এর আওতায় মনে কেমন একটা উত্তুঙ্গ ও বলিষ্ঠ আদর্শপনা চিক্ চিক্ করে ওঠে।

আর তা প্রতিপালন করার জন্য মন কি অস্বস্তিই না ভোগ করে। বাড়ীতে ঠিক এই ধরনের হুঁশ যেন কোথায় হরিয়ে যায়। পরিবেশ প্রভেদে কী চেতনা ওঠানামা করে? এখান থেকে তার নিজের বাড়ীর চিত্রকে সে কল্পনার চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে: সে সমাজে অহরহ ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, মানুষকে আঘাত করছে। সে আঘাত এই বয়সে তারও উপর উদ্যত, কিছু চিন্তা করে নিজের জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার পূর্বেই। অথচ আশ্চর্য, বাড়ীর সমাজচক্রের ব্যূহের মধ্যে বসে এমন স্পষ্ট আর স্বচ্ছ তো নিজেকে দেখা যায় না। আসলে দূর থেকে ছাড়া কি অতি পরিচিত কোন কিছুরই আসল শ্রী ধরা যায় না!

তবে এটা বুঝেছে সে এখানে দাঁড়িয়ে, এবং সংকল্পও গ্রহণ করতে পারছে অনায়াসে যে, কোন বিঘ্ন আর কোন শৃঙ্খলই তাকে আর স্তব্ধ করতে পারবে

না। সামাজিক শৃঙ্খল যত আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে বাঁধবার চেষ্টা করবে, মুক্ত হবার কৌশল আর শক্তি ততই তার শাণিত হয়ে উঠবে।

পানের দোকানের কাছাকাছি এসে পৌঁছুতে প্রায় দশ মিনিট বাঁকাচোরা গলিপথ অতিক্রম করতে হল রঞ্জিতকে। পানওয়ালা রঞ্জিতকে দেখেই চিনে ফেলে। আর একদিন এসেছিল এই বাবু। কিছু না শুধিয়েই বলল,—বাঁয়া, বাবু বাঁয়া। যাইয়ে যাইয়ে চলা যাইয়ে।

এইবার মনে পড়ল সঠিক রাস্তাটা। পানওয়ালা লোকটা যে মনে করে রেখেছে দেখছি এখনও।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। আলোর বন্দোবস্ত বস্তির জমিদারের দায়িত্বভুক্ত হওয়ায় এখানকার গলিপথগুলিতে আলো নেই। কয়েক পা হোঁচট খেতে খেতেই এগোতে হ'ল।

তারপর সামনের বাঁ পাশের খোলার ঘরটা। সামনে অতি নীচু জানালা সাইজের একটা দরজা। ভেজান দরজা ধাক্কা দেবার আগেই খুলে যায়। ভিতরে প্রবেশ করেই চক্ষুস্থির—যতীন মিস্তিরের কাঁচা পেয়াজ সহযোগে শুধু ভাত গিলবার অধ্যবসায় দেখে। যতীন মিস্তির দরজা ভেজিয়ে দেবার ইঙ্গিত করে বলল,—ক'দিন কাজের চাপে এখানেই খেয়ে নিতে হচ্ছে। কারখানায় কাজ করে এক সঙ্গী আছে এই ঘরে। দুবেলা দুজনে ভাগাভাগি করে নিয়েছি আর কী পাকানোর ব্যাপারটা।—অনেকদিন পরে যতীনকে অনেক শীর্ণ বলেই মনে হচ্ছিল সেই পাণ্ডুর কেরোসিনের আলোয়। বিরাট দুখানা চোয়ালের এধার ওধার জোড়া খোট্টাদের মত বিরাশিসিক্কার গোঁফ কেবল টোল খায় নি। কে জানে কত কঠিন পরিশ্রম আর নিরলসভাবে ধ্যানে জ্ঞানে মজুর বনবার অধ্যবসায়ের রহস্য ঐ শীর্ণ কাঠামোর আর বিশাল গুম্ফদেশের আড়ালে লুকানো।

—বড্ড দেরি হয়ে গেল হে। সাতটা তো বাজেই প্রায়।—যতীন আহারের ব্যস্ততা কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে দিল।

রঞ্জিত উঁচু হয়ে দাঁড়াতে মাথায় একটা ধাক্কা খেল—অতিরিক্ত নীচু ঘরের একটা বিশ্রী নীচু আড়ে। মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে সে খাটিয়ায় বসে পড়লো। ওর মনে হচ্ছিল যেন ঘর নয় পাতালপুরী। মুখে বলল—এর চেয়ে কী ভাল ঘর পাওয়া যায় না ?

যতীনের আহার পর্ব শেষ করে প্রস্তুত হয়ে নিতে দুমিনিটের বেশী লাগল না।

বলল—ভাড়া একটু বেশী। মজুরের তো পয়সা অত বেশী নেই। তবু চেষ্টা করচি। হয়ত পাওয়া যেতে পারে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে দুজন বাইরে এসে দাঁড়ালো। যতীন বলল,—তোমাকে ডেকেছিলাম কেন, একটু পরেই বুঝতে পারবে চল।

বড় গলির পথ ত্যাগ করে গোলকধাঁধার মত আনাচে কানাচের ঘুরপাক পথ দিয়ে মিনিট পাঁচেক পাক খেতে খেতে অবশেষে থামলো এসে বড় ধরনের একটা টালির ঘরের সামনে। একটু ওধারেই দেখা যাচ্ছে সাহেবদের চট কলের পাঁচিল। এতক্ষণে হদিস পেল। বাস্তবিকই এতক্ষণ তার কাছে যেন স্বপ্নের মত লাগছিল, এই বিশাল বস্তিরাজ্যের গলিঘুচির পথগুলি। ভিতরে মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। ভিতর থেকে অর্গল বন্ধ দরজায় যতীন ধাক্কা দিতে কে একজন দরজা খুলে দিলো।

জীর্ণ ঘর। কিন্তু গৃহের অভ্যন্তরভাগ বেশ সাজানো গোছানো। একটা টিনের চেয়ার, একটা তেপায়া ধরনের টেবিল, একটা ছোট্ট তাক, কিছু খাতা বই কাগজপত্র, একটা ঝাণ্ডা টাঙ্গানো। মধ্যস্থলে একটি হারিকেন জেলে একটা সতরঞ্জির উপর বসে জন বিশেক লোক নিম্নস্বরে আলাপ আলোচনায় রত। অধিকাংশই অবাঙ্গালী। দুচারজন মুসলমান। এবং সব চাইতে অনবরত-ভদ্রলোক-দেখা ভদ্রলোকের ছেলের যেটা বেশী নজরে আসে—সেটা হচ্ছে এই দলটির মধ্যে ভদ্রলোকের অনুপস্থিতি। রঞ্জিত যতীনের পাশে আসন গ্রহণ করলো। কানের কাছে মুখ এনে শুধালো—চুরি, না ডাকাতি যে এত ঘুষ ঘুষ করে কথা, ফিস ফিস করে আলোচনা।—যতীন হাসলো কিনা বোঝা গেল না। বলল—তুমি তো ভারী বোকা হে। এখবর রাখোনা যে এ হচ্ছে উল্টো রাজার রাজত্ব। যা সসম্মানে বলবার তা এখানে গলা নামিয়ে বলতে হয়। অসম্মানের যা তার জন্য সপ্তমে আওয়াজ তুললেও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। অথচ ওপর থেকে দেখতে সবই ঠিক আছে, কি বল। অবশ্য ফিস ফিস করে শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না। কারণ ফিস ফিস করে দু'একজনের ব্যাপার চলে, সর্বসাধারণের ব্যাপার অচল।

অকস্মাৎ রঞ্জিতের কথার জবাব শেষ করে, মনোযোগ ও ঘাড় পরিবর্তন করলো সভার দিকে। শুরু করলো সবাইকে লক্ষ্য করে,—কমিটীর কাজ আমাদের একরকম শুরুই হয়ে গেছে ধরতে হবে। হরতাল অবশ্য শুরু হয়নি। হরতালের জন্য ডিপার্টে ডিপার্টে ভোট নেওয়ায় প্রস্তুতি এখনও বাকী। ডিপার্ট

কমিটিও সব জায়গায় তৈরী হয় নি। সে সব সত্ত্বেও হরতাল হবেই এবিশ্বাস নিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে। কি বল!

মোহিনী সিং সংগ্রাম কমিটীর সভাপতি। সে তার বসার ভঙ্গী অবিকল রেখে বলল—সবই ঠিক আছে সাথী। লেকিন বাৎ হচ্ছে কী জান—অত রুপাইয়া কী করে আসবে। সব কোই ঘাবড়ে উঠছে ভেবে। মজত্বর আদমীর জানের পরোয়া নেই লেকিন রুপাইয়া পয়সা? —চিন্তিত ভাবে ঘাড় নেড়ে যেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল।

যতীন গোঁফে তা দিয়ে চোখ বুজে ধীরে ধীরে বলল—শুনেছি হরতালের টাকা ভুতে যোগায়। কি ঠাণ্ডারাম তাই না? তুমি খুদ্ নিজ চোখে দেখনি জগদ্দলে।

ঠাণ্ডারাম মাথা নেড়ে আত্মপ্রত্যয়ের স্থরে বলল—পহেলা কিস্তি আমিই দিলাম। —বলে পকেট ঝেড়ে কিছু খুচরো বার করে শীর্ণ আলোর সামনে রাখল। —আমার ভাগে পড়েছিল বিশ টাকা। আমার বাড়ীর পড়শীদের থেকে আদায় এই তিন—সাড়ে চার। হপ্তার দিনে কারখানার সাথীরা তো রয়েইচে।—

যতীন অন্য সকলের দিকে এক একবার চোখ ঘুরিয়ে যেন টাকার দিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর চেষ্টা করল; পরে সহসা দাঁতগুলো বার করে সারা গালজোড়া এক হাসি হেসে বলল—এ না হলে আর খাজাঞ্চী। কী বল মোহিনী ভাই। বহুত আচ্ছা আমাদের ঠাণ্ডারাম ভাই—কমিটীর খাজাঞ্চী সাথী। বলেছি না এ টাকা এমনি করেই ভুতে যোগায়।

মোহিনীর দুশ্চিন্তা কেটেছে বলে মনে হলো না এ'তেও। ম্লান একটু হেসে সে বলল—ঠাণ্ডারাম সাথী তবে ভুত বনে গেল।—হো হো করে হেসে উঠল সবাই। যতীনের কেবল পছন্দসই হলো না কথাটা। সবার সাথে দরাজ হাসি হাসতে তার ব্যতিক্রম দেখা গেল।

হাসি থামতেই আফজল তার নোয়াখালির ভাষায় বলতে চেষ্টা করলো রঞ্জিতের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে। —থা এনার সামনে সব খুইলা বল্‌তে ফ্যারি তো—স্থরটা আধো অবিশ্বাসের।

—কেন উনি সাপ না বাঘ—যতীন জিজ্ঞাসা করলো। অপরাপর উপস্থিত সভ্যবৃন্দের যেন এই প্রথম হুঁশ হ'ল একটা বাইরে লোকের উপস্থিতি।

—না, উনি বাইরের বাবু, আর মোরা হইতেছে খুলী মজুর।

এতক্ষণে সকলের মনেই যেন একটা আধো অবিশ্বাসের ধোঁয়াটে বাষ্প মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। পার্শ্বস্থ নন্ত মিস্ত্রীর গলার ঝাঁজে একথার প্রমাণ পাওয়া গেল—সে হতেই তো পারে অবিশ্বাস। এই যে হরতালের এতবড় একটা নারা উঠেছে! একটাও বাবুলোক সামিল হয়েছে এর মধ্যে এখন তক! এদিকে কিন্তু আমরা যদি গতর বাজিয়ে হপ্তা পেলাম আড়াই ওরা চেয়ার বাজিয়ে মারলেন আড়াই শো। তার ওপর রোজ বাড়াতে ঘুষ ঝাড়, নাগা পাস করতে ঘুষ ঝাড়, একটা লোক ভর্তি করতে ঘুষ ঝাড়। আরে থুঃ থুঃ—অবিশ্বাসের কোন কসুর আছে? —নন্ত নিষ্ঠীবন ত্যাগ করল এক অদ্ভুত বিরক্তিজনক মুখভঙ্গী করে।

অন্য আর একজনের মনের সুপ্ত যতরাজ্যের অবিশ্বাস আর গুমরে মরা সন্দেহ—তা ঠিক অথবা ভুল যাই হোক—এই ঝোঁকে বন্যার মত ভেঙ্গে পড়ল হুহু করে—ফুরসৎ পেয়ে।

—আরে—রাজ চালাচ্ছে কে?

—কেন—বুদ্ধু ওস্তাদও পণ্ডিত তো কম নয়,—কালা আদ্‌মী—। মুখের মধ্যে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করল নন্ত, ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল—কীসের মধ্যে কী কথা তুই আনিস বল্ দিকিন। কে না করছে সে কথার। আমি বলছিলাম অন্য নাইনের কথা।—বলেই সে বুদ্ধু ওস্তাদের কথা চাপা দিয়ে পুরানো অসমাপ্ত বাক্যের রেশ ধরে শুরু করল—বলছিলাম—পুলিস বল, সি-আই-ডি বল, তামামই তো এই বাবু লোক। আমাদেরই তো নাকে খত দিয়ে সব করিয়ে লিচ্চে। এই যে আমাদের এতবড় একটা কারখানা চলছে। চালাচ্ছে কে?

—কেন, সাহেব কোম্পানী। লালমুখো সাহেবরা সব—বুদ্ধু আবার নাক গলালো।

নন্ত বিরক্ত হলো—রাজ চালাচ্ছে কালা আদ্‌মী আর কারখানা চালাচ্ছে সাহেব কোম্পানী—বহুতাচ্ছা। কিন্তুক কটা কালাআদ্‌মী আর কটা সাহেব। আরে—এদের হয়ে দালালি করনেওয়ালা আদমীই তো হ'চ্ছে জায়দা।—সে বেশ ব্যাখ্যা করার ভঙ্গীতে টেনে টেনে বিভিন্ন শব্দের উপর বিভিন্ন রকমের সুর টেনে বলছিল আর তেরছা করে রঞ্জিতের মুখের পানে লক্ষ্য করছিল। সম্ভবতঃ পরখ করে দেখছিল কথাগুলো তার কতদূর জুৎসই হচ্ছে। রঞ্জিতের মুখভঙ্গিতে মাঝে মাঝে একটু আধটু পরিবর্তনের রেখা পড়ছিল আর গর্বে বুকটা ফুলে উঠছিল বক্তার।

বুদ্ধু এবার সত্যিকারের ক্ষুব্ধ হলো বোঝা গেল—বে শুন কথা। কারখানা তাহলে চালাচ্ছে সব বাবুরা। বেশ বললে মাইরি। আমরা সব কারিগর আদ্‌মীরা—মালুম—কারখানায় যাই ব্রিফ্ ধোঁয়া দিব বলে!

পূর্ব বক্তার হাত উঁচু হয়ে নড়ে উঠল—কিসের মধ্যে কী কথা তুই আনিস বল্ দিকিন। কে না করছে সে কথার। আমি বলছিলাম একটা অন্য নাইনের কথা।

বুদ্ধু গজর গজর করতে থাকল—না বলছে না। অন্য নাইনের কথা বলছে—

রঞ্জিতের সারা মুখখানি পাংশুবর্ণ ধারণ করে উঠল। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক আর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীগত যে ঈষৎ তারতম্য সে কী এতই বিরোধী স্বার্থের তারতম্য। তার তো দৃঢ় বিশ্বাস উভয়ের শ্রেণীগত স্বার্থের মধ্যে বরঞ্চ বৈষম্য অপেক্ষা সাম্যই উগ্রতর। হয়ত বা এদের কারখানায় বাবুদের সঙ্গে এদের তফাৎ অত্যন্ত অশোভন ও অধিক। আর বাবুদের ব্যবহারও সেই তুলনায় যথেষ্ট চেতনাসম্পন্ন ও জাগ্রত নয়। অতএব সেই চোখ দিয়েই এরা সমুদয় বাবু সমাজকে দেখবার চেষ্টা করছে। মিত্র যারা তাদের চেনা আর তাদের সঙ্গে ঐক্য ও সখ্যতা স্থাপন করার অনেকখানিই যে অসমাপ্ত এখনও পর্যন্ত। তা থাক—তবু বুকের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা তো পুঞ্জীভূত হয়েছে। ফেটে বেরুনোর অদম্য তেজ তো চঞ্চল হয়েছে রক্তে। মিইয়ে থাকার চাইতে এ তবু ভাল। নিষ্ঠা অটুট থাকলে পথের পুঁজিও অসম্পূর্ণ থাকবে না।

বুদ্ধু খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকার পর হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল। ইস্পাতের মত মাংসপেশীওয়ালা হাতখানা উঁচু করে বলল; চোখ জ্বলছে, যেন একটি বিশ্রী হিংস্রতায়—হামার বে ডাণ্ডা তৈয়ার আছে। হরতাল হোলে, জগমোন বাবু মাফিক দালাল লোগাদের হামি দেখে লিবে।—চট্ করে মোহিনী সিং তার উত্তেজিত হাতখানা ধরে নামিয়ে দিল। বলল—আরে তু তো আচ্ছাই পাগল।

—হুঁ হুঁ পাগল!—দাঁতের মধ্যস্থ ধাতু চিক্ চিক্ করে উঠল।—শালা দালালদের দশপুরুষ বেইমান। ইনলোগোকা পিয়ার দিখলাবে তো হরতাল ভি নিকেশ হয়ে যাবে—সে আমি বলে দিচ্ছে। হঁ।

ঠিক এই মুহূর্তে নীরব একটা ভৎর্সনাপূর্ণ দৃষ্টিপাত হেনে যতীন বলল—কিন্তু পারবে কী বুদ্ধু ভাই—ছোট্ট একটা ডাণ্ডা দিয়ে তামাম দালালদের ঠাণ্ডা করতে? মিছে ডাকু দুর্নামই মিলবে, ফায়দা কিছু উঠবে না। নিজেদের দলে

যত লোক ভেড়াতে পারবে—দালাল লোক সে বাবুই হোক সাহেবই হোক তত কাবু হবে, কোণঠাসা হবে। দালালি করার ইচ্ছে থাকলেও ভরসা থাকবে না। ঠাণ্ডা করার তো এই হচ্ছে পথ।

—লেকিন বাবুদের কি করে বিশওয়াস করবে বাবু। ওরা বেইমান তো। আমাদের কারখানায় জগমোন বাবু—চেন তো তাকে?

—বাবুকে কি করে বিশওয়াস করবে বাবু! বেশ বলেছ। আমিও তাহলে বাবু তো?—মুখের কথা লুফে নিয়ে বলল যতীন।

—সে তুমি আমাদের আপনার লোক হয়ে গেছ।

—এমনি করেই সবাই আপনার হবে। ডাণ্ডা মেরে কি আর আপনার করা যায়? তাতে তো দুশমনই দলে বাড়ে। আচ্ছাই পাগল।—তারপর রঞ্জিতকে দেখিয়ে বলল—এই যে এই বাবু— ইনিও তো এসেছেন আমাদের দলে। কাজেই না হক অবিশ্বাসের কি আছে?

মোহিনী সিং ওদের মধ্যে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে। বলে—শুন্ বুড়্বাক শুন্। এ বাবু আমাদের দুশমন নেই দোস্ত আছে। তুই—শুধু চেহারা দেখে লিয়েই ডাণ্ডা চালাবি তো কী হবে? এ দোস্ত বাবুভি দুশমন হবে। এতে ফায়দা হবে না নোকসান্ হোবে—বোল।

জবর প্যাঁচে পড়ে যায় বুদ্ধু—দ্বিধায় ঘাড় নাড়তে থাকে।

—আরে বুড়্বাক—সব বাবুই কি জগমোন বাবু না সব বাবুই হোচ্ছে যতীন বাবু। সব কিছুর একটা এ আছে। হ্যাঃ সব ফালতু বাৎচিৎ রাখ্ দিকিন।—

ঘ্যান্ ঘ্যান করে তবু মনে মনে বুদ্ধু—রেখে তো দিয়েই আছি বাৎ। হুঁ-অ-অ সে বোবা তো বনেই আছি।

—লে বাবা। বুড়্বাকের মত খুব তো বঢ়িয়া বঢ়িয়া বাৎ বানাচ্চিস বসে বসে—এই যে এসেচি ক'জন—এরই ভিতরে ক'জন কাজের সময় বেইমানী করবে, ক'জন করবে না, আলবাৎ করে বলতে পারিস এখনও। মুখে লয়রে, কামে সব নিশানা হোবে। বেইমানির যেমন জাত নেই, দোস্তালির ভি তেমন জাত নেই, কম্‌সে কম এ বাৎ তো ইয়াদ রাখ।

—ঠিক—ঠাণ্ডারাম প্রবল উৎসাহে হঠাৎ মাটিতে এক চাপড় মেরে বসল।

আসলে ঠাণ্ডারামের বাবুদের উপর যথেষ্ট উষ্মার কারণ থাকলেও, পক্ষপাতিত্বও পোষণ করে কম নয়। এই শংকর, এই যে যতীনবাবু—চোখের উপর এদেরই বা ঐ বুদ্ধুর কথা মত খারাপ মানুষ বলে ঠেলে ফেলে দেবে কী করে।

জগমোহন বাবুকে কেন্দ্র করে বুদ্ধুর সকল বাবুদের প্রতি উষ্মার কারণ অবশ্য কারও অজানা নয়। ডান হাতের দুটো আঙুল কাটা যেতে ক্ষতিপূরণের টাকায় সেই যে ব্যাগড়া দিয়েছিল জগমোহন বাবু, সে রাগ এক বছরেও বেচারী হজম করে উঠতে পারেনি।

—ঠিকই তো বেইমানদের জাত আলাদাই।—যতীন সহসা সকলেকে বিস্মিত করে রঞ্জিতকে ইঙ্গিত করে সকলের উদ্দেশে বলল—এইবার আসল কথায় ফিরে আসা যাক। হাঁ এই যে বাবু, ইনি আমাদের ফাণ্ডে পহেলা কিস্তি সাহায্য করবেন বলেই এসেছেন। কৈ হে রঞ্জিত, এইবার দাও তো তোমাদের শ্রমিক-শ্রেণীপ্রীতির কিঞ্চিৎ পরিচয়।—ঠোঁটে একটু মুচকি হাসি উঁকিঝুঁকি মারছিল তার।

রঞ্জিত একেবারেই প্রস্তুত হয়ে আসেনি। তাই নেহাৎই অপ্রতিভের মত ফ্যাল ফ্যাল করে যতীনের পানে চোখের মণি দুটো তুলে ধরল। অসহায় সে চাউনি। মনে মনে অভিশাপ দিল—ঘুণাক্ষরে একটু আভাস কী দিতে পারতো না যতীন।

হাতখানা কাবলীওয়ালার মত নির্লজ্জভাবে চিত করে রঞ্জিতের সামনে মেলে ধরলো যতীন—কৈ দাও। এরা মজুর। মালিক জুলুমের মোকাবিলা করার জন্য এরা প্রস্তুত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত লড়ে বেঁচে থাকার জন্য চাই টাকা। হাতে সেই ভিক্ষার ঝুলি। তুমি কী দেবে দাও। প্রমাণ কর এদের সামনে, তুমি দোস্ত।

যতীন রঞ্জিতকে জানে ঘনিষ্ঠভাবেই। তাই এতখানি জোরের সঙ্গে দাবি করার স্পর্ধা রাখে।

রঞ্জিতের পকেট ছিল শূন্য। অতএব এ অবস্থায় অপদস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যতীনের দিকে কটাক্ষপাত করল বেশ কড়াভাবে। যতীন কিন্তু নির্বিকার।

এদিকে এই সাহায্যভাণ্ডারে রঞ্জিত সত্যই যদি কিছু না দেয় এখনই,—তার সদভিপ্রায় আছে কী নেই তা তো আর খতিয়ে দেখবে না এরা। দেখবে, দেয় নি। অতএব দোস্ত নয়। আর দোস্ত নয় মানে দুশমন। তার অর্থ, সে হচ্ছে বেইমান অর্থাৎ দালালের দলে।

এই রকম সোজা লাইনেই তো এদের হিসেব নিকেশ করতে দেখছে এখনও পর্যন্ত। আঁক কষার মত করে শত্রু-মিত্র হিসাব করার পদ্ধতিতে যে গলদ আছে, তা তো এই মুহূর্তের ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়। তাছাড়া 'দালাল' এই শব্দটির নামে মজুরেরা এত উত্তেজিত হয় যে খতিয়ে দেখার মত ধৈর্য আর মনের অবস্থা প্রায়ই উধাও হয়ে যায়। অতএব এখন সে কী করবে!

সেই ডাণ্ডা দেখানেওয়ালা বুদ্ধু লোকটা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে যা উক্তি করে—তাতে রঞ্জিতের ত্রিশঙ্কু অবস্থা আরও বৃদ্ধি পায়।—বিলকুল ঠিক, সে তুমি পরমাণ কর তুমি দোস্ত।

উসখুস করতে করতে তার যত দেরি হতে লাগল, বুদ্ধুর ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাস্যরেখা তত স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে—সাপের চাউনির মত। ভাবটা যেন এই, দেখই না এখনি প্রমাণ হয়ে যাবে লোকটা দোস্ত নয়। সে যে আগেভাগেই বলে রেখেছে এরা দোস্ত হয় না। তার সেই কথাই বেদবাক্য প্রমাণিত হবে।

অবশেষে জলে পড়া মানুষের মত এক সময় একটা অবলম্বন দেখতে পায় রঞ্জিত। হাতের আঙুলের দিকে দৃষ্টি পড়তে যেন একখণ্ড তৃণ পায় আশ্রয় করার। অন্য কিছু চিন্তা করার অবকাশ নেই তখন। সসব্যস্তে আঙুলের আংটি খুলে সকলের সামনে আলোয় ঠাণ্ডারামের আদায়ী চাঁদার পাশে রেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

যতীনের স্থান কাল পাত্র ভুল হয়ে যায় উৎসাহের আতিশয্যে। চীৎকার করে ওঠে—একটা আংটি, আমাদের দোস্ত আংটি দিয়েছে একটা।

বুদ্ধুর উদ্বেগ উপশম হল বটে, কিন্তু গলা ছেড়ে সবার সঙ্গে "আলবৎ দোস্ত" উচ্চারণ করতে তবু ইতস্ততঃ করল খানিকক্ষণ।

খাজাঞ্চী হচ্ছে ঠাণ্ডারাম। যতীন তার দিকে ঠেলে দিল টাকা আর আংটি। বলল, নাও খাজাঞ্চী সা'ব। আংটি বিক্রি আর এই টাকা মিলিয়ে ইস্তাহারগুলো খালাস করা চাই। বাকী টাকার হিসাব আর ইস্তাহারের রসিদ যেন জমা হয় খাতায়। বুঝলে।

ঠাণ্ডারাম ওদের মধ্যে একটু আধটু লেখাপড়া জানা লোক। অতএব একাজের সে অধিক উপযুক্ত। মোহিনী সিং মওকা পেয়ে ইতিমধ্যে আফজলের পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল—কেয়া খাঁ সাহেব। লড়াইয়ের রূপাইয়া পয়সা উঠবে কি উঠবে না?—অথচ গোড়ার দিকে সেই জানিয়েছিল, কি করে রূপাইয়া পয়সা উঠবে ভেবে নাকি সবাই ঘাবড়ে উঠছে।

রঞ্জিত একটু না হেসে আর পারল না।

যতীন সুযোগমত যোগান দিল—অতএব সাথীরা ঘাবড়ো মাৎ। ইস্তাহার আসছে কাল। এক হাতে ইস্তাহার ধরবে, অন্য হাত পাতবে—হর মজদুর

ভাইয়ের কাছে। মজদুর আদমীর দিল অত ছোট দিল নয়—লেকিন পকেট তাদের ছোট। তাই এক পয়সা আর আধলা পয়সা চাঁদাই আমাদের ভরসা।' তা হর মজদুর যদি তাইই দেয়—তামাম এগুারসান মিলের মজদুর সে তো কম কথা নয়—কয়েক হাজার।

নন্ত মিস্ত্রীর মনে তখনও ধোঁকা কাটে না—বলে তো দিলে বাপু কিন্তক না যদি ওঠে ?

—না যদি ওঠে, মানে মজদুররা যদি লড়াইয়ের জন্য দশ টাকা হপ্তা থেকে তিন আনা পয়সাও না দিতে পারে—তবে তারা লড়াই করবে না, করতে পারে না।—যতীনের জবাব যেন প্রস্তুত ছিল।—লড়াই সে তো কারও একার দায় নয়—দায় হর ভাইয়ের।

—চাপা কল ডিপাটের একটা লোক ও ইউনিয়নে নেই—এস্টাকৃচারের আদ্ধেক লোকের মধ্যে আমাদের আসর নেই। যা কিছু আসর সে তো বাইশম্যান ডিপাটে। হর ভাইয়ের তো দায়—তো হর ভাইটা কুথা?—নন্ত মিস্ত্রী বহুদিনকার মিস্ত্রী। সারা কারখানার নাড়ীনক্ষত্র তার জানা। অত ভাসা ভাসা কথায় সহজে তার রক্ত গরম হয় না।—গ্যাং-এর সর্দারগুলো পর্যন্ত পুরোপুরি ভিড়ছে কিনা হলফ করে বলা যায় না।

মোহিনী সিংও কম পুরোনো সর্দার নয়। সে নন্তকে তার হাতনাড়ার অপূর্ব ভঙ্গী সহকারে বোঝাতে শুরু করল—আরে সে চেষ্টাই কর। ও হপ্তায় যে জলসা হবে সেখানে বাৎচিৎ হবে। কি হয়েছে, কি হয়নি, হলে কতটুকু হয়েছে, বে না হলে কোথায় কোথায় কি কায়দায় আসর জমানো যায়—সে সব বাৎচিৎ হবে সেখানে। পয়লা বুকের পাটা বড় করে হিম্মতের সঙ্গে কামই শুরু কর।

বুদ্ধুর সেই সকল সময়ের উত্তেজনানুলক ভঙ্গিমা—আলবৎ।—আর মাটিতে চাপড়।—পয়লা হিম্মৎ সে কামই শুরু কর।

ঠাণ্ডারামের সাংগঠনিক চেতনা অনেকের চাইতে বেশী, তাই বলল সে—কিছু না করে, গোড়া থেকে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করলে অবিশ্যি কিচ্ছু হবে না।

হারিকেনের আলোয় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নেড়ে তেল পরীক্ষা করে নিল যতীন। তারপর আশ্বাস দিল—তাছাড়া শেষ অবধি আমজলসা রয়েছে। প্রথম দিকে কম উঠবে পয়সা চাঁদা। প্রচার কাজে যতো বেশী নামবে, ডিপাট

কমিটিগুলো পাকা পোক্ত করে নেওয়ার কাজে যত হাত পড়েবে—চাঁদা পয়সাও `তত ঝড়াঝঝড় উঠবে। পরের হপ্তা থেকেই দেখো এ হপ্তার চেয়ে চাঁদা তোলার কাজে কত হাল্কা হয়ে গেছে।

আরও খানিক দরকারী আলোচনার পর সভার কাজ খতম হোল। সর্বপ্রথম যতীন মিত্তির, মোহিনী সিং আর ঠাণ্ডারাম আর তাদের পেছন পেছন রঞ্জিতও উঠে পড়ল। হারিকেন হাতে করে ঠাণ্ডারাম দরজার কাছ অবধি পথটায় আলো দেখাল। হারিকেনের ফিকে আলোয় দরজায় পাশে মাটির দেওয়ালে ঝুলানো—কানুনি মজুর আন্দোলনের একটা সার্টিফিকেট নজরে এলো রঞ্জিতের। উচ্চারণ করে করে পড়ল সে—"রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস্"। একটা লাল ঝাণ্ডা। তারও ওধারে কয়েকজন নেতার আবক্ষ ছবি।

যতীনের সাড়া মিলল দরজার ওপার থেকে। —হাঁ কানুনি মজুর আন্দোলনের নিশানা ওখানা। ভোটে যদি পাকাপাকি ভাবে হরতালের সিদ্ধান্তই হয় শেষ পর্যন্ত—তবে ঐ কানুনি নিশানার কতখানি সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে বলা খুবই শক্ত।

রঞ্জিত শুনল, জবাব দিল না কিছু। জবাব করার কিই বা আছে। কারণ এ সকল বিষয়ের সব কিছু খুঁটিনাটি জিনিসের জবাব করার অধিকারও তো অর্জন করতে হয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বস্তি মহল্লার অন্ধকারের কাঁড়ির মধ্যে—রঞ্জিত আর যতীন নেমে দাঁড়াল। অলিগলির গোলকধাঁধা ঘুরে ঘুরে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বড় রাস্তায় এসে উপস্থিত হলো।

সভার ঘটনার জের টেনে পথচলার স্তব্ধতা ভঙ্গ করল রঞ্জিত—ডেকে এনে এভাবে বিপদে ফেলা কিন্তু গুরুতর অন্যায়।

কৌতুক করে যতীন রঞ্জিতের অসন্তোষ উড়িয়ে দিল। —কেন! পয়সাও দেবে না, কাজও করবে না। ভদ্দর লোকের ছেলে। আইডিয়ালের রোমান্স আছে। অথচ দুটো সুবিধাই চাও—এটা কী ভাল কথা!

মুখের মধ্যে একটা শব্দ করল রঞ্জিত—উঁহু পয়সা দেবার অনিচ্ছা নয়। কিন্তু আগের থেকে বলবে তো। প্রস্তুত হয়ে আসার নোটিস দেবে তো। ধরো যদি আংটিটা নাই থাকতো আঙুলে।

—তোমার আঙুলে যে একটি আংটি আছে সেটা প্রথম থেকেই আমার নজরে পড়েছিল। আর না থাকলেও কি বিপদে পড়তে দিতাম। প্রতিশ্রুতি

আদায় করে নেবার ব্যবস্থাও তো চালু আছে—অর্থাৎ বাকীর খাতায় চাঁদা। আমাকে কি সত্যি সত্যিই অত খারাপ লোক মনে হয় তোমার ?

রঞ্জিত হাসতে হাসতে বলল—যাই হোক বাপু—খুব ব্লাকমেলিং-এর কায়দা দেখালে।

ইতিমধ্যে বাঁকের মুখে এসে গেল। যতীন রঞ্জিতের কাছ থেকে হেসে বিদায় গ্রহণ করল। এবং মুহূর্তের মধ্যে বাঁক ঘুরে আড়াল হয়ে গেল।

রঞ্জিতও অতঃপর ঘুরে দাঁড়াল নিজের পথে।

তার মনের উপর থেকে বৈকালীন বিশ্রী ঘটনার কলঙ্কচিহ্ন এখন সম্পূর্ণরূপে অপসৃত।

॥ এগারো ॥

পাসের খবর বেরুতেই রাণী দিদিমণি সেদিন বিকেল বেলা হঠাৎ হাজির হলেন সীতাদের বাড়ী। বাইরের ঘরে কোল-আঁধারে বসে সীতা আর রঞ্জিত। কি একটা বিষয় নিয়ে তর্ক করছে ওরা। রাণী দিদিমণি বৈঠকখানা ঘর দিয়ে না ঢুকে ঢুকলেন সদর দিয়ে।

ভবভূতি বাবুর স্ত্রী সাড়া পেয়ে এসে দাঁড়ালেন।

তারপর সহসা রাণীকে দেখে দ্বিধাজড়িত ভাবে বললেন—অ। দিদি। এসো। উনি ও ঘরে।

কমলা একটা হারিকেন জ্বালিয়ে নিয়ে এলেন। হারিকেনের নিষ্প্রভ আলোয় কমলার চেহারা দেখে কেঁপে উঠলেন দিদিমণি।

কমলার দেহের সে লাবণ্য আর নেই। তবু নদী মরে গেলেও রেখা থাকে। দেহের বর্ণ আছে। লাবণ্য আর ঔজ্জ্বল্য গেছে খোয়া। নাকের দুপাশ থেকে প্রৌঢ়ত্বের সংকেতজ্ঞাপক ভাঁজ নেমেছে। আয়ত চক্ষুদুটি ঠিক তেমনিই আছে। তবে দীর্ঘ সংগ্রামে ক্লান্ত তার পাতা দুটি।

কমলার চিবুক উঁচু করে ধরেন রাণী দিদিমণি। ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন দুজনে মুখোমুখি। আলোটা রাণী দিদিমনির হাতে। উঁচু করে আলো ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন মুখখানা কমলার। বলেন—এই হাতেই বে দিয়ে এনেছিলাম গো তোমাকে। চোখে অবশ্যি কম দেখছি। ডাক্তার বলছে ছানি

পড়ার লক্ষণ। কিন্তু তা বলে কী এতই কম দেখি? কী ছিরি হয়েছে তোমার? চাঁপার মত সে বর্ণ, কমলার মত সে রূপ······

—আঃ বুড়ো বয়সে কি হচ্ছে। উনি ওখানে আছেন।—বুড়ো বয়স স্মরণ করিয়ে দিতে রাণী নিরস্ত হন না—নিরস্ত হন 'উনি ওখানে আছেন' স্মরণ করে। অঙ্গ চালনা সংযত করে বলেন,—কৈ—

ভবভূতি বাবু হাসছিলেন না। নীরবে গম্ভীর দৃষ্টিপাতে উভয়ের মুখের উপর একবার চোখ ঘুরিয়ে নিলেন। তারপর বললেন—তাহলে আসতে পারলে তুমি।—কোন জবাব দিলেন না দিদিমণি।

কমলা বললেন—বাজার হাট, মায় অসুখে ডাক্তার ডেকে দেবার পর্যন্ত একটা লোক নেই। রঞ্জিত বেচারা তবু সময় অসময় সাহায্য করে।—হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—তোমরা একটু আলাপ কর। আমি আসছি।—হাজার কাজ সংসারে। কমলার বসবার সময় কৈ?

এইবার বসে নিয়ে রাণী একটা পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে সর্বাঙ্গ দেখে নিলেন ভবভূতি বাবুর।—অসুখ টসুখ করে নি তো?

একটা ইংরেজী খবরের কাগজ পড়ছিলেন ভদ্রলোক। মুখ না তুলেই চিরাচরিত অভ্যাস মত জবাব দিলেন—অসুখ? না অসুখ ঠিক নয়। তবে আজ কয়েকদিন বাতে একদম পঙ্গু হয়ে পড়ে আছি।

কটাক্ষ হানলেন রাণী।—হুঁ। বাত বুঝি আর অসুখ নয়। তা সে কথা যাক। কিন্তু সংসারের এরকম দৈন্যদশা ধরিয়েছো কতদিন থেকে?

ভবভূতি বাবু জবাব দিলেন না।

রাণী পুনর্বার শুরু করলেন—কিন্তু তোমার তো একটা স্বভাব ছিল—সুসময়ে না হোক অসময়ে স্বার্থের দায়েও আমার স্মরণ নিতে। সেটা ছাড়লে কিসে!

ভবভূতি বাবু তবুও নিশ্চল।

—নাঃ সে কৈফিয়ৎই বা আমার কী দরকার। তা একটা সুখবর দিই শোন। সীতা পাস করেছে।

—অ।—নির্লিপ্ত উত্তর।

সীতা সম্বন্ধে এই ধরনের নির্লিপ্ততায় রাণী দিদিমণি একটু ব্যথিত হলেন।

—তা সীতা ফেল করলেই খুশী হতে নাকি?

ভবভূতি মুখ তুলে এতক্ষণ পরে একটা সবজান্তা হাসি হাসলেন। তারপর বললেন ধীরে ধীরে—তুমি বড্ড বক এখনও।

—বকি বলেই চলে ফিরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তুমি যেরকম বোবার মত ভাবখানা করছ, দেখলে তো মনে হয়, ফেল করলেই খুশী হতে।

—সীতা ও ঘরে আছে—ভবভূতি জানালেন।

—জানি—তা তোমার চিকিৎসাপত্র কিছু চলছে?

—কতদিন ঘরে বসে থাকতে হবে তারই নেই ঠিক। রোজগারই তো বন্ধ হয়ে যাবে এরপর।

কমলা ঘরে ঢুকলেন এক পেয়ালা চা হাতে করে। খানিকটা তেলেভাজা অন্যহাতে একখানি রেকাবিতে। টেবিলের উপর রাখলেন।

—নাও একটু জল খাও। গরীবের ঘরে যখন পায়ের ধুলো দিয়েছো—

—দেখ কমলা ঠাস করে একটা চড় যদি না লাগিয়ে দিই।—বলে হাসতে হাসতে ওর হাত থেকে পেয়ালা, রেকাবি টেনে নিয়ে সামনে রেখে উঠে দাঁড়ালেন আচমকা রাণী।

তারপর ওদের অবাক করে, কিছু না বলে ওঘরে চলে গেলেন এবং কয়েক মুহূর্ত পর সীতাকে সঙ্গে করে প্রবেশ করলেন। ফ্যাল ফ্যাল করে চাইছিলেন ভবভূতি আর স্ত্রী উভয়েই।

—ও ছেলেটি কে?—সীতাকে জিজ্ঞাসা করলেন রাণী।

—রঞ্জিত দা, দাদার বন্ধু। পড়াশুনো দেখে নেই ওর থেকে।

—তা হলে মাস্টার বল।

সীতা ঘাড় নীচু করলে।

—তা হলে ডাক, ওকে ডাক তো এখানে। —সীতা ডেকে নিয়ে এল।

রঞ্জিত ঢুকল খানিকটা সন্তর্পণে। রঞ্জিত আর সীতা প্রবেশ করতেই দিদিমণি তার উচ্ছলতা সংযত করে শিক্ষয়ত্রীর নিটোল গাম্ভীর্যে ফিরে এলেন। খালি চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে রঞ্জিতকে বললেন—বসো বাবা—ওখানে। —শুধালেন না নাম। জানতে চাইলেন না ঠিকানা। নারীসুলভ ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসা বা কোনরূপ আগ্রহই দেখালেন না এই ভদ্রমহিলা। এ বিশেষত্বটুকু আটকে রইল রঞ্জিতের চোখে। তেলে ভাজার রেকাবিটা ওঠালেন। তারপরে কয়েকটা বেগুনী আর চপ হাতে তুলে দিয়ে বললেন—নাও, খাও, রেকাবি পাবে না। হাত পাত। —রঞ্জিত হাত পেতে গ্রহণ করল। বাকি ভাজাগুলো দণ্ডায়মান সীতার

হাতে তুলে দিয়ে বললেন—খা। দিনকাল ভাল না। বেশী তেলে ভাজা তোকে দেব না। রঞ্জিতকে বেশী দিলাম হিংসা করিস না; কারণ ও পুরুষ ছেলে। অসুখ করলে চিকিৎসা হবে। আর তা ছাড়া মেয়েদের জিভ ছোট করতে শেখা উচিত।

সবাই হাসল। ঘরের বাতাসটা যেন লঘু হয়ে গেছে। আজ সন্ধ্যাটার স্বাদ যেন অন্যরকম।

রাণী দিদিমণি চাটুকু শুধু খেলেন। তারপর বললেন—সীতা তোমরা এবার যেতে পারো। তোমাদের অর্ধসমাপ্ত আলোচনটা শীগ্‌গীর শেষ করে ফেল। তোমাকে সঙ্গে করে একবার বেরুবো আমি। আর রঞ্জিত, তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে আমার কাছে যেও। আলাপ পরিচয় করা যাবে। একলা পড়ে থাকি।

ওরা চলে গেল ঘর থেকে।

ঘরের মধ্যে দিদিমণি ছাড়া আর কারও ইচ্ছা আছে বলে প্রতীতি হয় না।

চা শেষ করে দিদিমণি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন—সীতার চাকরি করা দরকার বলেছিলে, সব দেখে শুনে আমিও বুঝেছি, বিয়ের চেষ্টার চেয়ে একটা চাকরির চেষ্টা করাই বেশী প্রয়োজন। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আমি। রাত্তির বেশী হয় নি। তাড়াতাড়িই ফিরবে।—এটুকু বলে কমলার পানে ফিরলেন, তার দিকে চোখ নিবদ্ধ করে তার উদ্দেশেই জানালেন—আর দেখ কমলা, সুসময়ে ভুলে থেকো ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। দুঃসময়ে যেন মনে পড়ে। এই যে বাতে ভুগছেন চিকিৎসা হচ্ছে না। বঙ্কিমটার একটা হতচ্ছাড়া কাণ্ড ঘটে গেল। সময় মত একবার কানেও তো পৌঁছায় নি।

উত্তরের অপেক্ষা করলেন না। সরাসরি বাইরের ঘরে এসে ঢুকলেন। সীতা আর রঞ্জিত ইতিমধ্যে ভাঙ্গা আসর আবার জমিয়ে তুলেছে প্রায়। মুখোমুখি উপবিষ্ট। রঞ্জিত কি একটা পড়ছিলো, সীতা নীরব শ্রোতামাত্র। দিদিমণি এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে রঞ্জিত পড়া শেষ করে ফেলল। তারপর বললো। সুরটা উপদেশের—বঙ্কিমের তুমি বোন সেটা তোমার মনে রাখা উচিত। আর এটা মনে করাও ভুল যে এক্ষেত্রে মেয়েদের কোন কাজ নেই।—আরও কিছু বলার ছিল রঞ্জিতের। কিন্তু তা বলবার পূর্বেই দিদিমণি নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করলেন।

—পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল কিন্তু মাস্টার মশাইয়ের লেস্‌ন্ দেওয়া শেষ হলো না এখনও।

হকচকিয়ে উঠল দুজনে।

—ও আপনি।—উভয়েই সমস্বরে বলল আর উঠে দাঁড়াল সাথে সাথে।

—হাঁ আমি। আমি ভাবছিলাম কিন্তু তুমি বুঝি আমার নিন্দা মন্দ করছ। তা না করে লেস্‌ন্ দিচ্ছ। খুশী হলাম দেখে।

—সে কী নিন্দে করব কেন?—রঞ্জিত অবাক হয়ে শুধাল।

—নিন্দেই যে আমি পাই। গলাটা হঠাৎ কেঁপে গেল দিদিমণির। মুহূর্তে সামলে নিয়ে চশমটা ঠিক করে নিলেন। আবার সুরু করলেন—আমার সন্তানের বয়সীই হবে, তুমি সম্বোধন করছি বলে কিছু মনে করো না যেন বাবা।

রঞ্জিতও বিব্রত বোধ করে —না না আপনি আমায় তুমি করেই বলবেন।

এবার কাজের কথা মনে পড়ল রাণীর। সীতাকে বললেন,—সীতা একটা ফর্সা কাপড় পরে তৈরী হয়ে নাও তো চট করে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল রঞ্জিত। সীতাও। কিন্তু দিদিমণির সামনে অনুসন্ধিৎসা জ্ঞাপনের প্রশ্ন চাপা রেখে কক্ষ ত্যাগ করল তৎক্ষণাৎ।

সীতা যেতেই দিদিমণিও বসে পড়লেন!

—আচ্ছা সীতাকে তোমার কেমন মনে হয় বল তো—কণ্ঠস্বরে প্রগাঢ় আন্তরিকতা এনে সহসা মুখ নীচু করে ভিন্ন খাদে প্রশ্ন করলেন উনি। অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন। কিঞ্চিৎ পূর্বে দিদিমণিও বোধ জানতেন না এমন একটা অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করবেন একটি অল্প পরিচিত ছেলের কাছে। কিন্তু সীতার জন্য অর্ধাবচেতন উদ্বেগ তার অন্তরে অনুক্ষণ হল বেঁধায়। তাকে কখন কোথায় প্রকাশ করে ফেলেন, তার হদিস তাঁর নিজের পক্ষেও সব সময়ে পাওয়া সম্ভব নয়। সীতাকে যারা জানে তাদের মতামত তার কাছে যে এত মূল্যবান কেন কে বলবে। কথাটা জিজ্ঞাসা করে উনি উদ্বেগ কম্পিত বুকে জবাবের অপেক্ষা করেন। কী জানি কী জবাব আসবে, ভাল না মন্দ, কটু না মধুর।

তির্যক করে চাইল রঞ্জিত। মুখটা নাড়তে চেষ্টা করলো ওকে বুঝতে না দিয়ে। তারপর বলল—প্রশ্নটা আপনার এমন যে দুনিয়ায় প্রায় সব কিছুই পড়ে ওর মধ্যে। জবাব দেওয়া দুরূহ।

দিদিমণি ভাবলেন, সম্ভবতঃ অনাত্মীয়া মনে করে রঞ্জিত জবাব দিতে ইতস্ততঃ করছে।

—তুমি বোধ হয় জান না, আমি সীতার……

—মণি মা—

—হাঁ তুমি জান বুঝি ?—

—শুনেছি আপনার কথা অনেক।

—অনেক শুনেচ ? কতটা বলত ?

—যতটুকুর বেশী আমার শোনার প্রয়োজন নেই।

—তবু—

—এই দেখুন। এবার কিন্তু ফেমিনিন ভাইস্ প্রকাশ পাচ্ছে আপনার।

হেসে উঠলেন দিদিমণি। বললেন—ভাইসটার নাম ফেমিনিন বটে কিন্তু স্থান-কালপাত্রবিশেষে ওটা উভয়তঃ। তবে তোমার যখন অনিচ্ছা শুনতে চাই না।

রঞ্জিত হঠাৎ পাল্টা প্রশ্ন করল—এদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার পরিমাণ না জেনে আপনি যে এতকথা জিজ্ঞাসাবাদ করছেন এটা কী……—

—কেন তুমি ওকে পড়াও—ওর মাস্টার। এর চাইতে বেশী আমার আর জানার কী প্রয়োজন। আমি নিজে শিক্ষাব্রতী। আমি বুঝি শিক্ষকের চাইতে মঙ্গল কামনা পিতামাতাও করতে পারে না সন্তানের।

—ওটা শিক্ষকদের দম্ভের কথা। আর দম্ভোক্তির মধ্যে কিঞ্চিৎ অতিশয়বাচন মিশ্রিত থাকেই।

জীবনে অধিকাংশক্ষেত্রেই একতরফা কথা বলা যাদের অভ্যাস এধরনের কথায় কথায় ঠোক্কর খাওয়ায় তাদের খারাপ লাগে আবার আত্মবিবেচনার অভ্যাসকে তোলে জাগ্রত করে। দিদিমণি স্তব্ধ হলেন। পদে পদে এত ঠোক্কর খেয়ে তিনি পেরে উঠলেন না।

—থাক বাপু থাক। তোমরা বঙ্কিমের দলের লোক। তোমাদের সঙ্গে কথায় কি আমাদের এটে ওঠবার জো আছে। তবে বাবা একটা অনুরোধ। বঙ্কিমকে ওর পরিবার হারিয়েছে। একমাত্র ছেলে। এখন সীতাকেও যেন তোমরা ছিনিয়ে নিওনা। —দিদিমণি এক অদ্ভুত অনুরোধ জানালেন অসহায় ভাবে। রঞ্জিত তো অবাক। বেশ খানিকক্ষণ মুখের পানে তাকিয়ে রইল মূঢ়ের মত।

সীতা এসে পড়ল তৈরী হয়ে।

ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন উনি।

—সীতা, মাস্টারকে নিয়ে একদিন যাবে আমার ওখানে। যেও বাবা একদিন। সীতাকে নিয়ে এখন একটা যায়গায় যেতে হবে আমাকে। তুমি একটু বস। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও ফিরবে।

সীতাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লেন দিদিমণি ক্যাপ্টেন বসাকের বাড়ীর উদ্দেশে।

লক্ষ্য ক্যাপ্টেন বসাকের কাছে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সীতার চাকরির ব্যবস্থাটা পাকা করা।

স্কুলসূত্রে ক্যাপ্টেন বসাকের সঙ্গে দিদিমণির ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘ দিনের। ক্যাপ্টেন বসাক শহরের নানা মহলে প্রভাবশালী মানুষ। কাজেই সীতার জন্য হাসপাতালের একটা সামান্য কাজের ব্যবস্থা করা কিছু কঠিন কাজ ছিল না। এতদিন শুধু পাসের খবরের জন্যই অপেক্ষা করতে হলো।

বসাক মানী লোক। ছোট্ট একটা নার্স ধরনের কাজের জন্য নিজের প্রভাব ব্যবহার করা অবশ্য তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন না। ভ্রাতুষ্পুত্র হিসাবে অজয়ের প্রভাবই এ ব্যাপারে যথেষ্ট বলে তাঁর বিশ্বাস। অতএব তাকে দায়িত্ব দিলেন।

কাকার অফিসের কাজ ভাল না লাগায় অজয় ইতিমধ্যে এই হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট কলেজেই আবার কম্বাইণ্ড কোর্সের ছাত্র হিসাবে ভর্তি হয়েছিল। দু'জনের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করল অজয়। অনেক রাত্তির পর্যন্ত গল্প করল। রাস্তায় দুজনকে পৌঁছে দিয়ে গেল পর্যন্ত।

যোগাযোগটা শুভ মনে হল দিদিমণির। সে রাত্রে অজয়ের সঙ্গে সীতার এই পরিচয়টাকে উপরি লাভ মনে করলেন তিনি। চাকরি ক্ষেত্রে এরকম শুভার্থী লোকের প্রত্যক্ষ প্রভাবের আওতার মধ্যে থাকা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে। এখন সীতার কপাল।

॥ বারো ॥

সাতটার শিটি এখনও বাজে নি। বাবুর বাগান বস্তির ঘরে ঘরে চলেছে কাজে বেরুবার জোর তোড়জোড়। শিটি বাজলে এক মুহূর্তও আর অবকাশ থাকবে না দাঁড়াবার। সাড়ে সাতটায় কারখানা চালু হয়। আধঘণ্টা তো পৌঁছুতে লেগে যায়। ঠাণ্ডারামের বউ এর মধ্যেই স্বামীর জন্য বাঙালী খাবার পাকানো প্রায় শেষ করে ফেললো। জলন্ত চুলোয় এখন রুটি সেঁকা চলছে। ঠাণ্ডারামের দুপুরের টিফিন। রামাধর মিস্ত্রীর বউ সেই সুদূর বিহারের

কোন্ কিষাণ পল্লীতে। তাই নিজের বিহারী খানা নিজেই পাকাতে ব্যস্ত রামাধর। দো চাপাটি।

বাবুর পুকুরকে কেন্দ্র করেই এ পাড়ার নামকরণ। বস্তিমহল্লার অধিকাংশই পুকুরের চারপাশে। আয়তনের দিক থেকে দীঘি নামের সঙ্গেই সামঞ্জস্য অধিক। লোকেরা অবশ্য বলে পুকুর। জলে নেই এমন কোন রসায়ন বিরল। বস্তিবাসীরা তাই দয়া করে পান করা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু বাসন মাজা থেকে সমস্ত গৃহকর্মই নিষ্পন্ন হয় এই নীল জলে। অবগাহন স্নানও বাদ যায় না।

ঠাণ্ডারাম ডুব সেরে উঠানে এসে দাঁড়াল।

—কৈ রে কাপড়খানা বাড়িয়ে দে।

বউ সঙ্গে সঙ্গে একটা কাপড় ছুঁড়ে দিল ছোট্ট উঠোনের মাঝখানে। ঠাণ্ডা লুফে নিল কাপড়খানা।

শীতের সাতটা মানে বেশ সকাল। সূর্য ওঠার বলতে গেলে এখনও অনেক বাকী। বামুনদি দ্বিতীয়বার ঘুম ভেঙ্গে উঠলেন চোখ মুছতে মুছতে। প্রথমবার সেই শেষরাত্রে বাড়ীসুদ্ধ সবাইকে জাগিয়ে তুলে দেবার কাজ সেরে, প্রয়োজনমত কারও কারও চুলোয় কোন কোন দিন আঁচ দিয়ে,—দ্বিতীয়বার প্রত্যহই আর এক কিস্তি ছোটখাট ঘুম দিয়ে নেন উনি। জগৎ ঠাকুর দোকানে চলে গেছে সেই কোন প্রত্যুষে।

—বামুনদির আর কী। সকালে তো আর হুজ্জুতের বালাই নেই। বেশ আছ।—টাইট করে মালকোঁচা মেরে কারখানার কালো জামা সাঁটা হয়ে গেল গায়ে ঠাণ্ডারামের।

ঘুমের জড়তা কাটে নি। তাই স্বাভাবিক ক্ষুরধার জিহ্বা নাড়তে ইচ্ছা যায় না বামুনদির। তবু বলেন জড়িয়ে জড়িয়ে,—না আমার আবার হুজ্জুৎ কী! ব্যাটারা যখন শেষরাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ন্যাজ নাড়বে, তখন শুধু আমাকে লাগবে তাদের মুখে আগুন দেবার জন্যে। হ্যাঁরে তোর বউএর চুলো আজ ক'বার নিভেছিলো খোঁজ রাখিস!

ঠাণ্ডা ঈষৎ হাসে—আমার বউয়ের না জগৎ ঠাকুরের?

জিভের জড়তা ভেঙ্গে এসেছে বামুনদির।

—জগৎ ঠাকুরের তোদের মত মাগের চুলো ধরানোর উপর নির্ভর করলে চলে না। তা'লে তোদের লোহারখানার চলতে পারে, তেলে ভাজার দোকানের

ঝাঁপি বন্ধ রাখতে হয়। বাসী মুখ আমার, ঘাটাস নি বলছি।—প্রাতঃকালীন জড়তার আর সাধ্য নেই মুখ ঝামটা ঠেকিয়ে রাখে।

ঠাণ্ডারামের সেই উজবুকের মত হাসির ভঙ্গি আর মুখনাড়া খাওয়া।—মুখ-নাড়া খেতে তোদের এতও ভাল লাগে বাপু।

ততক্ষণে বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়েছে ঠাণ্ডা।

একটা শানকিতে গরম ভাত আর খানিকটা ডাল ঢেলে দিয়ে খেতে দেবার উদ্যোগ করে মোহিনী—ঠাণ্ডার স্ত্রী। রূপে মনোমোহন না হলেও, সব কিছুতেই অদ্ভুত রকমভাবে চুপচাপ থাকায়—স্বভাবতঃ মনের উপর মোহ বিস্তার না করে পারে না। ঠাণ্ডারামেরও করেছে—তার ঝামেলা কমিয়েছে অর্ধেক।

বাইরের গলি থেকে কে যেন ডাকল। ঠাণ্ডার আগে সে ডাক শুনতে পেলেন বামুনদি। বললেন—ঐরে যা। মুখের ভাত ফেলে যা, কোন্ মুখপোড়া ডাকছে শুনে আয়।

খেতে বসার মুখেই বাধা। বিশ্রী লাগে! তবু বারান্দা থেকে নেমে পড়ে ঠাণ্ডারাম। দরজা ডিঙ্গিয়ে গলিতে এসে দাঁড়ায়।

—আরে শংকর গোসাঁই যে এই উনোক্কালে! কি ব্যাপার।—অত্যন্ত অবাক হয়ে যায় ঠাণ্ডা।

অগণিত বস্তির বেঁটে বেঁটে ঘরগুলো চারপাশে। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে শংকর। অনেক অনাড়ষ্ট মনে হচ্ছে নিজেকে। বড় ইমারতকে খুঁটি করে সেদিনও এসেছিল ঠাণ্ডার আস্তানায়। আজকার দৃষ্টিপাতে সেদিনকার সেই আর্তি আর বিব্রতভাব যেন ছায়া ফেলতে পারছে না। মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্নের শেষে আজকার প্রত্যুষ হচ্ছে সেই প্রত্যুষ—যখন থেকে সে আর কোন নির্ভরতা আর আশ্রয়ের জন্য উন্মুখ হবে না। সংকল্পের আনন্দে মনের ভার যেন তার অর্ধেক নেমে গেছে।

ঠাণ্ডাকে দেখে একটু হাসল সে। তারপর বলল—তোকে আমার বড্ড ইয়ে—মানে দরকার। তাই চলে এলাম।

—আমাকে? কেন গো গোসাঁই?

—হাঁ তোকে। কারণ আর বিশেষ কারো সাথে আমার ইয়ে নেই তেমন।—গলার স্বরের মধ্যে কেমন একটা চাপা অসহায়তা প্রকাশ পেতে পেতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়।

—বেশ তা বলে ফেল চট্‌পট্‌। আমায় আবার এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে কিনা কাজে।—অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ কণ্ঠ।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে শংকর বলে,—যেন বলতে কুণ্ঠা আসছে আর কুণ্ঠার আবর্জনা জোর করে সরিয়ে দিতে হচ্ছে তাকে।

—একটা থাকার জায়গা চাই। আজই। মানে যোগাড় করে দিতে পারিস ভাই?

বহু চেষ্টা করেও কথার শেষের দিকে একটা মিনতিবাচক স্বর ছুঁয়ে যায়। কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হয়—বসাক বাড়ীর কেউ নয়—গ্রামের ঠাণ্ডারামের সঙ্গে কথা বলছে গোসাঁই বাড়ীর শংকর। অস্থি মজ্জায় জড়ানো গ্রাম্য বর্ণাভিজাত্যের ঠুন্‌কো অবচেতন অনুভূতি সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে কাজ করতে শুরু করে।

অনাবশ্যক জোর দিয়ে শংকর বলে ওঠে—মানে, কত ভাড়া লাগবে বলতে পারিস?—কথাটা বলার পর বুকটা অজ্ঞাতে কেমন যেন ভরে উঠল হঠাৎ।

না হেসে পারল না ঠাণ্ডারাম।—বিনা ভাড়ায় মানে ফোকটে কে আর কাকে ঘর দিচ্ছে বল। কিন্তু কেন বল দিকিনি?

—মানে, কাজ আছে—ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে কথা বলছে এখনও শংকর!

—কী কাজ। কার জন্যে?

—কেন, আমার জন্যে?

—আমাদের এই বস্তিতে?

—হাঁ। যেখানে থাকতাম সে জায়গাটা, মানে, ছেড়ে দিয়েছি।—মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যে জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে কিছু একটা অসামান্য কাজ করেছে সে।

পরিস্থিতির মুখে ভাড়ার কথাটা তো বলে ফেলল। কিন্তু ভাড়া কোথা থেকে আসবে শংকর জানে না। একটু আগেও ভেবে দেখেনি।

এখন একবার চিন্তা করবার চেষ্টা করায় ভ্রূ কুঞ্চিত হল। এতক্ষণে কণ্ঠে পূর্ণ মুনশীয়ানা এনে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা বস্তির এই সমস্ত ঘরে কী রকম ভাড়া পড়বে বল দিকিনি।

হঠাৎ বুকটান করে দাঁড়াতে ইচ্ছে করল তার। দয়িত হওয়ার আর নিছক সাহায্য ভিক্ষার পরিবর্তে সে যে আত্মমর্যাদার ভিত্তিতে সাহায্য চাইতে সক্ষম

হয়েছে, ভাড়ার ভিত্তিতে ঘর চাইতে সক্ষম হয়েছে—সাধারণ দৃষ্টিতে অত্যন্ত নগণ্য ও হাসি পাবার মত ঘটনা।

অথচ একটা ভেঙ্গে পড়া আত্মবিশ্বাস যেন নতুন করে আড়মোড়া ভাঙ্গছে তার ভিতরে ভিতরে। আর শিরদাঁড়াকে টান আর ঋজু করে তুলছে।

যেন একটা বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল শংকর চোখের নিমেষে। অবশ্য গ্রামের ঠাণ্ডারাম না হয়ে অন্য কেউ হলে কি ঘটত কেউ জানে না। একটা নতুন আস্বাদ, একটা নতুন আত্মচেতনা জন্ম নিয়েছে তার এই সামান্য একটু কথা বিশেষ মুহূর্তে সফলভাবে বলার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু সদ্যোজাত এই চেতনা এখনও অত্যন্ত কাঁচা। তাই পদ্মপত্রের উপর শিশির বিন্দুর মত টলমল করতে থাকে। মুখচ্ছবিতে উদ্‌বেগ আর আশংকা। ঠাণ্ডারামের জবাবের প্রত্যাশায় সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। কি জানি কি জবাব দেবে সে!

—এই খোলার ঘরে কি আর শেষ পর্যন্ত তোমার পোষাবে গোসাঁই!—ঠাণ্ডারাম ঈষৎ সন্দেহ প্রকাশ করে মাত্র। উঃ আর একটা বোঝা নেমে গেল, গাঁট পেরুল।

—ওঃ এই কথা।

—'ওঃ এই কথা' বললেই তো হবে না। খোলার ঘরও অত সস্তায় ভাড়া পাওয়া যায় না আজকাল। তবে তুমি এসো ও বেলায়। বাড়ীওলা তখন ফিরতে পারে। দেখব তখন কথা ক'য়ে।

—তাহলে ইয়ে—তোর এই বাড়ীতেই বল।

—হাঁ হাঁ এই বাড়ীই। আবার কোথায় যাব বাড়ী খুঁজতে। তাছাড়া নিজের হাতযশে না কুলোয় বামুনদি আছে।

—আমার কিন্তু আজই ইয়ে মানে দরকার। এটা কিন্তু মনে রাখিস ভাই।

সাইরেনের মত আওয়াজ করে ভোঁ বেজে ওঠে। কাঁটায় কাঁটায় সাতটা। ছমিনিট ধরে বাবুর বাগান মহল্লার আকাশ ছেয়ে থাকে সে আওয়াজ। আর্তনাদের মত লাফিয়ে ওঠে ঠাণ্ডা—ঐ যাঃ আমার শিটি বেজে গেল। আর দাঁড়ানোর তর নেই। তুমি বাপু ওবেলায় এসো কিন্তু।—ভাল করে বিদায় নেবার অবকাশ পর্যন্ত নেই আর। ঘুরে দাঁড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়ে। সটান ঢোকবার সময় দরজার পাশে উৎকর্ণ একখানা মুখ দৃষ্টিগোচর হয়। বামুনদি।

—কি গো সেই ভদ্দর লোকের ছেলেটা না?

—হাঁ গো বাপু হাঁ। এখন জ্বালিও না তো আর।—ব্যস্ততায় বামুনদির কথার জবাবও দেওয়া হয় না তেমন করে।

—তা বসতে পর্যন্ত বললি না যে। লোহার কারখানায় কি তুই একাই কাজ করিস নাকি?—বামুনদি বকর বকর করতে করতে ভিতরে ঢুকে পড়েন। ঠাণ্ডার ভ্রূক্ষেপ নেই। গোগ্রাসে ভক্ষণ শুরু করে দিয়েছে।

ওবেলা পর্যন্ত কী হবে কিম্বা ওবেলাতেও যদি প্রকৃতপক্ষে থাকার জায়গা স্থির না হয়—তাহলেই বা রাতের আশ্রয় কোথায় জুটবে! এই মুহূর্তে এইসব চিন্তাই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এ সমস্ত অতীব বাস্তব ও প্রাসঙ্গিক চিন্তা শংকরের মাথায় তেমন স্থান পেল না!

নেহাৎ অসহ্য হয়ে বসাক বাড়ী ছাড়ার পর বেশ পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে মনে হয়েছিল খানিকক্ষণ। রাস্তায় বেরিয়ে কল্পনার চোখে দেখল পেছনের কপাট বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু প্রথম আসার সময়কার মত অথবা ঐ বাড়ীর আশ্রয়ে থাকাকলীন—ঐ বাড়ী ত্যাগ করার চিন্তায় যে ধরনের অসহায়তার ভাব জাগতো—কৈ সে ধরনের অসহায় লাগছে না তো নিজেকে। কখন যেন একটা ধোঁয়াটে সংকল্প মনের ফাঁকা স্থানটা ভরাট করে চিক্ চিক্ করে জ্বলতে শুরু করেছে। আর তাছাড়া উপায়ই বা কি। তাগিদের নাম মহাশয়।

অনুকম্পা গ্রহণের পীড়নখানা থেকে, পরাশ্রয়ের ঐ জবর বন্দীখানা থেকে নিজেকে মুক্ত করে বেশ হাল্কা বোধ করলেও—একান্ত আপন দায়িত্বে ও আত্ম-মর্যাদায় কথা বলবার আস্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত নিজের কাছে নিজেকে এমন ভালো তো লাগে নি। ধীরে ধীরে নিজেকে নিজেরই সমীহ করার ইচ্ছা জাগতে শুরু করল। ঘটনাটা সামান্য। অত্যন্ত সামান্য। কোনো শিশুর প্রথম শব্দ উচ্চারণ করতে পারার মতই সামান্য। শহর জীবনের নিম্নতম মান অনুসারে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এখনও নিতান্ত সামান্য পরিস্ফুট। কিন্তু নগর জীবনের আবহাওয়ায় নিজেকে সমীহ করার এক বিরাট চেতনা—এই সামান্যতম আত্ম-প্রকাশকে কেন্দ্র করে শংকরকে এমন বিভোর করে রাখল যে ঠাণ্ডার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর সারাদিন কি করে কাটল তার হিসাব নিজেই সম্পূর্ণভাবে করে উঠতে পারল না। গ্রাম ছাড়ার পর এই প্রথম নিজের প্রতি নিজের ভালবাসা বিকাশের সূত্রপাতের এ মহান দিন—প্রথম প্রেমের আবেগে মত্ত নবদম্পতির মত—অনেক কাল ভাস্বর হয়ে থাকবে তার মনে।

॥ তেরো ॥

বিকেলে ঘরভাড়া সাব্যস্ত হয়ে গেল ঠাণ্ডাদের বস্তিতে। বাইরের দিকের আধ-ভাঙ্গা ছোট্ট খাঁচার মত ঘরখানা। বৈরাগী বাবার ঘরের ঠিক উল্টো দিকে। শেষ পর্যন্ত বামুনদির হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হলো। ভাড়া ঠিক হলো মাসিক সাত টাকা। রাত্রে শোয়ার মত বিছানা আর বাস করার মত তৈজস—কিছুই আনে নি সে।

ফলে ঠাণ্ডা শুনল বামুনদির ট্যাকৃট্যাকানি।

—ধন্যি ভদ্দর লোকের ছেলে বাপু। ওঠ ছুঁড়ী তোর বে। আজই ভাড়া, আজই শুতে হবে। বিছানা নেই, পত্তর নেই, শোবেই বা কোথায় আর খাবেই বা কী?

ঠাণ্ডা বলল—সেজন্যে এমন ভাবনার কী আছে। আমার বেলা একা বামুনদি ভরসা ছিল। তাতেই ভাবতে হয় নি কিছু। আর গোসাঁইএর বেলা বামুনদি তো রয়েছে। ঠাণ্ডা আবার উপরি।

বৈরাগীর গলা খাঁকারি শোনা গেল।

—নতুন ভাড়াটে এলো বুঝি, বামুনের মেয়ে?

—তা তো এলো। তা ঢঙের কথা বাদ দিয়ে মুখ্যু কথাটা বলে ফেল দিকিন্ চটপট। অত জমিয়ে কথা বলার সময় নেই আমার।

বৈরাগী মধুর সলজ্জ হাসিতে তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করে বারান্দায় এসে জমিয়ে বসে পড়ল।

—হেঁহেঁ ভাবনা নেই বামুনের মেয়ে। তরকারি আজ আমি উল্টে তোমায় দিতে পারি। আজ তরকারি পেয়েছি অফুরন্ত। কিন্তু পয়সা—সে বেলায় গেরস্থরা টন্‌ক জানলে বামুনের মেয়ে—ভারী সেয়ানা। আজ আমার এই গোটাদুয়েক বিড়ি আর হাতে গুণে একটা দেশলাই কাঠি, ব্যস্।

দুটো হাতের এক অপূর্ব মুদ্রা প্রদর্শন করল বৈরাগী বাবা। তারপর উদ্দেশ্য-মূলক ভাবে স্বগতোক্তি করল—দিনান্তে চুলোটা একবার না ধরালেও চলে না।

—মরি মরি! চালের কোথায় ঠিকানা নেই, চুলো ধরানোর শখ এদিকে ষোল আনা।

—হেঁ হেঁ সেও জগৎ ঠাকুরের এষ্টক ভরসা। গুরু গুরু।

—কেন জগৎ ঠাকুরের এষ্টক কী অফুরন্ত যে দ্রুপদীর হাঁড়ির মত এই

বেরুচ্ছে আর বেরুচ্ছে। ঢের ঢের বেহায়া লোক দেখেছি—কিন্তু এক দঙ্গল বেহায়া এক বাড়ীতে, বুঝি মাথা কুটলেও সাত রাজার রাজত্বে মিলবে না।

বামুনদির মেজাজ ভালই বলতে হবে। কারণ মেজাজের সময়কার বাক্য-বিন্যাসের আভাস দেখা দিয়েছে তার জিহ্বায়।

—ছি ছি, জগৎ ঠাকুরকে পর্যন্ত বেহায়া বানাচ্চো গো বামুনের মেয়ে। সে বেচারা সাতে নেই পাঁচে নেই তাকে আবার এর মধ্যে টানা কেন?

বামুনের মেয়ে বিড়ি আর দেশলাই কাঠি এনে দিয়ে বলল—একটু রয়ে সয়ে কথা বলো বাপু। তোমার তো আবার লাগাম-ছাড়া মুখ। একটা ভদ্দর লোকের ছেলে ভাড়াটে আছে।

বৈরাগী হকচকিয়ে গেল।—আমার লাগাম-ছাড়া মুখ।—তার পরেই বুঝতে পেরে সামলে নিল—হাঁ হাঁ নিশ্চয়ই। তা সে আমি সামলে নেব'খন।—মুখের কাছে তুড়ি মারল দুটো। গুরুর নাম উচ্চারণ করল। তারপর সরে পড়ল গুটি গুটি পায়ে।

ঠাণ্ডারাম নিজের ঘর থেকে একটা মাদুর হাতে করে শংকরের ঘরে উপস্থিত হলো। শংকর বাইরের ভাঙ্গা খাটিয়া এনে পেতে ফেলেছে ঘরের মধ্যে। ইতিমধ্যে ঘরটাকে খানিক ঝেড়ে পুঁছেও নিয়েছে।

ঠাণ্ডা বলল—খুব কাজের লোক তো দেখছি। খাটমল গো খাটমল। ছারপোকার জ্বালায় অস্থির হয়ে বৈরাগী বাবা যে ওটাকে বার করে রেখেছিল। তার চেয়ে বাঙলা বিছানা এই মাদুরটায় রাত কাটিও।

ঈষৎ জড়সড়ো হলো শংকর।

ঠাণ্ডা তা বুঝতে পেরে বলল—তোমার ব্যাপার স্যাপার তো বেশ কঠিন দেখছি। যতই বল বাপু তোমাদের ভদ্দর লোকের ছেলেদের ঐ দোষ, পেটে খিদে মুখে লাজ। খোলসা করে কিছুতেই বলে উঠতে পারবে না ভেতরের কথা।

বৈরাগী বাইরে তোলা উনুন ধরাতে ধরাতে গলা উঁচিয়ে সাড়া দিলে—কে গো ঠাণ্ডারাম দাদা। আমার নামে বুঝি খুব লাগানি ভাঙ্গানি কচ্ছ নতুন ভাড়াটের কাছে।

—তা করব না! ছারপোকার জ্বালায় অস্থির হয়ে যে খাটিয়াটা নিজে ব্যবহার করতে পারলে না সেটা ভালমানষি করে গচিয়েছো নতুন ভাড়াটেকে। এদিকে ভেখটা তো বৈরাগীর।

—গুরু গুরু। শেষে তুমিও আমাকে এইরকম মনে করলে। রোদে জলে ভিজিয়ে ছারপোকা বংশ নিব্বংশ না করে কি আর আমি এমন কাজ করেছি ভাবছ?

—তা নিজে ব্যবহার করলে না কেন?

—করব করবই তো করছিলাম। এমন সময় নতুন ঘরে নতুন ভাড়াটে উদয় হলেন। নতুন ঘরে যে থাকে এ খাটিয়াখানা বরাবর তারই যে পাওনা—তা কী করে ভুলি বল। আমি বৈরাগী মানুষ—তাই যার পাওনা তাকেই ডেকে দিয়ে দিলাম।—মুখে একটা সরু বাঁশের চোঙ্গা মারফৎ চুলোয় ফুঁ দিতে শুরু করলো বৈরাগী।—ঘেন্না লেগে গেছে শালার চুলোয়।

খাটিয়ার উপর বসে পড়ল শংকর। সারাদিনের ঘোরাঘুরির ক্লান্তি এতক্ষণে পা দুটোকে পীড়া দিতে শুরু করল তার।

—খাওয়া দাওয়ার পাট কিছু হয়েছে গোসাঁই?—ঠাণ্ডারাম অত্যন্ত সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করল।

—হয়েছে, মানে পকেটে পয়সা ছিল।

—যাক তাহলে শুয়ে পড়। কাল সকালে দেখা হবে।

হেসে শংকর বলল—তা পড়ছি। কিন্তু বৈরাগীবাবার ধোঁয়া যেভাবে ঘরে ঢুকতে শুরু করল—শোয়া মানে ঘুমানো তো বেশ মুসকিল দেখছি।

ঠাণ্ডারাম চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো—বৈরাগীবাবার চুলো কিন্তু প্রায়ই মাঝ রাতে ধরে।

—না না ইয়ে মানে কিছু মুসকিল নয়। তুই ভাবিস নি।

ঠাণ্ডারাম হাসল—কিন্তু আর একটা কথা মনে পড়ল। কিছু মনে কোরো না। ভাড়ার কথা কিছু ভেবেছো। কোথা থেকে যোগাড় করবে?

—নাঃ। সেটাই তো এখনকার ইয়ে মানে ভাবনা।

—শুধু সেই ভাবনা! না আরও কিছু আছে। দু'বেলার ভাবনা সঙ্গে নেই?

—নেই, ঠিক তা নয়। তবে ইয়ে মানে তা নিয়ে তুই কিছু ভাবিস নি। আমি ঠিক আছি।

শংকরের মনে বেশ একটা অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। কোন কিছুর জন্যই সে ঠাণ্ডারাম অথবা কারও উপর এই মুহূর্তে নির্ভর করার ইচ্ছে রাখে না। অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে না করলেই বা এগোয় কী করে? আবার আত্মমর্যাদা সহকারে এগুনোর

পথই বা কী এ অবস্থায়? এই পথ হাতড়ানোর দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণটাই তার বাচন বিন্যাসে ফুটে ওঠে।

ঠাণ্ডারাম মনে মনে ভাবে। ভাবে আর হাসে। না ভাবলে তো চলবে! কিন্তু গ্রামের সম্পর্ক আর শৈশবের বন্ধুত্ব যে অনেকদূর অবধি শিকড় ছড়ায়। এই দূর শহরে অবধি। নইলে এক কারখানায় কাজ করে না, এক পাড়ার পড়শীও নয়,—এমন কারও জন্যে এ অবস্থাতেও তার নিশ্চিন্ত ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে সে রাজী নয়। ঠাণ্ডা চলে গেল।

ঘরের দরজা দরজা হয়েই আছে। ক্রুই এ কেটে সর্বাঙ্গ জর্জর। অতএব দরজা দেওয়া আর না দেওয়া—শালগ্রামের শোয়া অথবা বসার মত সমান কথা। ধোঁয়ার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া দুঃসাধ্য। বাঁশের বেড়ায় অর্ধেকটা অবধি কাদা লেপা। উপরের অর্ধেকটা কাদার প্রলেপহীন। ফলে সরু একফালি ঘেঁষঢালা গলির বিস্তার পেরিয়েই যে পুকুর তা দৃষ্টিপথে আসে।

অন্ধকার পক্ষ। নিথর তারাগুলোর ছায়া জলের মধ্যে চিক্‌চিক্ করে জলে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায় তার, বৈরাগী বাবার একতারার একাকী সঙ্গীতে। বাতাসে পুকুরের জলে জাগছে ঢেউ। তারার প্রতিবিম্বেরা সহস্র তারায় থরো থরো কাঁপছে—বৈরাগীর সঙ্গীত আর তার একতারার বৈরাগ্য ভরা তানে তানে। শংকর উঠে বসল। দরজা খোলাই আছে। বৈরাগীর কণ্ঠও আছে অব্যাহত।

……কেঁদে কেঁদে মরি।
আমার ফুটো নৌকা, ছেঁড়া বাদামে
বায়ু ধরে না।

গ্রামের এই নিজস্ব ভঙ্গীতে বাউল সঙ্গীতের বিশিষ্টতার সঙ্গে শংকরের একাত্মতা অনেকখানি। গ্রাম্য বাঙলার অজস্র অনাবিষ্কৃত পুরানো সংস্কৃতির ধারা যে গ্রামছাড়া পরবাসী হয়ে শংকরেরই মত অব্যক্ত বেদনায় গুমরে মরছে, ঠাঁই খুঁজে ফিরছে আজকের এই নিস্তরঙ্গ নিশীথে, বৈরাগীর কণ্ঠ আশ্রয় করে। সেও যেমন শহরের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হাবুডুবু খাচ্ছে, এ সুর ও যেন তাই। সে বেদনা কেউ বুঝুক আর না বুঝুক। বিমুগ্ধ বিদেহী তারারা তাই কাঁপছে থরো থরো নিস্তরঙ্গ পুকুরের জলে তরঙ্গ তুলে।

শংকর অবাক হলো। এই বৈরাগী লোকটি তো কঠিন। সে যখন

ঘুমোয়—তখনও চুলো ধরেনি তার। এখন চুলো নিভে গেছে বটে, ধোঁয়াগুলো এখন আর ঘরে ঢুকছে না বটে, কিন্তু বাউল সঙ্গীতের বাষ্পে, থম থম করছে সারা ঘর ; শুধু ঘর কেন বাবুপুকুরের কিনারায় অবস্থিত অনেকগুলো ছোট ছোট ঘরকেই রেখেছে প্লাবিত করে। লোকটা কী ঘুমোয় না সারারাত !

নিরালা শেষ রাতের নিঃশব্দ আঁধারে বৈরাগীর বৈরাগ্যভরা এ সুরের মায়া আর তারযন্ত্রের আলাপ তাকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখল অনেকক্ষণ। সে উৎকর্ণ হয়ে গভীর মমতায় শুনতে লাগল সে গান। এক সময় হঠাৎ তার মনে হলো সেও যদি অমনি করে গাইতে পারতো গান আর তারযন্ত্রের এই অদ্ভুত দরদী আলাপকে নিজের দুটো আঙ্গুলে বন্দী করার বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারতো—তো বেশ হতো।

গান শেষ হলো। শংকরও ওঠে দাঁড়াল। পাশে শূন্য খাটিয়া। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকাল। জলে দৃষ্টি নামাল। বাতাসে গানের রেশ এখনও কাঁপছে। তারারা এখনও কাঁপছে তাদের জলের প্রতিবিম্বে।

—কে নতুন ভাড়াটে নাকি গো। —বৈরাগী টের পেল। সোজা বাইরে এসে দাঁড়াল শংকর। নীচে ড্রেনের বাঁধানো একটা ধার যেখানে ঘরের ভিতের সঙ্গে মিশেচে, সেখানটায় একটা মোড়া পেতে ঠেসান দিয়ে বসে আছে বৈরাগী।

—বস গো নতুন ভাড়াটে, এই শানটার ওপর। বড় মিষ্টি হাওয়া। খাটমলের কামড়ে ঘুম হলো না বুঝি? —বৈরাগী সোজা হয়ে বসে নিল।

—খাটমল কোথায় পাব, খাটিয়ায় তো শুইনি। তোমার গানের কামড়েই ঘুম পালাল আমার। বেশ গাও তো বৈরাগী বাবা।

—হেঁ হেঁ হেঁ, তা গাই আমি মন্দ না। —রাত্রের মিশকালোয় চেহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টিগোচর হয় না। সমস্ত দাড়িগোঁফ মিলিয়ে এক অদ্ভুত সুন্দর সাদা কালোর রেখাচিত্র দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে।

চোখের জড়তা ভেঙ্গে গেছে শংকরের। উঁচু হয়ে বসে নিল।

—গান তো নয় যেন কান্না।

লজ্জা পেল বৈরাগী। —হেঁ হেঁ হেঁ তা বেশ বলেছ, গাওন তো নয়

কাঁদন। রাতের নিরালায় বাউল গান ঐ রকমই লাগে। আরও যদি নদীর মাঝে হয়। শুনেছো কোন দিন?

শংকর মাথা নাড়ল।

—তবে, আমার রেতের গানের আমিই শ্রোতা। শুধু আমি শুনি। দিনের বেলা আমার গান শুনলে কিন্তু এমনটি বলতে পারবে না।—বৈরাগী অভয় দিল।

আকাশের দিকে নজর পড়ল শংকরের। পাণ্ডুর হয়ে এসেছে আকাশ। দুপুর রাতের তারারা পাহারা বদল করেছে।

—এখন শেষ রাত্তির? —জিজ্ঞাসা করল শংকর।

—তা হবে। খেয়াল করিনি তেমন। সারাদিন ভিক্ষেসিক্ষে করে রাত দুপুর অবধি পাকসাক করতে করতে শরীর কেমন গরম হয়ে গেল। চোখে ঘুম এল না কিছুতেই।

—ভিক্ষেসিক্ষে কর কেন? অনেকদিন আছো। একটা চাকরি, একটা কাজ যোগাড় করে তো নিতে পারো। —শংকর অদ্ভুত প্রশ্ন করে। দয়িত হওয়ার প্রতি বিরাগ রাতের জড়তার মধ্যেও সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে ওঠে। হে হে হে করে হেসে উঠলো বুড়ো।

—হাসলে যে!

—এমন তাজ্জব কথা বৈরাগীকে কে আবার কবে বলে থাকে। চাকরি। কাজ। হো হো হো। —উৎকট হাসি।

শংকর বোকা বনে গেল! উঠে দাঁড়াল।

—চললে কোথায়? এসো বাকী রাতটুকু বসে গল্প করি।

—শুতে যাচ্ছি।

—অ, রাগ হলো বুঝি। আচ্ছা। তোমার বুঝি কাজকর্ম নেই কিছু?

—না।

—হে হে হে। বেকার! তাই জন্যই বুঝি যারা কাজ করে না তাদের উপর তোমার এত বীতরাগ। —কথার শেষে আবার একটু হে হে। শেষ-রাত্রে ছোট ছোট কথাগুলো যেন বড় বড় শব্দ করে উঠল। শংকর জবাব না করে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে উঠে পড়ল।

অল্পদূরে বৈরাগী বাইরের থেকেই বলল তবু—আমার হচ্ছে স্বাধীন ব্যবসা। বৈরাগীরা স্বাধীন জাত। তাদের কী বাধ্যবাধকতার মধ্যে যেতে আছে? —আবার একটু হে হে।

বেশ একটা মধুর মোহাবিষ্ট মন নিয়ে জেগে উঠেছিল শংকর। আর বেশ খানিকটা বিরাগের বাষ্পও পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল মেজাজে এরই মধ্যে। ঘরে ঢুকেই মেজেয় পাতা ঠাণ্ডার মাদুরটার উপর পুনরায় শুতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল শংকর। তারপর কি ভেবে মাদুরটা গুটিয়ে ফেলল অন্ধকারে আন্দাজেই। খাটিয়ায় উপর গিয়ে বসল। অন্ধকারে কল্পনার চোখে মাদুরটার পানে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। গা ঘিন ঘিন করছে তার। একটুখানি অনায়াস নিদ্রার লোভে সে খাটিয়ায় শোয় নি। নতুন ঘরের এক্তিয়ার-ভুক্ত খাটিয়া। হোক এ শয্যায় সহস্র কণ্টক বিছানো। চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লো সে। আরো সজোরে দুহাতে আঁকড়ে ধরল খাটিয়ার ছোবড়ার দড়ির দোলনার দুটো ধার। কটমট করে অন্ধকারের মধ্যে মাদুরটাকে বিদ্ধ করে রইল তার দৃষ্টি। দোলনাটা কেঁপে উঠল।

॥ চোদ্দ ॥

শংকর এখন ঠাণ্ডারামের বস্তির নিয়মিত বাসিন্দা। এরই মধ্যে বামুনদি একদিন এসে একটা চুলো তৈরি করে দিয়ে গেলেন—শংকরের ছোট্ট ঘরের ছোট্ট কোণে। নিজের মনে মনেই বকর বকর করতে লাগলেন বটে কিন্তু শোনানোর দিকে লক্ষ্য অব্যাহত।—আমার তো ভারী দায়।······

বাইরে ছোট্ট চাতালের উপর রামলক্ষ্মণদের গ্রুপের আসর তখন জমজমাট। কে একজন জিজ্ঞাসা করল বামুনদিকে—কিগো বামুনদি, কিছু বলছো নাকি গো।

—না তাই বলছি—আমার তো ভারী দায়। শুধু ঠাণ্ডারামের খাতিরে—নইলে······

উত্তর শুনবায় আগ্রহ বিশেষ দেখা গেল না প্রশ্নকারীর তরফ থেকে।

শংকর ক্লান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে ভাঙা ড্রেনটির ওপর। সন্ধ্যা হবো হবো করে এতক্ষণে প্রায় জেঁকে উঠল। মুড়ি মুড়কি কেনার পুঁজি এতদিনে নিঃশেষ হবো হবো করে আজ প্রায় নিঃশেষই হলো।

বামুনদি বেরুলেন! হাতের কনুই অবধি কাদা। শংকর তাকাল। নতুন পরিবেশে এ ক'দিনেই বেশ সহজ হয়ে উঠেছে সে। মেলামেশায় মনের সেই প্রাচীন বাধাগুলো এখনও তেমন সুবিধা করতে পারছে না। অনেক কষ্টে কাটছে। কিন্তু

অনেক মানসিক আরামে তো আছে সে। তাই বাক্যবিন্যাসেও অযথা 'মানে' আর 'ইয়ে'র প্রলেপ আসছে কমে।

বামুনদির উদ্দেশে খুব পরিষ্কার গলায় শুরু করল শংকর—চুলো তো তৈরি করলেন বামুনদি। তা ও চুলো আমার বিশেষ কাজে লাগবে না। মানে খানা পাকাবেই বা কে—মানে ইয়ে হোটেলেই খাব ঠিক করতে হল কিনা।

যেমন পরিষ্কারভাবে শুরু করেছিল শেষ পর্যন্ত কথায় সে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে পারল না তা সে নিজেই বুঝতে পারল। তাই হে হে করে একটু হাসল কথার শেষে। হোটেলে খাওয়া কিম্বা খানা পাকানো এই উভয়ের কিছুই সে সাব্যস্ত করে নি। অথচ অবাক হলো ভেবে—কি করে বেশ কয়েকদিন পর তার সাবলীল কথাবার্তার মাঝে এই প্রথম উঠল একটা অসাবলীলতার বিশ্রী তুফান। মনে মনে বিরক্ত হল। কিছু না বলতে গেলেই তো পারতো। খানা পাকানোর জন্য চুলো তৈরি করে দিয়ে বামুনদি কিছু তাকে বস্তির পাকাপাকি শরিক করে ফেলছিলেন না। আর হোটেলে খাবে জানিয়ে দিয়েও সে কিছু নোংরা বস্তির পাকাপাকি শরিক হয়ে যাবার ক্লেদ থেকে গা বাঁচাতে সফলকাম হয়ে গেলো তাও নয়। মনের কোণে কোথায় যেন একটা খিচ্ এখনও তার। নেহাৎ দায়ে পড়েই তো এ জীবন। আসলে সে তো ঠিক আর এদের মত নয়। নতুন পরিবেশে আবার নতুন শত্তুর জুটলো নাকি শংকরের।

—হোটেল? তার চেয়ে খানা পাকিয়ে খেও গো ভদ্দর লোকের ছেলে। তাতে অনেক সুবিধে গো, অনেক সুবিধে। —ফিক করে হাসলেন একটু বামুনদি।—আর খাবার বেলায় না হোক চুলোয় আগুন দেবার বেলায় ডেকো এই বামুনের মেয়েকে। বুঝলে—

একগাদা লটবহর নিয়ে ঠাণ্ডারাম ঘরে ঢুকে লটবহরটা নামাল। তারপর শংকরকে বলল—তোমার ঘরে জায়গা হবে গোসাঁই?

অনুমতির জন্য অবশ্য অপেক্ষা করতে দেখা গেল না বিশেষ। লটবহরটা সটান ঢুকিয়ে দিল শংকরের ঘরের মধ্যে।

সেদিকে তাকিয়ে বামুনদি একগাল হেসে ফেললেন। বললেন ঠাণ্ডাকে—তোদের সেই ছাইপাঁশগুলো তো! এই বের্তের এই কথা তা'লে। এই ভদ্দর লোকের ছেলের আঁস্তাকুড়েই উঠবে এখন থেকে। হুঁ।

পরক্ষণেই ভদ্দর লোকের ছেলেকে উদ্দেশ্য করলেন। —কাল বিকেলের আগে কিন্তু চুলোর মুখে নুড়ো জেলো না বাছা। শুকুতে একটু ফুরসৎ দিও।

চুলোর দিকে নজর পড়ল ঠাণ্ডার। সেও একগাল হাসল। বলল বামুনদির কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে—হু! তা'লে এই বের্তের এই কথা!

সঙ্গে সঙ্গে বামুনদি এমন একখানা মুখ ঝামটা মেরে স্থান ত্যাগ করলেন যে ঠাণ্ডা আর চুপ থাকতে পারল না। হো হো করে হেসে ফেটে পড়ল।

শংকর ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে লটবহরটার উপর মুখ গোজ করে বসে আছে।

হাসি থামতেই সেদিকে লক্ষ্য পড়ল ঠাণ্ডারামের। শংকরের এই যখন-তখন মুখ গোমড়া ভাব একদম তার ভাল লাগে না।

—কী হয়েছে তোমার গোসাঁই?

—কিছু না।

—বুঝলে এ তোমার কোন কাজের কথা নয়। জলদি করে একটু এখানকার ধরন-ধারন রপ্ত করে ফেল তো। কওয়া নেই বলা নেই মুখ গোমড়া আর গোমড়া। একী কথা! এখনও কি মায়ের দুধ খাও! পুরুষমানুষ আছ তো।

আবার সেই উপদেশের সুর ঠাণ্ডার গলায়। এ জিনিসটাকে আড়চোখে দেখে শংকর। কিন্তু জানতে দেয় না কখনই তা। তবু ঠাণ্ডার চেয়ে বড বান্ধবও তার নেই উপস্থিত। এমন অকৃত্রিম বন্ধু এই বিদেশ বিভুঁয়ে জোটা সেও কী কম নাকি। বোধ হয় ঠাণ্ডারাম ঠাণ্ডারামবাবু নয় বলেই এই অকপট আলিঙ্গনে জাপটে ধরতে ঠিক পেরে উঠছে না। তবু সে সবচাইতে যার উপর অধিক নির্ভর করে সেও তো এই ঠাণ্ডারামই।

একটা তথাকথিত মনের খিচ্ থেকেই সে ভেবেছিল ঠাণ্ডারামের কাছ থেকে অন্ততঃ এ ব্যাপারটা গোপন রাখবে। কিন্তু তার সামর্থ্য এত কম—যে গোপন শেষ পর্যন্ত রাখতে পারল না। একটা অসহায় ছেলেমানুষের ভঙ্গীতে বলে ফেলল—পকেটের শেষ পয়সা নিঃশেষ হলে ওরকম মুখ গোমড়া অনেকেরই হয়—হ্যাঁ।

ভাগ্যিস নিজের এই ভঙ্গী নিজে দেখতে পেলো না শংকর।

কিন্তু দেখলো ঠাণ্ডা। আর হাসল।

—হয় নাকি? —ঈষৎ ব্যঙ্গসূচক একটা জিজ্ঞাসা এসে গেল তার মুখে। তারপর সেও মুখ গোমড়া করল ভারিক্কী চালে। একটি ভদ্দর লোকের ছেলের অসহায়তায় গুরুগম্ভীর দুটো উপদেশ দেওয়ায় সে যে একেবারেই তৃপ্তি পায় না এমন কথা হলপ করে বলা যায় না। তাইতো মাঝে মাঝে উপদেশের সুরে কথা

বলে মুখ গম্ভীর করে। আর তখনই কেবল মুশ্‌কিল লাগে শংকরের। এমনিতে ঠাণ্ডা লোক মন্দ নয়।

আজও বলল—তা হলে তো বাপু বিস্তর লোকের মুখ গোমড়া করে ঘুরে বেড়ানোর কথা। বিস্তর লোকেরই তো ট্যাক্ গড়ের মাঠ।

আজও মুশ্‌কিল লাগল শংকরের মনের অন্দরমহলে। মনের পুরানো বিকারগুলো এখানে আসার পর থেকে প্রায় বেকার। ঠাণ্ডার এই বিশেষ ধরনের উপদেশাত্মক কথা, তার চেয়েও বেশী তার ভঙ্গী—তাই মনের গভীরে নতুন বিকারের লক্ষণ আবার জাগাতে শুরু করলেই বা তা সে নিরস্ত করবে কি দিয়ে।

বিচিত্র শংকরের ঠুনকো মনের এই অপরিপক্ক আবেগ। তার রক্তের মর্যাদাবোধটা যে আসলে ভুয়া এ চেতনা এত আঘাতে আঘাতেও যেন নির্মূল হয় না। বলা বাহুল্য এ ধরনের মনোভাব উঁকিঝুকি মারার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঝেড়ে ফেলে দেয়। আবার স্বাভাবিক খাতে মনের প্রবাহকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। অন্ততঃ এটুকু অভিজ্ঞতা তার হয়েছে এতদিনে যে তা না করলে উপায় নেই। এখানকার অন্যেরা কিন্তু এরকমভাবে কখনই তার সঙ্গে কথা বলে না। একমাত্র ঠাণ্ডারাম। তাও কালে ভদ্রে। তাই মনের এধরনের ঝোঁক ওঠবার সুযোগও অবারিত নয়। তাই রক্ষা।

নতুন ওঠা আবেগটার সঙ্গে বেশ সজোরে সংগ্রাম করে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারপর বলে—বিস্তর লোকই মুখ গোমড়া করে ঘুড়ে বেড়ায় কিনা—মানে ইয়ে—তারাই জানে। —আটকে আটকে যেতে থাকে তার জবাব।

—আলবাৎ জানে। এটা তারা আলবাৎ জানে গোসাঁই যে ট্যাক গড়ের মাঠ হলেই পেট গড়ের মাঠের হাওয়া খেয়ে বাঁচবে না। তাই পেটের ধান্দায় পরের দিন মালকোঁচা গুটুতেই হয়।

বিমর্ষভাবে হাসল শংকর। তার বোধহয় মনে হল এখনও ঠাণ্ডারামের সেই সুর অব্যাহত। তাই চোখ কুঁচকে জবাব দিল—তা তো হয়ই। তারপর কি ভেবে হঠাৎ দৃঢ় হয়ে নিল। সমস্ত দুর্বলতা যেন আড়মোড়া আঙ্গার মত ভেঙ্গে ফেলে সহসা জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠল—আর আমি, আমিও তো গুটুচ্ছি।

ঠাণ্ডা থেমে গেল যেন ধাক্কা খেয়ে। কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। পুকুরের চারধারে আলোর ছায়াগুলো দশগুণ লম্বা হয়ে জলের মধ্যে আনছে বিচিত্র সমারোহ।

—ছ'বন্ধুতে দিল খোলসা করে কথার ফোয়ারা ওড়াচ্ছ যে ভায়ারা।—বৈরাগীর কণ্ঠ। ঘরে ঢুকে পড়লেন বৈরাগী।

ঠাণ্ডারাম হেসে ফেলল। বলল—হুঁ। তা ওড়াচ্ছি।

বৈরাগী আবার পিছনে ফিরে কাকে সম্বোধন করল সে কথায় মন না দিয়ে—আরে আসুন বাড়ীওয়ালা আসুন।

কপাল কুঞ্চিত হলো ঠাণ্ডারামের।

শংকর মাথা নাড়ল। বাড়ীওয়ালা ঘরে ঢুকল। ইসাক মিঞা। পরনে নীল চেকের লুঙ্গি। জমিনটা সাদা। পাড় নীল। গোঁফ কামানো। দাড়ি ছাঁটা। চুলের ছাঁটে অস্বাভাবিকত্ব বিশেষ নেই। নাকটা টিকলো। কিন্তু নাকের মাথাটা বিশ্রী ফোলা ফোলা। চোখে বন্যতার সঙ্গে এসে মিশেছে শৃগালের ধূর্ততা।

আসবো?—অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল ইসাক।

বৈরাগী উত্তর দিল—আপনারই তো বাড়ীঘর মিঞা সাহেব।

শংকরকে বলল ঠাণ্ডারাম—লটবহরটা দেখো গোসাঁই।—তারপর টুক করে কেটে পড়ল।

খাটিয়াটা কোঁচার খুঁটে ঝেড়ে পরিষ্কার করে দিল বৈরাগী। —বসুন বসুন মিঞা সাহেব।

পানের ছোপে ঝিঙ্গের বিচির মত দাঁতগুলো বার করে হাসল মিঞা সাহেব।

তারপর শংকরের দিকে লাল লাল গোল ছটো চোখের দৃষ্টি ফেলে বলল—এই বাবুলোকই তাহলে। আচ্ছা।

—হাঁ হাঁ এরই কথা বলছিলাম আপনাকে।

—আচ্ছা—তবে বলুন আমার সাথে। তুম্‌হি সব কুচ্ছু বলেছ বাবাজী খোল্‌সা করে।

—বলার যদি কিছু বাকী থাকে মিঞা সাহেব—আপনি নিজমুখে বলে নেবেন। মোট কথা এ র একটা কাজকর্ম নাহলে ইনিও আর টেকৃতে পারছেন না—আর আমাদের মত অকাজের গোসাঁইদেরও টেকৃতে দিচ্ছেন না। আমি এখন উঠতে বসতে এঁর কিল খাবার গোসাঁই হয়ে আছি—হো হো করে নির্লজ্জ হাসিতে ঘরমুখরিত করে তুললেন বাবাজী। আর শংকরও হাসল—অত্যন্ত সলজ্জ হাসি।

—আর তা না হলে আপনার ভাড়াই বা গুণবেন কেমন করে বলুন। আপনি তো আর মাগ্‌না থাকতে দেবেন না মিঞা সাহেব।

বাড়ীওয়ালা গম্ভীর মেজাজে বসে রইল খানিকটা। তারপর উঠে দাঁড়াল
—বেশ তাহলে উঠুন বাবুসাব। আপনার নামটা যেন…

—শংকর গোসাঁই।

—কিছু মনে করেন না। বড় ভুল হয়ে যায় আমার। বেশ তাহলে এইবার উঠে পড়ুন গোসাঁই বাবু রাত বেশী হবার আগে।

—আজই?—শংকর বিস্মিত হলো।

শংকরের বিস্ময়ে ইসাক বেশ মুরুব্বির মত সেয়ানা হাসি হাসল মুচকি মুচকি।

—হাঁ আজই। এখুনি। এসব কাজ কালের জন্য রাখতে নেই গোসাঁইবাবু।

—কখনও না। কাল করবো বলে রাবণ রাজার স্বর্গের সিঁড়ি—সেই কালেই তো খেলো। নইলে ভাবুন তো আজ আমাদের স্বর্গে উঠবার আবার ভাবনা। রাধে—বৈরাগীর মুনশীয়ানা ইসাকের চাইতেও নেহাৎ কম নয়।

ইসাক বলল—আমার একটু মুখের কথা খরচ কিন্তু আপনার উপকার। এতে দেরি করে কুচ্ছু নাফা আছে বলুন?

শংকর উঠে পড়ল। মিঞা বেরিয়ে পড়লেন আগে আগে।

রাস্তায় উঠে মিঞা সাহেবই প্রথম কথা কইলেন—কাজ আপনার হবে বাবু। জগমোহনবাবুও এক কথার মানুষ। আপনি তো ভদ্দর আদমী। নিশ্চয় বেকায়দায় পড়েছেন নেহাৎ। নইলে আপনিও জানেন ভদ্দর আদমীর একই বাৎ।

ইসাকের পরিচ্ছন্ন বাঙলা বুলির মধ্যে মধ্যে দু একটা দেহাতী বুলির খোঁচ শুনতে বেশ লাগে।

—কিস্তক আধাআধি। রোজ হিসাবেই তলব—কিস্তক পাবেন হপ্তায়। পয়লা মাসের পুরো চার হপ্তায় আধাআধিই অবশ্যি বেরিয়ে যাবে নোকরি দেনেওয়ালার নজরানা দিতে। কুচ্ছু অসুবিস্তা আপনার হবে। লেকিন একটা মাসের অসুবিস্তা। তবু আপনার নিজ মুখের একটা কথা—

মাইনের আবার বখরা। তাজ্জব ব্যাপার। তা অনেক কিছুই তো তাজ্জব লাগছে এখানে। রোজের নাম আবার মাইনে! হুঃ! তেলাপোকাও পাখী। সেই মাইনের আবার বখরা। হায়রে হায়।

তা হোক। নেহাৎ বেগতিকে পড়েছে আজ শংকর। তবু বৈরাগী বাবার চেষ্টাতেই তো এই রোজানা মাইনের চাকরির প্রস্তাব। বৈরাগীর প্রতি মনটা কৃতজ্ঞতায় কানায় কানায় উপচে উঠল তার।

লাণ্ডক তাজ্জব। তবু তো একটা চাকরি হবার প্রতিশ্রুতি। বহু আকাঙ্ক্ষিত জীবনে প্রথম একটা চাকরি হবার সম্ভাবনা। অসংখ্য বেকার যৌবনের অভিষেকের মাঙ্গলিক বেজে ওঠে যে চাকরিকে কেন্দ্র করে। শংকরের ভেতরটা সজল হয়ে উঠল। বাইরে তাই জবাব দিল হোঁচট খাওয়া ভাষায়—মানে, ইয়ে, আমার আর কী আপত্তি।

॥ পনেরো ॥

ইসাকের জগমোহনবাবুও কিছু সামান্য লোক নন। ইসাক তো তাঁর তুরুপের তাস মাত্র। শংকরের মত অমন দু'চার জন চাকরি প্রার্থীর আনাগোনা তাঁর দরজায় নিত্যকার ব্যাপার। বেকারদের চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে জগমোহনবাবুর মাথাও সাফ কম নয়।

এণ্ডারসনের ইঞ্জিনিয়ারিংএর স্বনামধন্য বড়বাবু। বাইরের জগতে জগমোহন নামে পরিচিত হলেও সাহেবরা চেনেন মোহনবাবু নামে। নামের সঙ্গে রূপের ঘোরতর বিরোধ। হাতে শুধু মুরলী নেই। আর মুখে নেই দাঁত। মাথা সত্যই সাফ। মাথার মাঝখানে প্রশস্ত তেলা টাক্‌কে ঘেরাও করে রেখেছে কিছু সংখ্যক রোঁয়া। তিরিশ বছরের চাকরি। ঢুকেছিলেন পঁচিশে এখন পান একশ পঁচিশ। চারখানা বাড়ী করেছেন কলকাতার আশপাশে। সাহেবদের অত্যন্ত বিশ্বাস-ভাজন। মিলিংম্যান থেকে পদোন্নতি করে এই পর্যন্ত। মাঝে মাঝে আসিস্ট্যাণ্টদের বলেন—অ্যাম্‌-এ, বি-আ, পাস কইরা তোমরা কি করলা?

দেশের ভাষায় কথা বলার প্রতি ভক্তি তিরিশ বছরেও রেখেছেন অটুট। ইংরেজী শব্দোচ্চারণে পর্যন্ত দেশের ভাষার টান গোপন করেন না! বরঞ্চ সগৌরবে উচ্চারণ করেন এবং তজ্জন্য গর্বে তাঁর বুক ভরে ওঠে। আজকালকার আধুনিক বাবুরা অনেকেই লজ্জায় দেশের ভাষা পরিত্যাগ করেছেন বলে তাঁদের কাপুরুষতার নিন্দা করেন।

প্রধান সহকারী দীপেশ লাহিড়ী আধুনিক চৌকস ছেলে। মুখ কাঁচুমাচু করে বলে —যেন কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না —কি করে যে আপনি এত বড়টি হলেন ভেবেই পাই না বড়বাবু।

ফোকলা গাল মধুর হাসিতে ভরে যায়। গালের ভাঁজে ভাঁজে চোখ কুৎ কুৎ

করে ওঠে। একটুখানি তুলে ধরতে পারলে বরাবর যেমন ঘটে, মোহনবাবু আত্মনামায় ডুবে যান। এইটুকুই মাত্র তাঁর সারা চরিত্রের দুর্বলতা।

তাই সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে বড়বাবু শুরু করেন—আমি অ্যাম-এও পাস করি নাই, বি-আও পাস করি নাই তোমাদের মত।—কি যে পাস করেছেন সেটা উল্লেখ করেন না।—কিন্তু সেই আমি হ্যাড্ ক্লার্ক আইজ। তাই বলি, কি করলা তোমরা বি-আ, অ্যাম্-এ পাস কইরা।

অন্য অন্য কেরানী ছোকরাদের হাত এইবার কাজ থেকে নিরস্ত হয়। সকলের চোখ বড়বাবুর দিকে। দীপেশ সকলের সামনে বসে থাকে সেই রকম হ্যাবা ক্যাবলার মুখভঙ্গীতে। কেরানী ছোকরারা জানে এই হচ্ছে সেই পরম মুহূর্ত যখন কাজ ফাঁকি না দিলেই বরং বড়বাবু মনে মনে রুষ্ট হন। এখন বড়বাবুর বাণী পরম গদগদ নেত্রে শ্রবণ করাই তাদের কাজ।

দীপেশ ততক্ষণে টুক করে ছোঁড়ে আবার একই কথা—তাই তো আমরা ভেবেই পাই না কী করে হলেন এতবড়।

একটা বোকা বোকা আত্মগৌরবে দীপ্ত হয়ে ওঠে মুখমণ্ডল। একটুখানি করুণার হাসি হেসে ভক্তবৃন্দের কৃতার্থ করার জন্যই যেন শুরু করেন অত্যন্ত অকৃত্রিম কণ্ঠে সেই চর্বিতচর্বণ—মিলিংম্যান থেকে তাঁর বড়বাবু হবার ইতিকথা।

—আছিলাম মিলিংম্যান। কাম করতাম মেশিনে।—তারপর আমরা তিনজন দিলাম ডিপাটম্যাণ্টাল অ্যাগ্জামিন।—দীপেশের ছদ্মমুখভাব তখন পড়া যায়। তার ভাষা হচ্ছে পরমপুরুষের জীবনী শ্রবণ করে পুণ্যবান যেন ভাববিভোর কণ্ঠে বলছে—আহা-হা মধু মধু। বড়বাবুর কণ্ঠস্বর এখন অব্যাহত, অকৃত্রিম, আত্মমগ্ন।—বড়সাহেব তখন ডার্লিং সাহেব। জিজ্ঞাসা করল—মোহন হট ইজ দি ভেলু অব দিছ প্যান্সিল্। তিনজনই জবাব দিলাম। কিন্তু পাস হইল একজন। আমি।—কথা শেষ করার সঙ্গে একটা গভীর আত্মতৃপ্তিতে যেন ভরে গেল সারা দেহমন!

দীপেশ প্রস্তুত ছিল—কি জবাব দিলেন বড়বাবু?—এবার কণ্ঠ আরও মিহি। পেছনের কয়েকজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট যে কত কষ্টে হাসি সম্বরণ করছে তা তারাই জানে।

বড়বাবু মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন—বল তো তোমরা কী জবাব দিলাম? এ্যাম-এ, বি-আ তো সব পাস করছ তোমরা।—তারপর পকেট থেকে কাঁচি দিয়ে

দুভাগ করে কাটা পাসিং শো সিগারেটের একটা খণ্ড বার করলেন। সেটিকে একটি সিগারেটের পাইপে গুঁজে—পাইপটি ফোকলা গালে চড়িয়ে দিয়ে দেশলাই জ্বালালেন। অগ্নিসংযোগ করার আগে দেশলাই কাঠিটি জ্বালিয়ে রেখে, মুখে পাইপ সুদ্ধই একবার তাড়া দিলেন—কৈ বল বল।—তারপর অগ্নিসংযোগ করে ভাল হয়ে ঠিক ঠাক করে বসে নিলেন। দীপেশ হয়ত উত্তর জানে কিন্তু চেপে গেল। উল্টে জিজ্ঞাসা করল মাথা চুলকে—তাই তো বড়বাবু—বড় কঠিন প্রশ্ন!

ফোকলা গালে আবার সেই মধুর হাসির উল্লাস। ভাবটা যেন জানতাম আমি কেউ তোমরা বলতে পারবে না। দীপেশের জবাব অবশ্যই প্রীত করল তাঁকে। আরও খানিকক্ষণ গড়িমসি করে শেষে সেই কঠিন প্রশ্নের কি কঠিন উত্তর দিয়ে তিনি ডিপার্টমেণ্ট্যাল পরীক্ষার তিনজনের মধ্যে একলাই উৎরেছিলেন—সে রহস্য ফাঁস করলেন।

ইতিমধ্যে দীপেশ আর একবার একেবারে ন্যাকা ছেলের মত শুধালো—কি বললেন, বড়বাবু?

—বললাম—বলবার আগে কিঞ্চিৎ গম্ভীর হয়ে নিলেন; —বললাম, বললাম কি জান—বললাম থাউজাণ্ড এ্যাণ্ড থাউজাণ্ড ক্লপিজ স্যার।—বলা শেষ হতেই চারিদিকে একবার দৃষ্টি ঘোরালেন তারপর বুড়ো বুক যুবার মত টান করে এমন করে বসলেন যেন জগৎ জয় করে এলেন তিনি। অল্প পরেই আবার দীপেশকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা বলতো দীপেশ, কেন বললাম?—অধরোষ্ঠে মুচকি হাস্য।

দীপেশ ও সহকারীরা আর একবার এমন ভাব দেখল যে বড়বাবুর সাফ মাথায় এই থাউজাণ্ড ক্লপিজের মর্মকথা কি করে এল—তা তারা মাথা খুঁড়লেও বলতে পারবে না।

অবশেষে একসময় বড়বাবু শেষ কৌতূহল সমাধা করে তরল হাসি হাসলেন—ক্যান্—থাউজাণ্ড ক্লপিজ তো কমই বলছি। এই পেন্সিল দিয়া আমি অর্কারদের লাখ লাখ টাকাই তো মায়না দেই।

জলের মত রহস্য সমাধান হয়ে গেল।

কিন্তু বড়বাবুর এই থাউজাণ্ড ক্লপিজের ক্লপই গোটা ক্লপ নয়। কারণ অসুখ করলে সাহেবরা তার বাড়ীতে আসেন। এবং বর্তমানে কারখানায় যে বিরোধ চলেছে তার মধ্যে অনেকখানি অংশ জুড়েই অবস্থান করেছেন তিনি।

সেখানেও তার মাথা অত্যন্ত সাফ।

ট্রাইব্যুনালের রায় হয়েছিল—কণ্ট্রাক্টের শ্রমিকরাও কারখানায় শ্রমিকদের অনেকগুলি অধিকার পাবে। যেমন অঙ্গহানিতে ক্ষতিপূরণ। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড। যদিও শ্রমিকদের দাবি ছিল পুরা কণ্ট্রাক্টরি প্রথারই অবসান।

এদিকে মোহনবাবু বেনামীতে কণ্ট্রাক্টরি শ্রমিকদের মালিক হয়ে বসে আছেন। মিঞা সাহেব শরীক। ট্রাইব্যুনালের রায়ও যে প্রতিপালিত হচ্ছে না—তার মূলে এঘটনার প্রভাব আছে বলে গুজবও আছে বাজারে।

কারখানায় শোরগোল উঠছে নতুন করে। তিরিশ বছরের সেবায় সাহেবদের যে বিশ্বাস আর দাক্ষিণ্য অর্জন করেছেন—তাতে জগমোহনবাবুর সাফ মাথায় অভিজ্ঞতাও যেমন বেড়েছে—তেমনি বেড়েছে সাহেবদের নির্ভরশীলতা মোহনবাবুর ব্যবস্থাপনার উপর।

শরীক মিঞাসাহেবের আদরও এচত্বরের কারখানাগুলিতে অসামান্য। তা বোঝা যায় শ্রমিক-মালিক বিরোধের সময়।

এহেন মিঞাসাহেবের আসর মারফৎ হালে জগমোহনবাবু সস্তায় শ্রমিক খাটানোর প্রথা চালু করার টোপ ফেলে রেখেছেন উঠতি বসাক ল্যাবরেটরিজে। কারবার বাড়ানোর দিকেও তাঁর লক্ষ্য সাবধানী। লোকে বলে মোহনবাবু আর মিঞাসাহেব দু'জনের মধ্যে আধাআধি বখরা না থাকলে মিঞাসাহেব এত পরিশ্রম করার পাত্র নয়।

গত বছরের ট্রাইব্যুনালের রায়কে কেন্দ্র করে কারখানায় নতুন করে যে শোর-গোল ওঠবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—জগমোহনবাবু তার মোকাবেলার প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করেছেন। এখন থেকেই সপ্তাহে সপ্তাহে নতুন নতুন লোক ভর্তি সুরু হয়েছে। হাতের লোক না হলেও এমন কায়দায় ভর্তি হচ্ছে যাতে হাতে থাকতে হবে সে লোককে। এইরকম লোক ভর্তি করেই কী কম পয়সা রোজগার করেছেন জীবনে তিনি। এর মধ্যে এমনও হয়েছে বহুবার—একদিকে মাইনের বখরার শর্তে লোক ভর্তি হয়েছে অন্যদিকে পরের মাসেই বিদেয় হয়ে গিয়েছে কোন না কোন কারণে।

এবার শোরগোল ওঠার ভয় দূর হওয়া মাত্র কত নতুন বখরা-শর্তে ভর্তি হওয়া লোক বিদেয় হয়ে যাবে কে জানে। সাফ মাথা জগমোহনের।

যে লোক যত বোকা তার মাইনের বখরার হার জগমোহন বাবু তত উচুতে

চড়ান। দর কষায় যারা ভয় পায় তাদেরই তিনি বোকা ধরে নেন। অবশ্য তাতে কাজ হয়।

আগে শ্রমিক ব্যবসা দিনকাল অনেক ভাল ছিল। আজকাল হৈহুজ্জুত বেড়ে গেছে সত্য কিন্তু নিজের প্রতি তার আস্থাও বেড়েছে ছাড়া কমে নি। মাঝে মাঝে অবশ্য দুঃখ করেন—বলেন যে আজকাল ভদ্রলেকের ছেলেরা অবধি এই রোজানা মাইনের কাজ বখরা শর্তে পর্যন্ত এমন ভাবে রাজী হচ্ছে যে তাঁর সত্যিই খারাপ লাগছে।

জগমোহনবাবুর যদি হয় সাফ মাথা—ইসাকের মাথা ঝুনো। এ লাইনে মিঞাসাহেব তাঁর যোগ্য ফিল্ড মার্শাল। বিরোধ যে দুজনে কখনও একেবারেই লাগে না এমন নয়। কিন্তু ইসাক জানে—ব্যবসায়ে বাড় বাড়ন্তের মূলকথা হল জগমোহনবাবুর বড়বাবু পদ! আর সাহেবরাও তাঁর হাতের লোক। কারণ কণ্ট্রাক্টরি ব্যবসা আসলে সাহেবদের স্বার্থকেই দ্বিগুণ করে আসছে। স্বদেশী লোক সামনে থাকার সার্থকতা সম্পর্কে সাহেব কোম্পানী বেশ ওয়াকিবহালই বলতে হয়। তাই সমঝে চলে।

সরাসরি কোম্পানী নিযুক্ত শ্রমিক এত সস্তায় খাটানোর হাঙ্গামা অধুনা বেড়েছে।—তাই একই কারখানায় দু'ধরনের প্রথায় কাজ চলে। এতে শ্রমিকদের মধ্যে সমঝোতার হয় অসুবিধা অথচ কাজও যে খারাপ হয় এমন নয়।

এরকম একজন জাঁদরেল মানুষের কাছে ভেট করিয়ে দিতে পারার ক্ষমতা ক'জন রাখে? মিঞাসাহেবের পেছন পেছন শংকর গেলো ভেট করতে। আর তারই ঘরে বসে রইল বৈরাগী বাবা একলা আর চিন্তা করতে লাগল দাড়িতে হাত বুলুতে বুলুতে গভীর পরিতৃপ্তিতে। শুধু মাত্র ছেদো বৈরাগীই সে নয়। দু'চারজন বেকার লোককে কাজ করে দেবার হাতযশও তার আছে।

ওদিকে জগমোহনের মোহনরূপ দর্শনান্তে শংকর একসময়ে বেরিয়ে এল একলা। কাজের পাকা ব্যবস্থাপত্র পকেটে। মনটা প্রফুল্ল। অবশ্য কাল খাবার পয়সার সমস্যা আছে। তবু গোমড়া ভাব কেটে গেছে। প্রথমটা কেমন ভয় ভয় করছিল অনভ্যাসতাবশতঃ—জগমোহনের জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হয়ে কিন্তু সে বেশ সপ্রতিভ ব্যবহারই করেছে। বিভিন্ন পরিস্থিতির সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ইতিমধ্যেই বোঝা যাচ্ছে অনেকখানিই প্রসারিত হয়েছে শংকরের।

একটা কাজ। এখনও হয় নি। পাকা চিরকুট আর কাজে তফাৎ তো সামান্যই। আজকের এই ছোট্ট, চিরকুট আগামী সোমবার একটা কাজে

পরিণত হবে। কী অসামান্য শক্তিধর চিরকুট। মাঝে মাত্র দু'তিনটা দিন। কাজ হবার অব্যবহিত পূর্বে কাজ হবার চিন্তা সত্যিকারের কাজের চেয়েও রসালো। শংকরের মাথায় তাই নানারকম উদ্ভট সৃষ্টিশীল চিন্তার উদ্ভব হতে শুরু করল।

যে-কোন উপায়ে হোক কিছু এককালীন ধার। তার পর কিছু চাল ডাল কিনে রান্নার একটা ছোটখাট আয়োজন। আর সামান্য কিছু কিছু জিনিস। যেমন একটা গামছা। একটা বিছানায় চাদর। বালিশের চিন্তা এখনও অসম্ভব। বামুনদির সামনে হোটেলে খাওয়ার প্রতিশ্রুতি কোথায় চাপা পড়ে আছে তার মনে কে জানে। কিন্তু ধার দেবে কে তাকে? আচ্ছা, কাজ যদি না হয়! না না, চিরকুট তো তার হাতে।

হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল। অন্ধকার গলিতে এরই মধ্যে এসে পড়েছে দেখা যাচ্ছে। যাওয়ার চেয়ে আসার সময় পথ অতিক্রম করেছে যেন অনেক দ্রুত। গলির উপর সদ্য-ঢালা একরাশ ঘেঁষের স্তূপ। অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে তারই মধ্যে থেকে কয়লা বাছতে ব্যস্ত একরাশ ছোট ছোট বস্তির ছেলেমেয়ে।

দরিদ্র অভিভাবকদের খরচ বাঁচানোয় সাহায্য করার মধ্যে দিয়ে উপার্জনের প্রথম পাঠ গ্রহণ চলছে বস্তিজীবী শিশুদের।

এখানে শৈশব থেকে বেড়ে ওঠা জীবন শংকরের নয়। তাই এখনও স্বাভাবিক লাগে না চোখে এইসব।

একটা হারিকেন হাতে শংকরের ঘরে ঢুকলে ঠাণ্ডারাম।

—অন্ধকারের মধ্যে বাবাজী যে?

—রাধে—নড়ে চড়ে বসল বাবাজী। তারপর বলল আবার—হাওয়া খাচ্ছি। —ঠায় বসে বসে ভাবার চেয়ে কথাবলার সঙ্গী পেয়ে বাবাজী হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

—দক্ষিণে দরজা আর সামনে পুকুর থাকলে কি রকম হাওয়া খাওয়া যায় পেটভরে, বল দিকিন্ মাইরি।—আড় চোখে তাকাল ঠাণ্ডা। লটবহরের উপর চেপে বসল। তারপর বলল বৈরাগীকে—বাইরের খোলা হাওয়া খাওনি কিনা তাই বলচো! চিতপাত না হয়ে সে হাওয়া খাওয়াই যায় না এমন তোড়। একটু বসেচো তো মারবে আড়। খাঁটি দ'খনে হাওয়া।—বাড়ীওয়ালার সঙ্গে বৈরাগীর খাতির একটু বাঁকা করেই দেখেছে সে। তাই হটিয়ে দেবার উদ্দেশ্য বুড়োটাকে।

বুড়ো লাফিয়ে উঠল খাটিয়া থেকে।

—যা বলেছো। বয়স পড়ন্ত হলে বুদ্ধিও কেমন পড়ন্ত হয়ে যায়। চট করে খোলে না। হায়রে বয়সের কাল!—বয়সের কালের জন্য কিঞ্চিৎ অনুশোচনা করেন বৈরাগী।

—চোখের মত মাথায়ও চাল্‌সে ধরে বোধহয়—রসিকতা করল ঠাণ্ডারাম।

বাহিরে চলে গেল বৈরাগী। বেশী দূরে নয়। ঐ ঘরের ঠিক নীচেই। ভাঙ্গা ড্রেনের বাঁধানো শানের উপর। তার প্রিয় জায়গায়।

ঘর ফাঁকা হতে লটবহর খুলল ঠাণ্ডারাম। একগাদা ইস্তাহার। বাংলা উর্দু হিন্দী। খানিকক্ষণ যাবৎ থাকে থাকে সাজালো সেগুলো। শংকর ঘরটা ভাড়া নেওয়ায় সুবিধাই হয়েছে বলতে হবে। সন্ধ্যেবেলা মাঝে মাঝে এই ঘরে বসেই কিছু কিছু কাজকর্ম করা যাবে। কিছু কিছু লোক আসার কথা। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে লক্ষ্য রাখে সেদিকে।

কে একজন এল। পায়ের ঘষড়ানিতে মুখ তুলল। মাথা হেঁট করে ছোট ছোট ভাগে রাখছিল বিজ্ঞাপনগুলো।

—কে, মোহিনী সিং!

বামুনদি ঢুকলেন। মুখ ব্যাজার করে শুনিয়ে দিলেন।

—বামুনদি আবার মোহিনী হল কবে থেকে রে ড্যাক্‌রা।

—অ বামুনদি—কোল আঁধার কাটতে ঠাওর হল চোখে।

—দুত্তোরিকা! একখানা লোক হয়েছে আমাদের মোহিনী সিং। ধারে ইস্তাহার যদি বা এলো, লোকজনের পাত্তা নেই। প্রিসিডেন হয়েছেন না আমার ইয়ে হয়েছেন। জ্বালিয়ে মারলো লোকটা।

—জ্বালাচ্ছিস কী তুইই কম? বৌকে কী বলে এয়েছিস?

—কী আবার বলবো। দুশোও নয় পাঁচশোও নয় মোটে তো পাঁচ। আজ নেবো। পরশু মিটিন্‌। সেই তরশু তোমার ধার শোধ। এ একরকম নগদ ধারই বলতো পারো তুমি।

—তা আমি পাবো কোথায়। সিঁদকাঠি নিয়ে কি বেরুবো তোর জন্যে।—

হে হে করে হেসে পড়ল ঠাণ্ডারাম—কেনে, জগৎ ঠাকুরের পকেট থেকে হাত সাফাই! ইস্‌ বড্ড সতী হয়ে গিয়েছে দেখছি আমাদের বামুনদি।

—তা বকলেম না বলে নিজ মুখে বললেই তো পারতিস্‌।

—গোঁসা করেছো নাকি সেইজন্যে বামুনদি?

—ইস্ বামুনদি। সাতজন্মের বামুনদি পেয়েছিস্।

বামুনের মেয়ে চলে গেলেন লম্বা লম্বা পা ফেলে।

মাথায় এককাড়ি দায়িত্ব এসে পড়েছে ঠাণ্ডারামের। সবাই ভরসা দেয় তাই তো দায়িত্ব নেওয়া। সবাই না এলে তারও দায়িত্ব নেই। হাঁ সোজা কথা। অথচ পাওনাদার চেনে তাকে, সবাইকে নয়। সাথীদের এখনও পাত্তা নেই। রাগ হতে লাগলো তার। এখনও পর্যন্ত চাঁদা যা উঠেছে তার সঙ্গে কমসেকম পাঁচটি টাকা ধার না করলে ইস্তাহারের টাকাই দেওয়া হয় না। ফুঃ। মাঝে মাত্র একটা দিন। কালই কারখানার মধ্যে বাঁটতে না পারলে পরশু দিনে মিটিন্ হবে না ঢ্যাঁড়স। ট্রাইব্যুনাল বসার আগের সে জোশ যেন মজুরদের মধ্যে নেই। টুক টুক করে লোক বাড়ছে কন্ট্রাক্টরের আয়, মজুরদের সে জোশও যেন মারছে ঝিম। ক্রমান্বয়ে টালাবাহানা করছে কোম্পানী। দেরি করচে রায় চালু করতে। গহরমেণ্টের রায় তাও যেন হয়ে যাচ্ছে লড়বড়ে—কোম্পানীর হাতে। মজুরদের একাই ও তেমন জমছে না। কোম্পানীর লোক, আর কন্ট্রাক্টরের লোক —এ ফারাক যেন বেড়েই যাচ্ছে। বাড়বে না! গহরমেণ্টের রায়ের ইজ্জত দিতে যতো টালবাহনা করার সাহস হবে কোম্পানীর—ততই কোম্পানীর ক্ষমতাকে ভয় করা বাড়বে। ইউনিয়নের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস হবে ঢিলে। ফারাক ভাব আরও বাড়বে। ফাঁকে ফাঁকে সাত পাঁচ নানা চিন্তা ঠাণ্ডারামের।

সংগ্রাম কমিটির চার পাঁচজন শ্রমিক এলো। ঠাণ্ডারাম তেড়ে উঠলো।

—কথার ইজ্জত নেই। সংগ্রাম কমিটির সব মেম্বর। পিরসিডেন সাহেব কোথায় ?

—পিরসিডেন সাহেবই জানে—আমাদের পুছচ কেনে। —একজন জবাব করলো।

বুদ্ধু উপস্থিত ছিল। চড়া গলায় কড়া কথা ছাড়া সে যেন বলতে শেখেনি।

—মালে টয়টম্বুর আছে নাকি দেখে লিও। শালা সিংকে মালে ছাড়বে নি। ঔর আমাদের ভি উ পয়মাল করবে।

—মাল না ভুত ? আজ কী হপ্তার দিন ?—ঠাণ্ডা কথা বলতে বলতে উপস্থিতদের মধ্যে ইস্তাহার বাঁটতে শুরু করে দিলে।

—ওই তো বিশওয়াস হল নি তো! বুদ্ধুকে কেন বিশওয়াস হবে। হঁ। ঔর ঘরে গিয়ে দেখে লিবে—জরুকে যদি পিটবে, জানবে আলবৎ মালে পেয়েছে। মাল্ ভুত হয়ে তখন উরই ঘাড়ে চেপেছে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে ওর হাতে একতাড়া ইস্তাহার দিল ঠাণ্ডা। বলল—হুজ্জুত না করে সকাল সকাল সরে পড়ো। তোমার নিজের বস্তি আজ রাত্তিরেই সেরে রেখো। কালকার অপেক্ষা থেকো না। কিছু রেখো কাল কারখানার না-পানেওয়ালাদের জন্যে। আর একটাও যদি পড়ে থাকে—তোমার মুখের তুবড়ি বাজীর মাথায় ডাণ্ডাবাজি করে ছাড়বো, হ্যাঁ।

সাথীদের সঙ্গে সাথীদের এ ধরনের চোখ রাঙ্গানো ওদের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত। তাই উষ্মার সৃষ্টি করে না।

—কে করবে ডাণ্ডাবাজি। ঠাণ্ডারাম! ফুঃ—ডান হাতের তর্জনী ঠাণ্ডার মুখের উপর তুলল তারপর বিচিত্র ভঙ্গীতে হাসল হো হো করে বুদ্ধু। স্বল্পালোকেও দাঁতের ধাতুর চিক্ চিক্ করে জ্বলে-ওঠা দৃষ্টি এড়ায় না। অনেকের মধ্যে বুদ্ধুর এই একটা বিশেষত্বই আছে যার জন্য ওকে ভোলা যায় না।

তারপর চলে গেল সব এক এক করে। আবার ঠাণ্ডারাম একা। মোহিনী সিং না এলে মুশ্‌কিলই হবে। নেশাভাঙ্গের অভ্যাস তার বহু পুরাতন। কিন্তু কারখানার মধ্যে সে একাই পাঁচটা ডিপার্ট। মজুরদের মাঝখানে মোহিনী সিং সিংহ না হলেও বাঘ তো বটে। জগমোহন বাবুর মত শকুনি বুড়োটা পর্যন্ত এক একদিন টিট হয়ে যায় বাঘের গর্জনে।

দরজার বাইরে দৃষ্টি যেতেই বৈরাগীকে চোখে পড়ে। বৈরাগী তখনও ঘরের বেড়ায় ঠেসান দিয়ে এন্তার হাওয়া খাচ্ছে। মিষ্টি ফুরফুরে দখিন হাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় বৈরাগী-ইসাক আতাত—সাথে শংকর। আজই সন্ধ্যা বেলা। জগমোহনের আসর যত বড়ই হোক—প্রধানতঃ লোহার খানার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইসাক মিঞার খপ্পর আরও কিঞ্চিৎ প্রসারিত। সে আবার তার বাড়ীওয়ালা। স্বাভাবিক সময় যাই হোক, এ অঞ্চলের কোন কারখানার হুজ্জুত উঠলে ইসাকের বাড়ীতে মোটর আসে, নতুন নতুন অপরিচিত লোকের মুখ দেখা যায়। ঠাণ্ডার তো এসব চোখে দেখা ঘটনা। সেই ইসাক-বৈরাগী বাবা যোগাযোগ। মনটা খুঁত খুঁত করে। অবশ্য বামুনদিরও ঘনিষ্ঠতা আছে বাড়ীওয়ালার সঙ্গে। কিন্তু সেটা অন্য জিনিস। আরও বিদ্‌কিচ্ছি লাগচে শংকরের যাওয়া। আড়কাঠি দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে বৈরাগী। বাবাজীকে তো খুব বিদ্‌কিচ্ছি লোক বলে তার ধারণা ছিল না। আচ্ছা শংকর গেল কোথায়? জগমোহনের ডেরায় নয় তো?

এতক্ষণে শংকর ড্রেনের সামনে পৌঁছল এসে।

—কি গো নতুন ভাড়াটে খবর কী—

উদ্‌গ্রীব হয়েই যেন বসে ছিল বাবাজী।

—খবর?—থমকে গেল শংকর।

—খবর ইয়ে মানে ভালো।—পকেট থেকে জগমোহনের ইস্যু করা গেটপাস বার করল অন্ধকারের মধ্যে।

—এই যে গেটপাস পেয়ে গেছি—সোমবার থেকে হবে কাজ।

—হবে?—তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বাবাজী। তারপর চোখের নিমেষে শংকরের সম্মুখে এসে তাকে উঁচু করে ধরল তুলে। পরক্ষণের আবার ধপ্ করে ছেড়ে দিল মাটিতে। বলল—ইস্ একেবারে তুলো।

হকচকিয়ে গেল শংকর। কাজ হবে তার আর মাথা খারাপ হবে নাকি বৈরাগী বাবাজীর।

—মরেছি কিন্তু পচিনি। পারি তোমাকে এখনও উঁচু করতে বুঝলে নতুন ভাড়াটে।

কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ঠাণ্ডা।

—কি ব্যাপার গোঁসাইয়ের।

বাবাজী জবাব দিল শংকরের পরিবর্তে।—নতুন ভাড়াটেই বটে। তবে এ গোঁসাই সে গোঁসাই নয়। সোমবার থেকে এ গোঁসাই কাজের গোঁসাই হচ্ছেন কিনা।

—কাজের গোঁসাই?—ঠিক অর্থটা তখনও হৃদয়ঙ্গম হয়নি ঠাণ্ডার।

—হ্যাঁ হ্যাঁ কাজ; কাজের গোঁসাই।

এতক্ষণে বোঝা গেল।—কাজ? কোথায়?

এবার সলজ্জ উত্তর দিল শংকর—আর কোথায়—জগমোহন বাবু না কে আছে না একজন সেই তোদের কারখানায়।

ঠাণ্ডারাম অত্যন্ত অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল।

—ইসাক মিঞার সঙ্গে তা হলে জগমোহনের ভেটে যাওয়া হয়েছিল।

বাবাজী খুশি হয়ে মাথা নাড়ল। কথার ঠেসটা লক্ষ্যে এল না সোজা লোকটার।

বলল—হাতযশ আমার কিন্তুক। যোগাযোগ তো আমারই।

—তা বাড়ীওয়ালার সঙ্গে এরকম মধুর যোগাযোগ আবার কতদিন থেকে বাবাজী?

—এই তো হালে—বাড়ীওয়ালা আমাদের জাতে মোছলমান হলে কী হবে তেরনাথের উপর ভক্তিছেদ্দা কিন্তু ভয়ানক একেবারে।

—তাই বল? যোগাযোগের রহস্য এতক্ষণে পরিষ্কার হলো ঠাণ্ডার।

এতক্ষণে বাবাজীর কণ্ঠে অভিমানের টান পাওয়া গেল—তা তুমি অমন ব্যাঁকা করে কথা বলো কেন বলদিকিন—ঠাণ্ডারাম দাদা। তোমার বড্ড খারাপ স্বভাব।

ঠাণ্ডারাম হেসে উঠল। বলল—ব্যাঁকা করে কথা বলি তা বুঁইতে পেরেছ। আমি ভাবলাম তোমার কানের ছ্যাঁদা একেবারে সো-জ্জা। কোথাও বাঁক নেই।

—তা তুমি যাই বল—বাবাজী সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না তেমন—নিয়ম করে ঢক ঢক করে এক সের দেড় পো দুধ যদি মারতে পেরেছো—তো দেখবে তেরনাথ বাবা কারও কোনদিন ভাল ছাড়া খারাপ করবে না। তার কথা হচ্ছে ঐ এক সের দেড় পো দুধ।

প্রসঙ্গটা এত অস্বাভাবিক যে দুজনের আলাপের মধ্যে শংকরের নীরব থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ঠাণ্ডা পুনরায় জিজ্ঞাসা করল—তা বাবাজী কী শুধু তেরনাথেরই সেবাদাস বাড়ীওয়ালার খরচায়? না তার অন্য গুলোরও ... ...

মুখের কথা কেড়েই নিয়েই বাবাজী বলে ওঠে—ইস—। আর মস্তবড় জিভ বার করে জিভ কাটে।—ছিঃ আমরা হচ্ছি যতই হোক বোষ্টম, ঠাণ্ডারাম দাদা।

॥ ষোল ॥

সব শুনে যতীন মিত্তির বলল—বুদ্ধির চাইতে হৃদয় তোমার খোলে আগে।

রঞ্জিত সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করল—তার অর্থ কী? বোকা?

ও অর্থটা একটু বাড়াবাড়ি। সেন্টিমেণ্টাল। তোমার কাছে হৃদয়বৃত্তির স্থানই বড়। অথচ হৃদয়বৃত্তির অনেকখানিই হল পিত্তস্থালীর মত। বেশী নিঃসরণ আর কম, দুটোই দেহের পক্ষে ক্ষতিকর।

রঞ্জিতের কথায় ও কাজে যে আত্মবিশ্বাসের ইস্পাত ছিল, তা বাইরের থেকে আর দশ জনের চোখে ইস্পাত তুল্য মনে হলেও—তার মধ্যে ছিল পা'ন। রঞ্জিত নিজেও সম্ভবতঃ সে হদিস রাখতো না। মধ্যবিত্ত যৌবনের আদর্শের রোমাঞ্চলাগা মনের ছাপ পড়তো বিচার বিবেচনায়। আর তার মধ্যেও তৈরী হতো নিজস্ব একটা যুক্তির ধারা। যুক্তির বুহনিতে ফাটল থাকত না। তাই উপর থেকে এ

জিনিস নিজের চোখকে ধাঁধাতো। আসলে ভিতরের ফাটলটা চাপা পড়ত যুক্তির ঠাসা বুনুনিতে। আর সে ভিত্তি ধরে টান না লাগলে যুক্তিধারাকে আল্‌গা করে সাধ্য কার! যতীন মিস্তিরেরও অনেকক্ষণ লাগল সে ভিত্তিমূলকে ঘা দিতে।

সে বিভিন্নভাবে এই কথাই বোঝাতে চাইল—সংসার যুদ্ধেও কৌশল বলে একটা জিনিস আছে। পথ চলতে ওটা অপরিহার্য।

ফলে রঞ্জিত চিন্তিত হয়ে উঠল। সংসারবিহীন মানুষের কাছ থেকে সংসার যুদ্ধের কৌশলের উপদেশে কি চিন্তিত হওয়ার একেবারে কিছুই নেই! বলল—বেশ বলো, তোমার কৌশলের কথাটাই শুনি।

যতীন মিস্তির গোঁফ পাকাল, চিন্তার ভান করল, তারপর কাত হয়ে ওর চোখের পানে তাকাল। কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সুরটাকে উদ্দেশ্য করে হাসল। তারপরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলল আর একটু খোলসা করে—দেখ ভাই, বিপ্লবাদর্শকে গ্রহণ করলেই যুবকদের বাড়ীর সঙ্গে সব সময়ে লাঠালাঠি করতে হবে এবং না করলে আদর্শ অসম্পূর্ণ থাকবে—এটা ঠিক কথা নয়। তা'তে নিজেরও লাভ হয় না, অনেক সময় বিপ্লবের কাজকেও ভারাক্রান্ত করা হয়।

—কি রকম?—সহজে রেহাই দেওয়ার পাত্র নয় রঞ্জিত।

—অভিভাবকেরা সব সময়েই ন্যায় করেন আমার বক্তব্য তা নয়। আবার সবই অন্যায় করেন এ কথার মধ্যেও ফাঁক আছে বলেই আমার ধারণা।

সন্তুষ্ট হলো না রঞ্জিত,—বোঝা গেল, পচা যুক্তি।—কাকা আমাকে বধ করার জন্য এ ধরনের বস্তাপচা মাল বহুদিন থেকেই আমদানি করছেন।—অসম্ভব উষ্মা তার কথায়।

—কিন্তু আমি তো আর তোমার কাকা নই।

—সেইজন্য পরম মনোযোগ সহকারে শুনছি আর মানে বুঝবার চেষ্টা করছি।

যতীন মনে মনে ভাবল বড় কড়া ঠাঁই। কাজেই পাল্টাতে হল ধরন। সোজাসুজি প্রস্তাবেই এসব ছেলের কাছে বেশী কাজ হয়। তাই সরাসরি বলল।

—বাড়ীর আশ্রয় আত্মরক্ষার জন্য এখনও তোমার ব্যবহার করা উচিত।

—একশবার, তা না হলে কী করে প্রমাণ হয় যে আমি একটি প্রকাণ্ড বুড়ো খোকা।—একটা ভঙ্গী করল রঞ্জিত।

যতীন মিস্তির প্রচণ্ড গম্ভীর হয়ে নিল। তারপর কাদা রাস্তায় যেমন পা

টিপে টিপে সাবধানে চলে, তেমনি ধীরে ধীরে বলল,—দেখ, হাসি বা ঠাট্টার কথা নয়। বিয়ের যৌতুক হিসাবে চাকরিটা যদি আগাম পাওয়া যায় অর্থাৎ এক্ষুনি, তাহলে আমাদের দিক থেকে লোভনীয় প্রস্তাব বলতে হবে।

এরপর আর তাজ্জব বনে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকল না রঞ্জিতের। যতীন মিত্তির বলে কী!

—কেরানী মহলে আমাদের লোকের একান্ত অভাব সে কথা তুমি জান। মালিকের অবস্থা সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য আমাদের হাতে আসে না। কারণ তথ্যের ভরসা এখনও পর্যন্ত সর্দারেরা। শ্রমিকপক্ষের কোন্ চালটা কিভাবে প্রতিক্রিয়া করছে মালিকদের ওপর, নতুন কি কায়দা তারা নিতে চলেছে,—বাস্তবিক পক্ষে এসব সঠিক ভাবে না জেনে অন্ধের মত আন্দোলন চালাতে হয় বলে আন্দোলনের দুর্বলতাও রয়ে যাচ্ছে অসংখ্য।

রঞ্জিতেব ছটফটানি হঠাৎ যেন জল হয়ে এলো এতক্ষণে। ভাবগম্ভীর ভঙ্গীতে কান খাড়া করে সে শুনতে লাগলো যতীন মিত্তিরকে, উত্তর দেবার চেষ্টা না করে।

—যখন রিপোর্ট পাওয়া গেল—অফুরন্ত কাজের অর্ডার ওদের হাতে, তখন হয়ত প্রকৃতপক্ষে কোন নতুন কাজই নেই। শ্রমিক পক্ষের সিদ্ধান্ত হ'ল এখুনি হচ্ছে চাপ দেবার প্রকৃষ্ট সময়। চাপ দেওয়া হ'ল। ফল হলো কিন্তু উল্টো। মালিক পক্ষ উল্টে হয়ত একেবারেই লক আউট ঘোষণা করারই সুযোগ পেয়ে মোচে তা দিতে লাগল। বুঝতেই পারছ এরকম অবস্থায় তোমার একটি কেরানীর কাজ পাওয়ার অর্থ শ্রমিকদের পক্ষে কী দারুণ গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার!

মুলতঃ শ্রমিকদের প্রতি একটা অগাধ সমবেদনা থেকেই রঞ্জিতের ভাবাদর্শের রং। রঙের মধ্যে হয়ত বাষ্পের আধিক্য আছে। হৃদয়াবেগ থেকে সঞ্চারিত এ বাষ্প ভাবাদর্শের পথের রংকে অনেক সময় ঘোলাটে করে দিলেও শ্রমিকদের প্রতি দরদ আর ভালবাসার মাঝে জ্ঞানতঃ কৃত্রিমতা আনতে সক্ষম হয় না।

তাই মহাসমস্যায় পড়ল সে এবার। মুখের রেখায় পরিস্ফুট হল চিন্তার দ্বন্দ্ব। যতীন বুঝল তা। শ্রমিক দরদের হৃদয়তাপ বিশিষ্ট ছাত্র বন্ধুর সংখ্যা তার নগণ্য নয়।

সীতার মা চা দিয়ে গেলেন।

—অন্ধকারেই বসে আছ—কিছু মনে ক'র না।—বাঁ হাতের হারিকেনটা রাখলেন।—সীতা তো নেই। তাই একলা মানুষ একটু দেরিই হয়ে গেল কেরোসিনের পাট শেষ করতে।

ওরা উভয়ে বিব্রত বোধ করে নড়ে চড়ে বসল। সীতার মা যেমন এসেছিলেন তেমনি অশোভন শান্ত ভাবে চলে গেলেন।

—সীতার আবার কী হলো। যতীন জিজ্ঞাসা করল।

—চাকরি পেয়েছে হাসপতোলে। আপাততঃ ছ মাসের ট্রেনিং।

—নার্সের কাজ বুঝি। তা বেশ—

—বেশ, বটে—জোর করে গলাটাকে কর্কশ করল রঞ্জিত—বাড়ীটা আজকাল কিন্তু বড় থম থম করে।

—খাঁ খাঁ করে না তো।—মুচকি হাসির আভায় ভরপুর হয়ে উঠল যতীনের ঠোঁট দুখানি।

ইঙ্গিতটা অবশ্য চট্ করে বুঝতে পারল না রঞ্জিত। বোঝার চেষ্টাও করল না। বলল—বঙ্কিম ছিল বাড়ীর সোমত্ত ছেলে। সে ধরা পড়ার পর থেকে কি যে একটা বিশ্রী শোকের ছায়া বাড়ীটাকে পেয়ে বসেছিল। সীতা চাকরিতে চলে যাওয়ায় সেটাই যেন সম্পূর্ণতা পেল।

যতক্ষণ কথা বলল, যতীন খুব মনোযোগ সহকারে ওর মুখের পানে চেয়ে রইল। যেন কি পড়তে চেষ্টা করল, তারপর বলল—গতবারের রেল হরতাল ফেঁসে যাওয়ার পর থেকে একটা কথা কিন্তু বার বার আমার মনে উঠছে।

সীতাদের প্রসঙ্গ হতে প্রসঙ্গান্তরে এত হঠাৎ যাবে যতীন রঞ্জিতের তা বুঝে উঠতে বেশ ঝাঁকুনিই লাগল মনে। তবু মানিয়ে নিয়ে বলল—হুঁ। তা কি কথা।

—কথাটা তত্ত্বকথার মতই লাগবে ওপর থেকে, কিন্তু ভুক্তভোগীরা জানে এর চেয়ে বাস্তব কথা মজুর পক্ষের তরফ থেকে বড় বেশী নেই।

রঞ্জিত উসখুস করে জিজ্ঞাসা করল,—ঐ তোমার মস্ত দোষ। আসল কথার চেয়ে ভূমিকা বড় করে ফেলা।

এবার যতীন হেসে ফেলল, বলল—বেশ আসল কথাতেই আসা যাক তাহলে। বলছিলাম বিরোধী পক্ষের সঠিক অবস্থা ও অবস্থান বেশ নির্ভরযোগ্যভাবে না বুঝে না জেনে অন্ধের মত আন্দাজে তার সঙ্গে ব্যবহার করা, কিম্বা মোকাবিলা করার আয়োজন, খুবই সেকেলে পদ্ধতি, বেজায় ভোঁতা। এতে শ্রমিক পক্ষের ঐক্য সম্বল করে জোরসে কোপ হয়ত মারা যায়, কিন্তু সে কোপে বেশীর ভাগ সময় হাত ব্যথা হয়। যেমন এগুারসনের মজুরপক্ষ এখনও করছে। আরও অনেক জেনে শুনে অনেক দায়িত্বপূর্ণভাবে, ধীরে সুস্থে, মেপে জুপে, শ্রমিক সংঘের

কাজ পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। অথচ ওদের ব্যবস্থাপনার মধ্যে আমাদের সূত্র, একটা যোগ না থাকলে তা সম্ভবই বা হচ্ছে কী করে। বেশীর ভাগই হয়ে যাচ্ছে ফাঁকা হুঙ্কার, বুঝলে রঞ্জিত।

ধান ভানতে শিবের গীতের মত এই বক্তৃতা—কিন্তু রঞ্জিতের কাছে মনে হল অত্যন্ত স্বাভাবিক। বোঝা গেল তার উসখুস যাচ্ছে বেড়ে—তা কী করা যায় এ অবস্থায় বল দিকিনি।—যেন হাতের কাছে সুযোগ একটা আছে অথচ সেটা ব্যবহার করার পথে অসহ্য বাধা, তাই অব্যবহার্য—এমনি একটা শোচনার অধৈর্য তার চোখেমুখে আর কণ্ঠস্বরে।

—কিছুই করা যায় না আপাততঃ—সহজ উদাস উত্তর যতীন মিত্তিরের। আবার পরমুহূর্তেই সুর পরিবর্তন করে একই বাক্যের মাঝখানে একটা 'কী' শব্দ আর শেষে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন আনল,—আচ্ছা—সত্যিই কী কিছু করা যায় না—রঞ্জিত?

—মানে, কী বলতে চাও তুমি? বিয়ে?—জ্বলে উঠল যেন রঞ্জিত।

—পাগল। আমি তোমার কাকা নই যে চট্ করে তোমার মনের বিপক্ষে এতবড় একটা মূল্য দিতে বলব।

—তবে —?

—তবে কী জান—আসল কথা নিষ্ঠা। সিনসিয়ারিটি। শ্রমিকজীবনের প্রতি ভালবাসা যদি অকৃত্রিম হয়—সব রকম প্যাঁচের মধ্যেও বার হবার কৌশল আপ্‌সেই মাথায় গজায়। তাইতো বলছিলাম তখন, হৃদয়াবেগই সব নয়, কৌশল বলেও একটা বস্তু আছে।

কি বলতে চায় যতীন মিত্তির? বিশেষ করে বুঝতে ঘেমে ওঠে বেচারী। যতীনের স্পষ্ট কথার যে স্পষ্ট অর্থ, যতীন কী আসলে তাইই বলতে চাইছে? অবাক!

হাতঘড়ির পানে তাকাল যতীন—আর থাকবার জো নেই!—সময় সংক্ষেপের ফলে এতক্ষণে কথার ঘোর প্যাঁচও সংক্ষেপ করে নিল যেন—চাকরিটা জপাতে পারলে কিন্তু ভারী ভাল হয়—বুঝলে।—উঠে দাঁড়াল সে।

রঞ্জিত গম্ভীর হয়ে উঠে দাঁড়াল বিদায় দেবার জন্য। খুব তীক্ষ্ণ করে যতীনের মুখের পানে চাইল। তারপর বলল—ভেবে দেখলাম প্রত্যেক যুবকই হৃদয়বৃত্তির উচ্ছ্বাসসম্পন্ন অর্থাৎ ভাবপ্রবণ।

হেসে উঠল যতীন মিত্তির হো হো করে—কিন্তু উচ্ছ্বাসই আসল নয়। আসল থাকে উচ্ছ্বাসের অনেক নীচে।

উচ্ছ্বাস একটা বিশেষ মুহূর্তের, আসল হচ্ছে সব সময়ের। একটি বিশেষ মুহূর্তের প্রয়োজনে যেমন উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন আছে, সব সময়ের প্রয়োজনে তেমনি উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনও যে অবশ্যম্ভাবী।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ প্রবেশ করল সীতা।—রঞ্জিতদা কেমন আছেন?

চমকে গেল রঞ্জিত।

—তুমি হঠাৎ—সীতার হঠাৎ আসার কথা নয়।

—উঃ খুব লোক হয়েছেন আপনারা। অন্য সব মেয়েদের নিজের লোক সব বিকেল বেলা দেখা করতে যাচ্ছে রোজ। আর আমার বাড়ী থেকে কেউ একজন আসে না। কি বিশ্রী লাগে বলুন তো। হাঁপিয়ে উঠেছি একেবারে এ'কদিনে।—এক নিঃশ্বাসে বলে গেল সীতা। একটা অভিমান ভীরু কণ্ঠ ধাক্কা খেতে খেতে ফিরে গেল তার গলায়।—ভাবতাম দু' একদিন আপনি অন্ততঃ যাবেন।—তারপর গলায় খাদ পরিবর্তন করল—তা দাঁড়িয়ে আছেন কেন দরজায়, বসুন।

যতীনকে সম্ভবতঃ ভালভাবে লক্ষ্য করেনি সে।

যতীন জিজ্ঞাসা করল—কেমন আছ সীতা?

মেজেয় রাখা হ্যারিকেনের আলোয় সকলের কোমর অবধি আলোকিত হচ্ছিল। উপরাংশ প্রায় কোল আঁধারে ঢাকা। সীতা হারিকেনটা উঁচু করে ধরল।—আরে, যতীনদা! উঃ কতদিন পরে দেখা বলুন তো।

যতীন উত্তরে একটুখানি হাসল শুধু। সীতা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

—এই সবে এলাম। ভেতর থেকে এক্ষুণি আসব। দেখবেন যাবেন না যেন।—ক্ষিপ্রপায়ে ভিতরে প্রবেশ করল সীতা।

সীতাকে বেশ স্মার্ট লাগছে। বাহির দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় পরিচিতি যত বাড়ে, ততই যেন মেয়েদের স্মার্ট দেখায়। মনে মনে চিন্তা করতে বেশ লাগল রঞ্জিতের। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত চিন্তাটাও যেন প্রস্তুতই ছিল। সেটা অকারণে ইতিমধ্যেই ব্যঙ্গ করতে লেগে গেল মূল ভাবটাকে—শুধু মেয়ে কেন, পুরুষদেরও তো বোকা বোকা দেখানোর কথা নয়। মনের মধ্যে এই রকম অকারণ ধস্তাধস্তি তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কার না ওঠে।

নিজের মনের ভিতরকার চিন্তাধারার ওঠানামায় এই গতিপথে লক্ষ্য রাখলে মাঝে মাঝে বেশ মজাই লাগে। হঠাৎ চিন্তার এই পরস্পর বিপরীতমুখী বিচিত্র আচরণের প্রতি রঞ্জিতের মন গেল আটকে আর লাগলও বেশ মজাদার।

ইঞ্জিনিয়ার হলে রঞ্জিত এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই বলত—আসলে মনের মধ্যে গোপন আছে এক বিরাট কারখানা। সেখানে সাজান আছে বিচিত্র সব যন্ত্রপাতি স্তরে স্তরে। একটা পাকা পোক্ত উৎপাদনের পূর্বে তাকে পার হতে হয় সেই সব বহুবিধ স্তর।—ঢালাই, ছাঁটাই, পালিশ, রং ইত্যাদি বিচিত্র যন্ত্রের নিপুণ কারিগরির মধ্যে দিয়েই শেষ পর্যন্ত উৎপন্ন হয়—সে কারখানাজাত একটি পণ্য। জন্মলাভ করে প্রকাশের যোগ্যতা প্রাপ্ত একটা পাকাপোক্তা চিন্তা। প্রকাশের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয় না, ওঠে আর মিলিয়ে যায়, রিজেক্ট হয়ে যায় এই রকম চিন্তার ভাগই তো এক একটা মানুষের জীবনে অধিক। সে কারখানায় সেইসব কাঁচামালের সম্পূর্ণ হিসাব প্রকাশ করতে গেলে, ধরে রাখতে গেলে তো মহাভারত হবার কথা। জিহ্বা মারফৎ সেগুলো প্রকাশ না পেলেও মুখে চোখে তারা কিছু কিছু ছাপ ফেলে বৈ কি। অতগুলো ছেনি হাতুড়ির আঘাতের আক্রমণ কি বিন্দুমাত্র দাগ না ফেলে পারে।

আত্মসচেতনভাবে বেশ উপভোগ করছিল মনের এই ভাবটা বেশ কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত। ভাষা মূক। কিন্তু মুখমণ্ডলে ছায়া ফেলছিল আভাস।

—কী ব্যাপার একেবারে চুপ হয়ে গেলে যে।

—কী বলব বল—

—বলার কিছুই নেই ?

—আমার অবশ্য নেই। কিন্তু সীতার তো আছে। একটু বোস।

কি ভেবে উঠে বসল যতীন।—বেশী দেরি কিন্তু করতে পারব না।

রঞ্জিতের মনে নতুন ভাবনা। সীতার অভিযোগ সত্যই স্পর্শ করছে তার মন। বাড়ীর বাইরে তো কখনও থাকতে হয়নি বেচারা মেয়েকে। মন খারাপ হবারই কথা। বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতা ছাড়া কেই বা আছে দেখা করতে যাওয়ায় মত আপনার লোক। সত্যিই তো। তারই উচিত ছিল নিজে গিয়ে একদিন দেখে আসা।

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। সীতা ভিতর থেকে এখনও আসেনি। যতীন মিত্তির খানিক উসখুস করে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল গলার স্বর নামিয়ে—আচ্ছা, সীতার প্রেমে পড়নি তো রঞ্জিত।

—আমি ? —চোখ কপালে তুলল বেচারা।

—হাঁ হাঁ তুমিই—

—অবাক—হঠাৎ একথা মনে হল কেন ?

—এমনিই—তারপর বাঁ হাতে আস্তে আস্তে গোঁফে সুড়সুড়ি দিতে দিতে নির্লিপ্ত উত্তর যতীনের।

—কি রকম—রঞ্জিতের কণ্ঠে উষ্ণতা। যতীন টের পেল।

—নইলে একালের রাজত্ব চাকরি সহ রাজকন্যায় এত অরুচি সমীচীন বোধ হয় না। আর তাছাড়া এমনিতে একটা চাকরি, একটা যা হোক সংসারিক দায়িত্ব—আদর্শের উড়ে চলা ভাবকাণ্ড থেকে, মাটিতে পা রেখে চলা কর্মকাণ্ডের রাজত্বে তোমাকে পৌঁছে দেবার খাতিরে—একেবারে অপ্রয়োজনীয়ও নয়। আর ওরকম অবস্থাপন্ন শ্বশুর পেছনে থাকলে, আমারই তো বিয়ে করে ফেলতে লোভ হয় হে। —সমস্তটাই একটা হাল্কা সুরে বলে গেল যতীন।

কথাগুলো শ্লেষ না স্বাভাবিক—তা বুঝবার মত বুদ্ধি রঞ্জিতের মগজে আছে বলেই তো তার ধারণা। তবু সে হেসে উঠল এর মধ্যেকার ইঙ্গিতকে ছোট করার জন্য। বলল, বেশ ভেক্‌ ছেড়ে তাহলে তাইই কর না। —তারপর খানিকটা থেমে নিল। আবার গজ গজ করে উঠল, —তবে হ্যাঁ প্রেমে পড়াটড়া আমার দ্বারা হবে না। কারণ প্রেমে পড়া অত্যন্ত সেকেলে ধরন। আমার চক্ষুশূল।

—তাই নাকি? —ঔৎসুক্য বাড়ল যতীনের।

—হাঁ তাই। প্রেমের ব্যাপারে যদি ঘটাঘটিই করতে হয় দাদা—প্রেম করব, প্রেমে পড়া—নৈব নৈব চ। কারণ প্রেম করার মধ্যে আছে একটা সচেতন ইচ্ছাকে কার্যকরী করার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী।

এবার দরাজ গলায় হেসে উঠতেই হলো যতীনকে। রঞ্জিত কিন্তু চুপ হয়ে গেল সে হাসির শব্দে। হাসি থামতে ধীর কণ্ঠে বললো যতীন মিস্তির —আশ্বস্ত হলেম ভাই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কখনই বিচ্যুত হবে না এই আশ্বাসে। —এবার ও সেই একই ভঙ্গীর কথা। শ্লেষ না শ্লেষ নয় বোঝা দুরূহ।

শেষ পর্যন্ত একসময় এই কথোপকথনের কর্দম থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে যতীন মিস্তির জানাল—যাই হোক তোমার চাকরি হওয়া সম্পর্কে তোমার কোন ব্যাক্তিগত প্রশ্ন না তুলেও বলতে পারি যে—আমাদের দিক থেকে আপততঃ বেশ লাভেরই। এখন কৌশল যদি একটা কিছু আবিষ্কার করতে পারো তোমার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে তারিফ করতেই হবে। কি বল।

—তুমি কী চললে নাকি? কিন্তু সীতা?

—সীতাকে আমার হয়ে বলো। —হাতঘড়ি দেখে নিল যতীন। —আমার না গেলেই নয়—ঠিক আটটায়। অনেক লোককে একসঙ্গে কথা দিয়েছি। তারা অপেক্ষাও করছে এতক্ষণ।'

যতীন মিত্তির বিদায় নেবার দিন থেকে বেশ ছটফট করেই কাটছে দিন। এতবড় বিচিত্র ও জটিল সমস্যায় পড়ে নি রঞ্জিত। বেরুনোর পথ খুঁজতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। কাকা বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। এক ঢিলে তিনি দুই পাখী মারতে চেয়েছেন। জগমোহন বাবুর সঙ্গে রঞ্জিতের কাকার ঘনিষ্ঠতা পেশা সূত্রে। ভদ্রলোক নাকি সম্পত্তি করেছেন প্রচুর। কিন্তু উত্তরাধিকারী বলতে বর্তমানে একটি মাত্র স্নেহধন্যা কন্যা সম্বল। তাই ভোগ দখলের উত্তরাধিকারের ব্যাপারটার ভবিষ্যৎও তাঁর লক্ষ্যের বহির্ভূত নয়। আর জগমোহনের এই কন্যা সম্বন্ধেই তিনি নোটিস দিয়ে রেখেছেন।

জগমোহন বাবুর এদিকে কঞ্জুস দুর্নাম আছে। ব্যয় সংকোচের জন্যই নাকি নগদের পরিবর্তে জামাইকে চাকরি দেবার প্রস্তাব। রঞ্জিতের কাকার আপত্তি তো নেই-ই বরঞ্চ সমর্থনই আছে। সাহেব ফার্মে চাকরি, তার বড়বাবু শ্বশুর।

রঞ্জিত কেন, কোন জামাইয়ের পক্ষেই এ অবস্থায় ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করা নাকি অবান্তর। রঞ্জিতের পড়াশুনার বিষয়ও এই সঙ্গে তিনি মনে মনে ছকে রেখেছেন। আজকাল দিনে চাকরি, সন্ধ্যায় কলেজে পড়াশুনা করার নজীরের কিন্তু অভাব নেই,—ছেলের পড়ার মন যদি থাকে।

পাত্রী দেখতে যাওয়ায় দিন যত ঘনিয়ে আসছে—রঞ্জিতের মুশ্‌কিলও বাড়ছে তত। যতীন মিত্তিরের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে তবু সে একটা নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে এসেছিল। যতীন এসে নানা দিক থেকে সবই খানিকটা উল্টে পাল্টে দিয়ে গেছে।

সহজাত সৎ ছেলে রঞ্জিত। বিবেক আর কর্মের বিরোধ মনে তাই সৃষ্টি করে অসাধু অনুভূতির দাহ। বিবেক যাকে ন্যায্য বলে সম্মতি দেয় না—তার সঙ্গে হাজার সাময়িক হলেও আপস করার চিন্তা এখনও দুঃসহ লাগে। কিন্তু অন্তরে আছে মধ্যবিত্ত ধ্যানধারণায় রাঙানো মতাদর্শের নতুন

পাঠ আর চোখে ভাবাবেশ। সব আদর্শের অন্তর্দেশেই তো নিহিত আছে রংচটা গেরুয়ার বৈরাগ্য। আর আদর্শের মন্দিরে তো ত্যাগ ছাড়া বলি নেই। সকল মতাদর্শেই সচেতন ত্যাগ হচ্ছে অপরিহার্য অঙ্গ। যতীন মিস্ত্রিরের ইঙ্গিতে সেই ত্যাগের সুড়সুড়িটাও যেন মনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছে কখন থেকে। ফলে এক উভয় সংকটের আবর্তে পথ ঘুলিয়ে যাচ্ছে বারংবার।

কাকার প্রস্তাব তার বিবেকের দরবারে সরাসরি অগ্রাহ্য। আর আদর্শের নতুন পাঠে আজও পর্যন্ত কোনরূপ সচেতন ত্যাগের অধ্যায় সংযোজিত না হওয়ায় আছে অপূর্ণতার অতৃপ্তিজনিত অনুভূতি। যতীন মিস্ত্রিরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যেন সেই ত্যাগের একটা গন্ধ উঠছে ঘটনার মধ্যে। অবশ্য পুরোটার মধ্যে নয়—আংশিকের মধ্যে। এগুারসনে চাকরিলাভের অংশটুকুর মধ্যে। কিন্তু কি মূল্যে? বিবেকের বিরুদ্ধে কাকার প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের মূল্যে। আদর্শের জন্য বিবেক ত্যাগ। তার ছোট্ট জীবনে জীবনাদর্শের পাতা সামান্য দিনের। মহান ত্যাগের রক্তে এখনও পুষ্ট হবার সুযোগ পায় নি সে জীবনাদর্শের লোলজিহ্বা। ত্যাগ আদর্শের রুচিকে দেয় পরিতৃপ্তি। মানুষকে করে পূর্ণ, মহান। কিন্তু সে ত্যাগের খুশবাই উড়ছে —সে ত্যাগ তাকে অসাধু করে দেবে না তো?

পরিশ্রান্ত হয়ে ওঠে রঞ্জিত সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে। আজ ক'দিন সীতার হাসপাতালে সে যাচ্ছে প্রত্যহ বিকেল বেলা। কোনদিন সীতার মা খাবার করে দেন তার মারফৎ। সীতা আর তার বাড়ীর দৈনিক যোগসূত্র হয়ে বসেছে রঞ্জিত। শুধু বাড়ীই নয়। আর একজনও আছেন। মণিমা। —সীতার জন্য তাঁর ব্যস্ততা, আর উদ্বেগ দূর করার ভগ্নদূতের ভূমিকাও রঞ্জিতের। সপ্তাহে মাত্র একদিন ছুটি পায় সীতা। সেদিন বাড়ী আসে।

এটাও একটা উপরি ভাবনা এবং কাজ। যত সহজভাবে সে সীতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চেয়েছে—ক্রমশঃ সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে—সে সহজ ও স্বাভাবিকতা সংকুচিত হয়ে আসছে। সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে কোথায় যেন একটা দুর্নিবার শক্তি তার স্বাভাবিকতার পথে প্রাণপণ বাধা সৃষ্টি করছে। যতীন মিস্ত্রিরের ভূমিকাও সেখানে আছে তা রঞ্জিত বোঝে। সেও অত সহজে দমবার ছেলে নয়। অবস্থার দাস হয়ে নির্বিবাদে জীবন কাটাবে এ কথা সে আজও ভাবতে পারে না।

অনেক কসরৎ করে, নতুনভাবে নিজেকে উপস্থিত করার মত তৈরি করে নিল—মা-কাকীমার সামনে। পাত্রী দেখতে যাওয়ায় নির্ধারিত তারিখের ঠিক আগের দিন। অত্যন্ত ভালো ছেলেতে রূপান্তরিত হলো অকস্মাৎ। কাকার চাইতে কাকীমার কাছে যাওয়াই অধিক সঙ্গত মনে হলো! বাড়ীর সঙ্গে হালে প্রয়োজন ছাড়া সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল নিতান্ত সামান্য। তাই হঠাৎ রঞ্জিতের উপস্থিতিতে—কাকীমা রান্নাঘরের কাজ করতে করতে প্রমাদ গণলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কী ব্যাপার, মেঘ না চাইতেই জল?

রঞ্জিত বেশ মিষ্টি করে হাসলো। বলল অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গীতে—কেন, ঘরের ছেলে ঘরে আসতে নেই নাকি কাকীমা? আবার মিষ্টি হাসি। আজ কথাবার্তা চলনবলন সব কিছুতেই একটা সতর্ক প্রচেষ্টা তার। পূর্ব পরিকল্পিত তার অন্তকার কর্মসূচী।

কাকীমা কপালে চোখ তুলে ডাকলেন—হাঁরে রঞ্জিত—এমন একান্ত বাধ্য ছেলের মত নেকিয়ে কথা বলছিস কেন রে? ছেলের মুখে মেয়েলী গলা পেলে আমার যে পিত্তি জলে যায়।

এরকম অস্বাভাবিক করে নিজেকে প্রকাশ করা—রঞ্জিতের নিজের কাছেই কটু ঠেকছিল। কিন্তু মন ঠিক করে ফেলেছে সে। প্রকাশ্যে কাকীমাকে জানালো—মন ঠিক করে ফেলেছি আমি। কাল গিয়ে তোমরা পাত্রী দেখে আসতে পারো। আমার দেখা প্রয়োজন নেই।

থমকে একান্তভাবে কান খাড়া করে শুনলেন কাকীমা—তারপর গম্ভীর মেজাজে কইলেন—হুঁ তারপর।

—কিন্তু শর্তই বল আর অনুরোধই বল—আমার একটু কথা আছে। বিয়েটা পরীক্ষার পর। চাকরিটা আগাম—এক্ষুনি। কাকাকে বুঝিয়ে রাজী করানোর ভার তোমার।—আরও পরিষ্কার করে বলবার মন নিয়েই এসেছিল। কিন্তু এইটুকু বলতেই বিবর্ণ হয়ে উঠতে হলো। হাসল একটু বিবর্ণ হাসি।

কাকীমা আবার চোখ কপালে তুললেন—ওমা, একালের ছেলে হয়ে নেহাৎ সামান্য একটা চাকরির জন্য বিয়ে করবি। একবার নিজের চোখে মেয়ে দেখবি না পর্যন্ত?

—তাহলে তো মেয়ের জন্য বিয়ে করতে হয়। আর জান তো একালের শাস্ত্রমতে মেয়ের জন্য বিয়ে করতে হলে কমপক্ষে ছ'মাস আগে সে মেয়ের

সঙ্গে পরিচয় করতে, তাকে জানতে হয়। শুধু চোখে দেখলেই কী হলো নাকি? আমি বিয়ে করছি চাকরির জন্য।

মায়ের কানেও বোধহয় দূর থেকে ছেলের কিছু কিছু ভাষণ পৌঁছচ্ছিল। আর তিনি উৎফুল্ল হচ্ছিলেন। রঞ্জিত পালানোর জন্য উসখুস করছিল।

কাকীমা চিন্তিত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন। পেছন থেকে ডাকলেন রঞ্জিতকে। বললেন—হ্যাঁরে রঞ্জিত—এবার যে সত্যিই বুঝতে পারছি না তোকে।

সে হাসল একথায় একটু বিবর্ণ হাসি। হেসে বললে—আগে কাকাকে তো রাজী করো। তারপর বসে বসে ঢের সময় পাবে বোঝবার।—তারপর চলে গেল।

মা বললেন ছোট জাকে,—কেন বাপু, না বোঝার কী আছে। ভগবান বিধবার পানে মুখতুলে চেয়েছেন; সুমতি দিয়েছেন ছেলের।

জা তাঁর মাথায় শিথিল কাপড় সম্বৃত করতে করতে জবাব দিলেন তাঁর দিকে না তাকিয়েই—তাই যেন হয়। কিন্তু দিদি তোমার বুক কাঁপা রোগ বোধহয় এবার আমাকে পেল।

বড জায়ের কিন্তু এধরনের কথাবার্তা মোটেই পছন্দসই নয়। তিনি ডানদিকে মুখখানা একঝটকায় সরিয়ে নিলেন।

রঞ্জিতের কাকা ধনঞ্জয় ওকালতি করেন। কিন্তু তা বলে যে ধরনের একটি চতুর মূর্তি আমাদের কল্পনায় ভেসে ওঠে—সে রকমটি তিনি একেবারেই নন। স্বল্প আয়। পূর্ববঙ্গ থেকে এসে বুড়ো বয়সে ওকালতির পসার আবার নতুন করে জমিয়ে তুলতে পারেন নি। তাই অল্প আয়ের মধ্যে সংসারটিকে গুছিয়ে তুলতে হবে এ বিষয়ে সচেতন এবং সচেষ্ট। কোন কিছুতেই যেমন বাহুল্য নেই তেমনি কার্পণ্যের দায়েও দায়ী করা যায় না তাঁকে। বুদ্ধিমান সংসারী মানুষ। তবে একটু রাশভারী প্রকৃতির। নিজে নিঃসন্তান। তাই ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে ঘিরেই তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা ঘুরঘুর করে। একটু পরেই হয়ত মক্কেলপত্র আসবে। তারই ফাঁকে একটু বিশ্রাম ভোগ করে নিচ্ছেন বারান্দার উপর ইজিচেয়ার বিছিয়ে। সামনে ছোট্ট একটা টিপয়।

রঞ্জিতের হয়ে তার কাকীমার মুখ থেকে সুপারিশ শুনলেন। কিন্তু খুশী হলেন/কি হলেন না বোঝা গেল না। শুধু বললেন—ভাল। এতদিনে ছেলেটা স্বাভাবিক হলো। তবে···বলে তাকালেন স্ত্রীর দিকে।

—তবে আবার কী!—স্ত্রীর কণ্ঠে ঝঙ্কার উঠল।

নিটোল গাম্ভীর্য অব্যাহত রেখে বললেন—তবে ফরমাসটা পূরণ করা দুরূহ। তবুও চেষ্টা করা প্রয়োজন। কারণ এর চাইতে বেশী চাপ এখনই ওর পক্ষে না সইতে পারাই স্বাভাবিক। আবার জগমোহনকে ছেলের এই ফরমাসে রাজী করানোই সমস্যা—যতই ঘনিষ্ঠতা থাক।

আসলে কোম্পানী হচ্ছে তাঁর ওকালতী ব্যবসার একটি বড় মক্কেল। সেই সুযোগেই জগমোহনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। সুনিপুণভাবে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তিনি কার্পণ্য করছেন না। কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, তারও সীমা নির্ধারণ না করলে অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত ফল ফলে—এ অভিজ্ঞতা তাঁর ওকালতী জীবনেও তো কম দেখেন নি। কাজেই যুগপৎ বিরক্ত ও চিন্তিত হলেন।

রঞ্জিতের কাকীমা জিজ্ঞাসা করলেন—কৈ তুমি অবাক হলে না তো? চট্ করে এ ছেলের সম্মতি দেওয়ার মধ্যে অবাক হওয়ার কি কিছুই নেই—

ধনঞ্জয় চৌধুরী মৃদু হেসে চোখের চশমা টিপয়ের উপর খুলে রাখলেন। তারপর আয়ত দৃষ্টিপাতে স্ত্রীর পানে তাকিয়ে বললেন—বিন্দুমাত্র নয়। এলোমেলো মনোভাব একটু আধটু প্রকাশ পাওয়াই তো যৌবনের ধর্ম। আর অভিভাবকত্বের ধর্ম হচ্ছে সেই শক্তিকে সংযত করে পরিচালনা করা।

স্ত্রী একটু ভর্ৎসনার সুরে জবাব দিলেন—নিজের অভিভাবকত্বের বড়াই নিয়ে তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার, তৃপ্তিও পেতে পার; কিন্তু রঞ্জিতের এরকমভাবে রাজী হওয়ায় কোথায় যেন কি একটা আটকাচ্ছে আমার।

সত্যিই মনটা খচ্‌খচ্ করছে তাঁর।

—তা হলে রাজী না হলেই কী খুশী হতে?—প্রকৃতপক্ষে তাঁর মনটাও খচ্‌খচ্ করছিলো কম নয়।

সংকট তাঁর উভয় দিক থেকে। একদিকে রঞ্জিতের উপর আরও চাপ দেওয়ার নীতি যে বুদ্ধিমানের নীতি নয়—এবিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত।

কারণ মামলায় প্যাঁচ কষার অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। অন্যদিকে এ জিনিসও তিনি বুঝতে পারছেন যে আগাম চাকরির উপঢৌকন—ছ'মাস পরে বিয়ে—এ প্রস্তাবও জগমোহনকে দিয়ে গ্রহণ করানো খুব সহজ হবে না। তবে পরীক্ষা সামনে—এই যুক্তিই ভরসা।

তাই উদ্‌বেগে একটু চঞ্চলই হতে হলো তাঁকে। কালবিলম্ব না করে জগমোহনরে বাড়ী যাবেন নতুন প্রস্তাব নিয়ে—সাব্যস্ত করে ফেললেন মনে মনে।

রঞ্জিতের চরিত্র তো তিনি জানেন। অতিরিক্ত অভিভাবকত্ব হাসিলের চেষ্টা

করতে তিনি এরকম অবস্থায় নারাজ। কারণ এ সকল ক্ষেত্রে তাতে কুফলই ফলে। তা ছাড়া মেয়ে সুশ্রী নয় এই দুর্বলতাই যে কন্যাপক্ষের তাঁদের মত ঘরে কাজ করবার কারণ—একথাও তাঁর অজানা নয়। যদিও জগমোহনের হয়ত ধারণা—তাঁদের আসল দুর্বলতার খবর ধনঞ্জয় চৌধুরীর চোখের আড়ালে। এখন দেখা যাক হাতযশ।

ফোকলা গালে একগাল হেসে ধনঞ্জয়কে অভ্যর্থনা জানালেন জগমোহন বাবু। চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে, চিবুক নীচু করে তাকালেন। দৃষ্টিটা যেন শকুনি মামার মত বিদ্ধ করে মানুষকে।

—আরে আইস। এই সবে শ্যাষ কইরা উঠত্যাছি পূজা।

ঘরে ঢুকলেন ধনঞ্জয়। পাকা এক ঘণ্টা লাগে জগমোহনের পূজো সন্ধ্যায়।

পূজো সন্ধ্যেতেই যদি সময় কাটাও—চাকরি আর কারবারের ধান্ধা কর কখন —ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করলেন।

চেয়ার টেনে নিজে বসে নিলেন জগমোহন। সামনের চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে বললেন—আর তুমি কম সময় কাটাও নি? চালুনি খুঁত ধরত্যাছেন······

—সুঁইএর!—হো হো করে হেসে উঠলেন ধনঞ্জয় জগমোহনের কথার পাদ-পূরণ করে। তারপর বসে পড়লেন। রসিকতা দিয়ে শুরু করলেন জমি তৈরির চেষ্টা। মক্কেল তোষণের কায়দা এখানেও প্রয়োগ করতে দ্বিধা করলেন না বিন্দুমাত্র। ফসল পুঁতবার আগে যেমন করে জল সেচনে জমিকে সরস করা দরকার—তেমনই নতুন প্রস্তাব পাড়ার আগে জগমোহনের মনকে সরস করে তুলবার চেষ্টায় বললেন—বড়বাবু না হয়ে তোমার হওয়া উচিত ছিল নায়েব। তোমার চেহারা কিন্তু ভাই তাই বলে।

ফোকলা গাল মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হলো। ধনঞ্জয় বুঝলেন প্রথম ভোজেই ক্রিয়ার কিছুটা সূত্রপাত দেখা যাচ্ছে।

—আর তুমি বুঝি ভাবত্যাছ ভারী পাক্কা উকীলের মতন রূপ তোমার। হায়রে! তবু না যদি বেবাক পণ্ডিতের মতন গোব্যাচারা চ্যাহারা না হইত।

ক্রমে জমে উঠল দুজনায়। চা এলো। একসময় প্রসঙ্গক্রমে নিজের আয়ের প্রসঙ্গটিও ঝালিয়ে রাখতে কসুর করলেন না ধনঞ্জয় বাবু। বললেন—কোন দিক থেকেই তো কিছু করছ না আমার জন্যে।

—করত্যাছি না? বল কী? দু'দিন বাদে একদম বেয়াই-ই তো কইর‍্যা লইত্যাছি তোমারে।

—এতেই তো শুধু পেট ভরবে না ভাই। এদিকে কেসটেস যে একদম ভো ভা। কোম্পানীর পয়সা না পেলে কী শ্রেফ উটকো মক্কেলে পেট চলে।

—আরে ভাই আমিই যখন আছি ব্যস্ত কিসের। সম্পর্ক পোক্ত হইলে মক্কেলও কী আর পোক্ত না হইব। আর জানই লেবারগো সঙ্গে ফাডাফাডি না বাধলে উকীল পোষাইনা ক্যাস্ ট্যাস্ তোমার আইবই বা কোথ্ থিকা—সেডা বল।

কথার ফাঁকে ধনঞ্জয় লক্ষ্য করলেন সম্পর্ক পোক্তা করার আগ্রহ কিম্বা শর্ত। যাই হোক বোঝা গেল নিজ দুর্বলতার প্রতি জগমোহন অত্যন্ত সচেতন। পাত্রী কুৎসিত। মনে মনে হাসলেন উকীল মশাই। জগমোহন তো জানেন না যে পাত্রীর রূপ নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই। মাথাব্যথা অন্য বিষয়ে। জগমোহন অপুত্রক। এবং তাঁর সম্পত্তি আছে।

যা দিনকাল—লটারি অথবা ছেলের বিয়ের দাঁও ছাড়া ছেলেপুলে পরিবারের ভবিষ্যৎ কোথায়? ধনঞ্জয়ের শুধু ভয়—এই সুযোগ অন্যের হাতে অবারিত না হয়ে ওঠে। কারণ তাঁর মত সুযোগসন্ধানী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অভিভাবক অপেক্ষা-দুর্লভ সুযোগের অভাবই অধিক এখনও বাংলাদেশে।

এই দুর্লভ সুযোগ বাড়াবাড়ি শর্তের আরোপে অলভ্য হয়ে ওঠে এই আশঙ্কায় এতক্ষণ নতুন শর্ত পাড়তে দ্বিধা করছিলেন ধনঞ্জয়! নিজেকে অত্যন্ত সংযত রেখে আলাপ করছিলেন তিনি। ইঙ্গিতে আগে ভাগেই বিন্দুমাত্র প্রকাশ হয়ে যায় আসল উদ্দেশ্য—সে দিকে অত্যন্ত সজাগ ধনঞ্জয়। প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে তারপর রঞ্জিত প্রসঙ্গে এলেন ধীরে ধীরে। অবশেষে খানিকটা বাড়াবাড়ি প্রশংসা করলেন তার সুচতুর ভাবে। বললেন—এরকম ছাত্রাবস্থায় বিয়ে দেবার পক্ষপাতী আমি নই। সে বিষয়ে রঞ্জিতের সঙ্গেও আমি একমত। কিন্তু তুমি আমার বন্ধু—আর তা ছাড়া চাকরির ব্যাপাটার পরেও যখন আজকাল পড়াশুনা করা সম্ভব।

বেশ বিজনেস টকের কায়দায় কথা বলতে পারায় তৃপ্তি পেলেন মনে মনে।

জগমোহন একমনে শুনলেন। তারপর হাঁকলেন অকস্মাৎ—চা।

ধনঞ্জয় বিস্মিত হলেন।

—আবার চা কী হবে।

—আরে খাও খাও। গ্রীষ্মের শীতল পানীয়। ঘাম দিয়া গ্যাহ ঠাণ্ডা হইবে।

এবার কিন্তু সত্যিই বুঝতে পারলেন না ধনঞ্জয় কি বলতে চান উনি।

পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেলেন জগমোহন। ঝপ করে তালভঙ্গের মত তাঁর পক্ষে বেহিসেবী চাউনিতে আর ধরা গলায় বললেন—বর্তমানে আমার ঐ একটিই মাত্র মাইয়া। পয়সা যা আছে, বিয়া যদি নাও করাই, আমার অবর্তমানে মাইয়ার আমার অভাব হইবে না। কিন্তু···বলে খানিকক্ষণ ঝিম ধরে রইলেন। তারপর গলার পর্দা সহসা খানিকটা চড়িয়ে বললেন—

—কি হইবে পয়সা দিয়া?

ধনঞ্জয় বিলক্ষণ চেনেন জগমোহনকে। সহসা এরকম অকাল বৈরাগ্যে চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

—চিন্তা চিন্তা চিন্তা। তোমার কাছে লুকাইয়া লাভ নাই। টাইফয়েডে ময়নার একটা চোখ পাথর কইরা দিছে। ছাখতে পায় না ভাল। মনে আমার শান্তি নাই বোঝলা। কি হইবে মাইয়ার ভবিষ্যৎ। এমন হৃদয়বান পোলা কি কি আছেএ যুগে?—এতক্ষণে সামলে নিতে পারলেন ভদ্রলোক।

পাত্রীর এক চক্ষু দৃষ্টিহীন—এ সংবাদ ধনঞ্জয়ের অজ্ঞাত ছিল। কাজেই তাঁর বিমর্ষ হবার কথা। কিন্তু তিনি পুলকিত হলেন। কারণ এতক্ষণে জগমোহনের দুর্বলতম মুহূর্তের মাহাত্ম্যেই দুর্লভ সুযোগ সুলভ হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা অবারিত-প্রায়। পাত্রী নিয়ে অত মাথা ঘামালে সব সময়ে চলে না। একদিকে ত্যাগ না করলে অন্যদিকে লাভ লাগসই হয় কখনও! কাজেই ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে পুলকের প্রকাশ করলেন সংযত। বুঝলেন চা তবে এক্ষেত্রে বাদল নামবার আগের ঝ'ড়ো হাওয়া।

এরপরও নানারকম আলাপ আলোচনা চলল। ফাঁকে ফাঁকে উট্‌কো রসিকতা। হাসি ও চায়ের সহযোগ। ক্রমে আর এক আন্তরিকতম মুহূর্ত এলো। ধনঞ্জয়ের অত্যন্ত আশঙ্কিত নতুন শর্ত পাড়ার সমস্যা সহজ হয়ে গেল। অত্যন্ত আন্তরিক কায়দায় আন্তরিকতম মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করলেন তিনি। প্রস্তাব পাস হয়ে গেল।

একটা বাজি জেতার তৃপ্তিতে ভরপুর মন নিয়ে ফিরে এলেন ধনঞ্জয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ এক ॥

লোহার কারখানার চাকরিতে রঞ্জিত বহাল হয়ে গেলো। চাকরির চেয়ে চাকরির ইণ্টারভিউ পর্ব অবিস্মরণীয়।

খাস বিলেতী সাহেব ডেনকিন। ওয়ার্কশপের চীফ্ ফোরম্যান। কোনকালে বিলেতের কোন কারখানার মিস্ত্রীস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। হাতে কলমে শেখা ইন্‌জিনিয়ারিং বিদ্যার দৌলতে ভারতে প্রেরিত হন, উচ্চপদে। তখন প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ।

কারখানার এক্তিয়ারে ব্রিটিশ শাসন বজায় আছে—চলন বলন ও মেজাজে এই ভাব অবিচল। বাংলা হিন্দী দুটোই জানেন। কিন্তু সাধারণতঃ পাইপ কামড়ে ইংরেজীতে কথা বলেন। লোকেরা বলে তাদের বিব্রত করাই উদ্দেশ্য।

এহেন ডেনকিন সাহেব ইণ্টারভিউ নিলেন। তাঁর চেম্বারে প্রবেশ করতেই একবার মুখ উঁচু করে তাকালেন। হাতের পাইপ মুখে গুঁজলেন। ধোঁয়া উদ্‌গিরণ করলেন কয়েকবার। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—

—হোয়াট্‌স্ ইয়োর নেম ইয়ংম্যান?

চাকরি সম্বন্ধে ধ্যান ধারণায় নেহাৎ নতুন বলে গোড়ার দিককার জবাবে কণ্ঠ কিঞ্চিৎ সন্ত্রস্ত শোনালো।

—হোয়াট্'স্ ইয়োর কোয়ালিফিকেশান?—সাহেব আবার তেড়ে প্রশ্ন করলেন।

—আই অ্যাম এ বি. এস্‌সি. স্টুডেণ্ট সার্।—

সাহেব এর পরেই যে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন সে প্রশ্নে প্রথমটা বেজায় থতমত খেয়ে যেতে হলো রঞ্জিতকে। ভাবলো, বোধহয় শুনতে ভুল করেছে। জবাব পেতে দেরি হওয়ায় সাহেব সেই প্রশ্ন পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,—

—আর ইউ ম্যাট্রিকুলেট?

আর ইউ ম্যাট্রিকুলেট—বেটা বলে কী! রঞ্জিতের মনের নতুন বোধটা কেটে উঠল এক্ষণে। কণ্ঠে স্বাভাবিক সতেজভাব ফিরে এলো। বলল,—

—ইয়েস্ সার্। আই অ্যাম এ বি. এস্‌সি. ষ্টুডেন্ট সার্।—

তবু সাহেব নাছাড়।

—ডোণ্ট ওয়াণ্ট। টেল মি আর ইউ ম্যাট্রিকুলেট ?—ঝঙ্কার উঠলো সাহেবের কণ্ঠে। রঞ্জিত অবাক।

বি. এস্‌সি. ক্লাসের পড়ুয়া ম্যাট্রিকুলেট কী না সাহেবকে বলতে হবে। যে ইচ্ছা তার কোনদিন হয় না, সেই ইচ্ছা জাগল। ইচ্ছা জাগল ভেংচি কাটে। কিন্তু চেপে গেল। কারণ মনে পড়ল চাকরির ইণ্টারভিউ। অতএব নিরুপায় হয়ে বি. এস্‌সি. পড়ুয়া ম্যাট্রিকুলেট কিনা সেই ব্যাখ্যায় লেগে গেল কোমর বেঁধে। পাঠশালার পড়ুয়ার পাঠ মুখস্থ করার মত সুর করে করে। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও সুরের তির্যক খোঁচা এড়াতে পারল না।

—ইয়েস সার্, আই হ্যাভ বিন্ ম্যাট্রিকুলেটেড ফার্স্ট। দেন আই টুক্ আই. এস্‌সি. কোর্স। আই কম্‌প্লিটেড্ দি কোর্স। আই অ্যাপিয়ার্‌ড্ এট দি এগ্‌জামিনেশান। আই পাস্‌ড্। এগেন আই গট্ মিসেল্‌ফ অ্যাড্‌মিটেড ইন্ দি বি. এস্‌সি. কোর্স। দেয়ারফোর আই অ্যাম্ এ স্টুডেণ্ট অব বি. এস্‌সি. সার্।

ব্যাখ্যা এত দীর্ঘ করবার প্রয়োজন ছিল না। তবু গোঁ চেপে বসলো তার।

সাহেব কি বুঝলেন কে জানে, তবে অত্যন্ত শশব্যস্তে বললেন—ওয়েল ওয়েল। দেন ইউ কন্‌ফার্ম ইউ আর ম্যাট্রিকুলেট।

জবাব না দিয়ে রঞ্জিত হতাশভাবে অন্যদিকে তাকালো। গোটা ইণ্টারভিউ পর্বের এই অংশ শুধু যে মজাদার বলে স্মরণীয় তাই নয়। প্রথম চাকরির উপর প্রথম যৌবনের প্রকাণ্ড একটা সশ্রদ্ধ ধারণার প্রতি প্রকাণ্ড একটা সশব্দ চপেটাঘাত হিসাবে স্মরণীয়।

চাকরি দেনেওয়ালাদের হাতে বি. এস্‌সি. আর ম্যাট্রিকুলেশনের কদর যে পিণ্ডি চটকানোর চাইতে অধিক নয়—রঞ্জিত তা জেনে. এরপর শিক্ষার প্রতি বিমুখতা প্রকাশ করা উচিত না সাহেবের প্রতি—ভাববার চেষ্টা করল।

পূর্বব্যবস্থিত বলে চাকরির নিয়োগপত্র পেতে অবশ্য অসুবিধা হলো না।

কার্যতঃ কোন পক্ষের প্রতি বিমুখতা প্রকাশ না করে—চাকরিও করতে লাগলো আবার ফাইনাল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিও চালাতে লাগলো।

একই সময়ে আর একজন ভরতি হলো লোহার কারখানায়। সেও জগমোহন

ব্যবস্থিত—তাঁর স্লিপের লোক। আর তাকেও ইন্টারভিউ নিলেন ডেনকিন সাহেব। তার ইন্টারভিউ পর্বও অন্য আর এক দিক থেকে অবিস্মরণীয়।

কারখানায় গেটে চিরকুট দেখাতে এহাত সেহাত পাচ হাত ঘুরতে ঘুরতে সে এসে দাঁড়ালো অফিস ঘরে। বিরাট কারখানা। অফিস ঘর তারই এক কোণে খানিকটা বাহারী কাডবোর্ড ঘেরা স্থানে। চেয়ার টেবিলে কিছু কেরানী বাবু। সবচেয়ে ভারিক্কী টেবিল আর চেয়ারে জগমোহন বাবু স্বয়ং উপবিষ্ট। ইতিমধ্যে তারই মত চিরকুট মার্কা কিছু লোকের লাইন পড়েছে। সেও মাঝে একটা জায়গা করে নিল।

জীবনে কলকারখানার ভিতরকার চেহারা সে দেখেনি। তাই সব কিছুর উপরই দৃষ্টি মেলে সে দেখতে লাগলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

মেসিন ঘরের মেসিন চলার কানে তালা লাগা অবিশ্রান্ত একটানা গর্জনের পটভূমিকায় মেসিন ঘরের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দূর বিন্যস্ত অন্যপ্রান্তে চেয়ে থাকল শংকর। চার পাঁচ সারি উদ্ভট বিরাটকায় সব মেসিন। মেসিন মেসিন আর মেসিন। চোখ আর কানে ধাঁধা লেগে ওঠে।

মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে ওয়ার্কশপের আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। দুটি সমান্তরাল সারি ঠিক যেন রেল লাইনের মত ক্রমশঃ সরু হয়ে মিলিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে অন্য প্রান্তের শেষ দেওয়ালে। চোখের চমক চুকতে না চুকতেই চোখ তুলে দেখে জগমোহন বাবুর টেবিলের সামনে এসে গেছে।

জগমোহন বাবু অত্যন্ত ভারিক্কী চোখে চেয়ে চিরকুট গ্রহণ করে একটা ছাপানো ফর্মে কী সব লিখলেন। তারপর হাঁক দিয়ে বললেন—

—ফোরম্যান সাহেবের সাইন্ লাগবো।

তাঁর দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র চেনার আভাস নেই। অবাক কাণ্ড—শংকর ভাবলো। তা হোক। নাই বা চিনলেন। তবু হাতে ছাপানো ফর্ম শংকরের। বুকটা দুর দুর করছে। শুধুমাত্র ফোরম্যান সাহেবর সই-এর অপেক্ষা তাহলে! তারপর চাকরি শুরু।

আগেকার চিরকুটধারীদের অনুসরণ করে ওয়ার্কশপের আর একপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলো। আর একটা বাহারী কার্ডবোর্ডের কামরা। বাইরে বেহারা। উর্দিপরা।

অগ্রবর্তী চিরকুটধারীরা টুকটুক করে ঘরে ঢুকে অত্যন্ত সহজেই কিছুক্ষণের

মধ্যে বার হয়ে এলো। এবার কাডবোর্ডের ঘরের মধ্যে ঢোকার পালা এলো তার। আফিস কারখানার পরিবেশে কামরা উপজীবী সাহেব সুবোদের সঙ্গে মোলাকাৎ করার প্রয়োজন এই প্রথম। বুকের দুরদুরানি হঠাৎ ঢিবঢিবানি হয়ে উঠলো। পা কাঠ। মনের মধ্যে বিশ্রী যোঝাযুঝি শুরু হয়ে গেল। কোন কিছু নতুন ঘটনার সম্মুখীন হতে গেলেই—যা তার হয়। কেমন করে ঢুকবে সে ঐ কামরার মধ্যে। নিজের এই মনোভাবের প্রতি অন্য মনো-ভাবের বিরক্তি এমন যে পালটা জবাবও উঠল চোখের নিমেষে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে—কেন, হাঁটি হাঁটি পা পা করে।

দু'পা এগুল সে। কামরার ছাপ্ দরজায় ছায়া পড়ল। কিন্তু পা এবার একেবারেই স্ট্যাচু। আবার যোঝাযোঝি। এক মন প্রশ্ন করল—যাই হোক সাহেবও লোক তো বটে। কিভাবে কথা বলতে হয় তাও তো তার জানা নেই কস্মিনকালে!—আবার পাল্টা জবাব—কেন, বাঘ না ভালুক, সে খেয়ে ফেলবে?

ঘরের ভিতর থেকে ঘণ্টাধ্বনি এল। হাঁকও উঠল।

—জগ্‌দেও!

উর্দিপরা বেয়ারা টুল ছেড়ে ভিতরে প্রবেশ করল। হায়রে—এখানেও জগ্!

উর্দিপরা বেরিয়ে এল। পাল্টা সিদ্ধান্তের মনোভাব উর্দিপরাকে দেখে দৃঢ় করে নিল সে।—আচ্ছা ঢুকলে সত্যিই তো আর খেয়ে ফেলবে না কেউ।

জগদেও বেয়ারা ইতিমধ্যে ওর মনে হলো ধাক্কাই মারল পেছন থেকে—আরে যাইয়ে, ঘুষ যাইয়ে না!

জগদেওএর ধাক্কায় না তার শেষ সিদ্ধান্তের ধাক্কায় সে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল যে—সঠিক নির্ধারণ করে উঠতে পারল না। কাডবোর্ড ঘেরা কামরার মধ্যে সাহেবের সম্মুখস্থ হওয়াকে—শীতের ভয়ে জলে নামতে নারাজের পক্ষে পা হড়্কে জলে পড়ে যাওয়ার পরের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা চলে।

হুড়মুড় করে বিসদৃশ প্রবেশকে সাহেব কী চোখে দেখলেন সাহেব জানেন। কিন্তু হুংকার করলেন—হোয়াড্ ওয়ান্ট?

বেসামাল প্রবেশ সামলাতে না সামলাতে বেমক্কা প্রশ্নের আঘাত। ঢোক গিললে। কিন্তু বুঝল অসহায় হয়ে এরকম স্থলে পরিত্রাণ নেই। অতএব সঙ্গে সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ ইংরেজী জ্ঞান প্রয়োগ করল। প্রশ্নানুযায়ী

জবাবের কথা বিচার করার মত মনের অবস্থা ফিরে পাবার পূর্বেই প্রশ্নের ত্রস্ত জবাব দিয়ে অবস্থার জবরজং জটটাকে জল করতে চেষ্টা করল।—নো সার্।
—তার পর আবার ঢোক গিলল।

সাহেব যখন বোঝেন ইংরেজী চলবে না তখন হিন্দী চালান। এবং বেশ পরিচ্ছন্ন হিন্দী।

সাহেব হেসে ফেললেন। আর বেয়াকুফের ভাগের আর্ত হাসি হাসলো শংকর।

—ইউ ডোণ্ট ওয়াণ্ট এনিথিং? কুচ নেই মাংতা?—

শংকর ব্যাপার সড়গড় করে ফেলার সূত্র পেলো। স্থির হয়ে নিয়ে হাত বাড়িয়ে ছাপানো ফর্মখানা ধরল সাহেবের টেবিলে। মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখল।

তারপর ব্যাপার নিতান্ত সহজ। লৌহবর্ত্মের উপর তুলে নিয়ে ওয়াগনকে ধাক্কা দেওয়ার মত সহজ।

ফোরম্যান সাহেব সই করলেন। শংকর সেই দিন থেকে যথাবিহিত চাকরি করতে লেগে গেলো।

সারা কারখানার একটা মুকিয়া ডিপাটমেণ্ট নাকি ভাইস ডিপাটণ্টে। এখানে মেসিন মেরামতি কারবার।

বড় মিস্ত্রী হল নস্তু। শ্রমিকেরা বলেন বাবা বিষকরম্ নস্তর বাটালির আগায়। তার তদারকিতে মেরামতী কাজ শিখতে পাওয়ার সৌভাগ্য নাকি ঈর্ষার বস্তু। এই ডিপাটের লোকেদের একটা আলাদা দেমাকের কারণ তারা সারা কারখানার মেসিন সারাই করে।

সেখানকার সব চাইতে বড়ো অটোমেটিক লেদে কাজ করে বুদ্ধ ওস্তাদ। নস্তর কাছে হাতে কলমে কাজ শিখেছে বলে ওস্তাদ বলে অভিহিত। হেন ডিপাটের এহেন লেদম্যানের পাঁচসিকা রোজের হেল্‌পার এখন শংকর।

শুধু কী তাই! সে এখন লেদম্যান বুদ্ধু ওস্তাদের তিরিক্ষি মেজাজের মোকাবিলা করে দস্তুরমত সপ্রতিভাবে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার হাতের কাছে এগিয়ে দেয় যন্তরপাতি। এটা ওটা সেটা—দৈত্যটাকে যা চালু রাখে। আর ভাবে মাঝে মাঝে, যে দিন সে নিজ হাতে বদ্ধু ওস্তাদের মত লেদ চালাতে পারবে, নিপুণ কারিগরের মত সেট করতে

পারবে টুল। পাকা কারিগরের মত টুল সেট করতে পারে লেদে এমন কারিগরই বা আছে ক'জন সারা লোহারখানায়।

ইঞ্জিনিয়ার ফোরম্যান সাহেবরা পর্যন্ত আঁক কষে আর ডিজাইন মিলিয়ে পুরো দুটো দিন লাগিয়ে দেন যে কাজের টুল লাগাতে—বুদ্ধু ওস্তাদ সেই কাজের টুল সেট করবে নির্ঘাৎ আধ ঘণ্টায়। সামান্য চোখের আন্দাজে সুতোর হিসাবে। টুল সেট করার পূর্বে পুঁথিপড়া বিদ্বান ইঞ্জিনিয়ার সাহেব দাঁড়িয়ে যতক্ষণ মাইকো মিটারের হিসাব কষতে থাকেন—ততক্ষণে বুদ্ধু ওস্তাদ চোখের আন্দাজে সুতোর মাপ নির্ণয় করে টুল লাগাতে শুরু করে দেয়। চোখের অনুমানের এই ক্ষিপ্র অথচ নির্ভুল কুশলতায় বুদ্ধু ওস্তাদকে সাহেবরাও সম্মান করে। ডিপার্টের ইনচার্জ যখন বাংলায় বলেন—হ্যালো বি ইউ ডি ইউ, তোমার আই এস্টিমেটেই কাজ চলবে না মাইকো মিটার বার করা লাগবে,—বুদ্ধুর গোল গোল চোখ ক'বার পাক খায়। বুকটা খানিক টান হয়ে ওঠে।

—এ ছুকেরাবাবু দেইড়ে দেইড়ে শুনছো কী হাবার মত। এস্টোর ঠেঙ্গে নয়া টুল নিয়ে আসতে হবে যে।

শংকরও কায়দা করণে অনেক পোক্ত হয়ে উঠেছে। তেল আর ভেস্‌লিনের কালি মাখা হাতে একটা স্লিপ কাগজ আর একখণ্ড পেন্সিল এগিয়ে দেয়। বুদ্ধু মেসিনের থেকে হাত তুলে মেসিনের মাথায় রাখা কটন দিয়ে হাত মোছে। আর ভাঙ্গা ইংরেজীতে নাম সই করে—বি ইউ ডি ইউ। ইংরেজী দূরে থাক সে লেখাপড়াই জানে না। কিন্তু লেদের মিস্ত্রী হবার পর থেকে গরজে পড়ে এই সংক্ষেপ সই আয়ত্ত করেছে কোন বাবুর থেকে। কারণ মেসিনের টুল আর মাল হামেশাই আনাতে হয় স্টোর থেকে। আর টিপসই দিয়ে স্লিপ অনেকে পাঠায় বটে—কিন্তু ইজ্জতে খটকা লাগে। সাহেব সুবোদের বুদ্ধুকে বি ইউ ডি ইউ নামে ডাকার ভিতরের রহস্য এই।

তবু মাল কাটতে গিয়ে টুল যত ভালভাবেই সেট হোক হাতের ইতরবিশেষে একটু বে-জায়গা মত টান পড়লেই, সিকি সুতোর এধার ওধার হলেই মাল রদ্দি হওবার সম্ভাবনা। বেশী মাল রদ্দি হলে দশরকম কৈফিয়ৎ। তার ওপর বুদ্ধু কণ্ট্রাক্টরের লোক। আখের খারাপ। অথচ তার খুঁত হচ্ছে ইউনিয়নের কথার গন্ধ পেলে মেতে উঠবার অভ্যেস তার ষোল আনা। আনমনাভাবে মাল কাটলে কখনও মাপের মাল বেরোয় মেসিনে! যতই হোক মানুষ আছে তাই মেসিন চলে।

কাজের সুনাম আছে, কিন্তু ক'বছর ধরে তা ভাঙিয়ে কণ্ট্রাক্টর থেকে কোম্পানীর খাতায় নাম ওঠাতে পারল না বলে কাজের ওস্তাদিতে আস্থা ইদানীং কমেছে। আর ঐ খুঁতই চলেছে উত্তরোত্তর বেড়ে।

সাধারণ নিয়ম—হাতযশ দেখাতে পারলে ক্রমে কণ্ট্রাক্টরের লোকদের কোম্পানী নিয়ে নেয়, নন্তও কণ্ট্রাক্টরের হয়ে ঢুকে এখন কোম্পানীর খাতায়। শুধু কী খাতায়—বড় মিস্ত্রী। ভাইসে লেদ অমন দশটা চলে। সবের মাথায় আজ নন্ত। তারও মাথায় আছে ডিপার্ট ফোরম্যান—সারা ভাইস ডিপার্টের মাথা। মোহন সাহেব। আসল নাম সি. ডি. মেইন।

শ্রমিকদের মুখ তো নয় খুর। তারা জগমোহনের জগ কাটে আপন খেয়ালে, বিদেশী শব্দের মাঝখানে টিক্ দিয়ে মোহন করে, বাংলা ভাষার শব্দকোষে বৈয়াকরণিকদের জন্য এক ঝামেলা সৃষ্টি করে।

বুদ্ধুই ব্যতিক্রম বুদ্ধু ভাবে। ঘষছে কন্‌ট্রাক্টরের ঠিকা কাজে। নন্তর রোজ এখন দশ টাকা। তা'ছাড়া বছরে পনেরো দিন বেতন সহ ছুটি। কোম্পানীর লোকদের সকলের বেলা এই দুটো নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। বুদ্ধু ওস্তাদের রোজের সত্যিকারের কিছু ঠিক ঠিকানা আছে নাকি। রোজ একটা দেওয়া আছে বটে। কিন্তু কোম্পানীর থেকে যেমন দরে কন্‌ট্রাক্ট নেওয়া তার উপর ভিত্তি করে মালের একটা মনগড়া দর ধরেন তাঁরা। সেই দরে যত টাকার মাল নামবে যার। এই তো রোজের মূলকথা। তাছাড়া ছুটিছাটার ব্যাপার নেই। দাওয়াই-এর ব্যবস্থা তথৈবচ। অথচ ভাবতে অবাক লাগে—একই কাজ, একই কারখানা, একই মেসিন।

সাধে কী আর বুদ্ধুর উষ্মা বেশী। শুধু বুদ্ধু কেন তামাম কন্‌ট্রাক্টরের লোকদের। বুদ্ধুর না হয় ডাকসাইটে নাম একটু বেশী। ভাইস ডিপার্টের অর্ধেকেরও বেশী শ্রমিক কন্‌ট্রাক্টরের। সব চাইতে খারাপ অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয় বলে এদের অধিকাংশ ইউনিয়নের কথায় চট্ করে মেতে ওঠে। তাদের সবার চরিত্রেই অল্পবিস্তর এ খুঁত বর্তমান।

ভাইস ডিপার্টের বাইরে কন্‌ট্রাক্টরের লোক কম। ইউনিয়নের আসরও নড়বড়ে। নন্ত মিস্ত্রী ইউনিয়নেরও লোক। এ কথা সে তার সহজাত অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝে বলেই বেশী কড়া কার্যক্রম গ্রহণে তার আশঙ্কা। কিন্তু মুশ্‌কিল এই যে যুক্তিতর্ক দিয়ে গুছিয়ে বলতে পারে না।

বুদ্ধুও জাত শ্রমিক। তবুও সে এ জিনিস এমন করে বোঝে না।

ইউনিয়নের প্রস্তাবিত ভোট গ্রহণ পর্বের প্রস্তুতি যে অন্যান্য ডিপাটে একদম এগুচ্ছে না এবং তার ধাক্কা ভাঙ্গনও আনছে একথা যত সে হৃদয়ঙ্গম করছে ততই তার গরম মেজাজ তিরিক্ষি হচ্ছে। খিটখিটি বাড়ছে! যাকে তাকে যা নয় তাই বলে ফেলছে।

দিনের ছ তিন চার ঘণ্টা কাটছে অবান্তর ঝগড়াঝাঁটিতে। সে কন্ট্রাক্টরের লোক। মাল কম পয়দা হলে কিম্বা বেশী রদ্দি হলে যে তার মাইনেয় টান পড়ে—সেকথা চিন্তা করেও ঝগড়াঝাঁটিতে সময় নষ্ট করা কমছে না কিছুতেই।

ফলে শংকরের একদিকে সুরাহা হচ্ছে। মেসিনটার কীর্তিকলাপ বুদ্ধুর অসাক্ষাতে নাড়াচাড়া করে দেখবার ঔৎসুক্য নিবারণের একটা মওকা মিলছে। সে ততক্ষণ মেসিনটার খোদ মালিক থাকছে।

পাশের স্লটিং মেসিনের পাঁচুর সঙ্গে এক পসলা হয়ে গেল সেদিন। বুদ্ধু বলল—আরে ছোঃ—ছিদ্দির করা মেসিন আবার মেসিন। তেলাপোকা পাখী। হাঁ মেসিন যদি বলিস লেদ।

পাঁচু খানিক ক্ষেপল।—ধর্ ইস্ক্রুপ একটা তুই কাটলি বুঝলাম। কিন্তুক ছিদ্দির! যে ইস্ক্রুপে ছিদ্দির নেই কোন্ কাজে তা লাগবে কোম্পানীর। ধুয়ে খাবে?

—আরে ইস্কুরুপ কাটলে তো ছিদ্দির করবি। নইলে যা যা যা হাওয়ায় ছিদ্দির করগে যা। ইঃ স্লটিং আবার মেসিন।

উত্তরোত্তর হাতাহাতির পর্যায় ওঠে এমনি অবস্থা। আসলে এর ভেতরের কথাটা ছিল পাঁচু হালে কোম্পানীর খাতায় উঠেছে অথচ বুদ্ধুর হিসেবে—তার চেয়ে দীর্ঘদিন তার চেয়ে অনেক শক্ত মেসিনের কারিগরের কাজ করছে সে। তবু তার নাম কোম্পানীর খাতায় উঠলো না। তাই সে প্রথমে সেই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিল যে কোম্পানীর শ্রমিকে শ্রমিকে ফারাক করবার একটা মতলব আছে!—খুব একটা সদিচ্ছা নিয়েই সে শুরু করেছিল—বুঝলি পাঁচু, এর আলবাৎ একটা মানে আছে।

পাঁচু যে এমন ভাবে সামান্য কথাটা গ্রহণ করবে কে জানতো। শেষ পর্যন্ত শংকর এসে হস্তক্ষেপ না করলে বেশ গুরুতর কাণ্ডই ঘটতো। শংকর এত অল্পদিনে এতটা চৌকস হয়ে উঠতে পারে এ যেন অচিন্তনীয়।

একটু মাথা ঠাণ্ডা হতে বুদ্ধু পর্যন্ত শংকরের প্রশংসা করে বসল। বলল—ছুকরা বাবু না থাকলে দেখছি একটা কেচ্ছাই হত মাইরি।—মনে মনে লজ্জিত হল। এই তো সেদিন কাজ করতে এল তার কাছে হাবাগোবা

ছেলেটি। নন্তু সঙ্গে করে নিয়ে আসতে সে প্রশ্ন করল—কার আদ্‌মী হয়ে এলে মাইরি। কণ্টাক্টার না কোম্পানী?

শংকর মাথা চুলকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে চেষ্টা করল—চাকরি, তার আবার কণ্ট্রাক্টর আর কোম্পানী কী! মুখে বল্‌ল—কোম্পানী? উহুঁ। কণ্ট্রাক্টর উহুঁ!—তারপর শেষ বারে বেশ জোর দিয়ে বলল—চাকরি, চাকরি।

ধাতু চিকচিক করা দাঁত বার করে হি হি করে হেসে উঠল বুদ্ধ। নন্তুকে জিজ্ঞাসা করল—পাগলা আছে নাকী।

শংকর কাঠ হয়ে গেল একটা তীব্র অপমানবোধে। পুরানো আত্মসম্ভ্রম-বোধটার অভিজ্ঞতা বেড়েছে। একবার ঢেউ মেরে আবার ফিরে গেল।

নন্তু কাজ বুঝিয়ে চলে যেতে বুদ্ধ ফিস্‌ ফিস্‌ করে কানের কাছে প্রশ্ন করল—কত বখরা নিলে?

—বখরা? —শংকর তো অবাক। —হাঁ হাঁ বখরা—চট্‌ করে মনেও পড়ে গেল চাকরির শর্ত।

—আধাআধি। —কথা একবার ধরতে পারলে উত্তর দিতে আটকাচ্ছে না শংকরের। এটা ঠেকে ঠেকে ধাতস্থ হয়েছে।

—ফি মায়না? —মায়না কথাটা প্রথমে বেতন বলে ভুল করেছিল সে। ক্রমে সত্যিকারের অর্থ বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—উঁহু পয়লা তিনমাস।

—বলছ কি গো? হাবা পেয়ে তোমার ঠকিয়ে লিয়েছে জগমোহন। —দাঁত ঘষত লাগল বুদ্ধু। অন্য সময় না হোক ক্রোধের সময় মোহন বাবু—পুরো জগমোহনে পরিণত হন। তারপর নিজের মনেই বলে বসল—আমার ঠেঙ্গে লিয়েছিল পয়লা মায়নার তলবের সিকি। তবু আমি তো কাজ জানা আদমী আছি।

বুদ্ধুর ভাবভঙ্গী আর কথাবার্তায় চৌকস মূর্তি দেখে যেতে লাগল শংকর—আর প্রয়োজনে জবাব যোগাতে লাগল। চাকরি করা, যার অর্থ—শংকরের ভাষ্যে নিজের পায়ে দাঁড়ানো—তার এই মূর্তিমান বাস্তব বিগ্রহের সম্মুখীন হয়ে—এবার আশ্চর্য এই যে, তার পুরাতন অনাড়ষ্ট ভাব কোথায় যেন অন্তর্হিত। সে যেন দিব্যি অবকাশ পাচ্ছে মাথার বুদ্ধিকে সাফ সাফ খেলাতে। অনাড়ষ্টতার পাথরখানা কতদিনে তাকে এমনি করে শেষবারের মত নিষ্কৃতি দেবে—সে ভেবে পায় না।

—তা তোমাকে আমি কাজ শিখিয়ে লিব। যতই হোক তুমি আমাদের কন্‌ট্রাক্টরের আদমী আছ।

শংকর জানতে চায় আরও একটু স্পষ্ট করে—কেন, কন্‌ট্রাক্টর আর কোম্পানীতে কিছু ফাঁক আছে নাকি।

মেসিনের পাশে রাখা ভাঙ্গা ক্যানাস্তারার উপর বসে নিল বুদ্ধু। জুট দিয়ে হাতের কালি মুছল। মেসিনটা নাহক ঘুরছে। আলগা করে দিল বেল্ট। একটা পাশ দেখিয়ে বসতে বলল। তারপর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কণ্ঠে জানাল—তোমার কিছু দেরি লাগবে তামাম জিনিসটা সমঝাতে।

তারপর গলা খাটো করে মুখখানা কানের কাছে আনল, বলল—ফ্যারাক তোমার ত্যাতো ফ্যারাক নয়, য্যাত মালিকের সঙ্গে। তবে জানলে, ফ্যারাক আছে। হুঁ। একটু কম বিশওয়াস করে চলবে কোম্পানীর আদমীদের। হুঁ। —ঘাড় কাত করে তেরিয়া হয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো বুদ্ধু।

—আর কাকে কাকে কম বিশ্বাস করতে হবে ওস্তাদ?

বুদ্ধু ওস্তাদ ফিরে তাকালো। ঘণ্টায় ঘণ্টায় অফিস থেকে মালের হিসাব নিতে আসে মাল বাবু। দীপেশ বাবু। সঙ্গে নতুন লোক একজন। নতুন কিন্তু চেনা লোক।

—কেন তোমাদের মত বাবু আদমীদের।

দীপেশ হেসে উঠলো।—বাঃ চমৎকার বলেছো ওস্তাদ।

—হুঁ হুঁ! আমি কোথায় কী বাৎ করছি কী না করছি আড়ি পেতে শোনা হয়েছে ঠিক।

দীপেশ হাতের ফাইল উঁচিয়ে পেন্সিল বাগালো।

—তা গেল ঘণ্টায় মালটাল কেটেছ কিছু, না পেনশন নিয়েছ। ইস! একেবারে বেল্ট খুলে খোশ গল্প করছ যে।

ওস্তাদ তো ভীষণ লাল একথায়।—সে ঘণ্টা কেন, তামাম রোজ আমি কিছু করিনি—যাও এবার লাগিয়ে এস কোম্পানীকে—হুঁ। আমাকে ডর দিখাবে না হুঁ।

দীপেশ ডানহাতের চেটো সহযোগে ওস্তাদের পিঠে ধীরে ধীরে চাপড় মারলো, বলল—আরে ওস্তাদ, তোমার মত ওস্তাদ কী দুটো আছে না কী। দুদিন তুমি পেনশন নিলেই বা কী। ইচ্ছে করলে একদিনে দুদিনের মাল কাটতে পারে—এমন কজন আছে কারখানায়—

জলের ঝাপটা মেরে উৎলে ওঠা দুধের মত ঝপ করে নেমে গেলো ওস্তাদের গলা। অনেকদিন কাজ করছে দীপেশ। কাজেই এসব ব্যাপারে দক্ষ।

এবার বলল ওস্তাদ—বেশ তা কী করতে হবে বলো।

—কী আবার করবে। আমার বদলী এই নতুন বাবুকে একটু খাতির টাতির দেখিয়ে কাজ শিখিয়ে নিও। তোমরাই হচ্ছ কারখানায় পুরনো লোক। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মাল লিখতে আসবেন এখন থেকে ইনি।

—উ আমার চেনা বাবু আছে।

—তাই নাকি। তবে তো কথাই নেই।

একথায় হঠাৎ ঝঙ্কার তুলে বললো বুদ্ধু,—

—হঁ। য্যত নয়া আদমীকে কাম শিখিয়ে লিবার বেলা ওস্তাদের খাতির, কোম্পানীর খাতায় নাম উঠবার বেলা দুসরা আদমীকে খাতির দিখাবে —ওস্তাদ বেল্ট তুলে দিলো মেসিনে।

পাশের মেসিনের পাঁচু তেরচা করে চাইলো। মালবাবুদের উপস্থিতিতে এই হিংসুটেমির জবাব দিতে পারল না। কিন্তু মুকিয়ে রইল সেই দিন থেকে। অনেক দিন পর তার বদলা নিয়েছে পাঁচু। আর সেই হাবা শংকর একদিনের মধ্যেই এমন চৌকস ভাবে মধ্যস্থতা করার মওকা পেল যে বুদ্ধুর লজ্জা লাগল।

দীপেশ হাতের ফাইল রঞ্জিতের হাতে তুলে দিয়ে সেদিন কেটে পড়ল।

যে বাবুদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস করতে তার ঘোরতর আপত্তি সেই বাবুদের দুজন দুপাশ থেকে ক্রমে তাকে ঘেরাও করছে। একজন তার সহকারীরূপে, অন্যজন তার মালবাবু হিসাবে। সে সামনের স্টিয়ারিংএর মত কণ্ট্রোল হুইলে মোচড় মেরে বলল রঞ্জিতকে—যে হাতে ভ্যালাইএর ঝাণ্ডা উড়বে, সেই হাতে উঠেছে মালবাবুর ফাইল—এটা কী ভাল দেখাচ্ছে?—কণ্ঠে মুরুব্বিয়ানা।

ভাগ্যিস আগের থেকে বুদ্ধু ওস্তাদের মেজাজ ও ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল রঞ্জিতের।

॥ দুই ॥

গলির মুখে বেশ কিছুদিন যাবৎ রাণীদিদিমণির চটির চট্‌চট্‌ আওয়াজ উঠছে না।

প্রায় দুবছর পূর্বে চোখে ছানি পড়ার সূত্রপাত হয়েছিল। ইদানীং দৃষ্টিশক্তি এতই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে তিনি প্রায় অচল। ডাক্তারেরা বলেছেন—ছানি কাটার সময় হতে এখনও কম্‌সে কম একমাস লাগবে। এই সময়টা শরীরের শক্তি থাকতেও স্থবিরেব মত তাঁকে বসে থাকতে হবে।

দিদিমণি একলা। কিন্তু এমন দুঃসহ একাকিত্ব তাঁর জীবনে কদাপি আসে নি আগে। কী কদর্যই লাগে!

জানালার পশ্চিম দিকে খানিকটা খোলা জায়গা। তার পর রাস্তা। তাপ পর চলে গেছে একটা গলি সোজা পশ্চিমে—গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে।

আগে জানালার পাশে বসে সূর্যাস্তের রং দেখতেন মুগ্ধ হয়ে। এখন জানালার ধারে বসেন কিন্তু সূর্যাস্তের রঙের ঐশ্বর্য আর চোখে ধরা পড়ে না। মাসে মাসে মন কেঁপে ওঠে—অস্ত্রোপচারের পর আবার দৃষ্টির আলো ফিরে পাবেন তো!

তাঁর চোখের অসুখ বৃদ্ধি পেয়েছে সীতার হাসপাতালে ট্রেনিংএ যোগ দেবার অব্যবহিত পর। রঞ্জিতও তখন চাকরিতে বাহাল হয়নি। তাই অবকাশ বেশী ছিল। এবং ঘন ঘন আসত।

সপ্তাহ দুয়েক হল রঞ্জিত তার আসাযাওয়া কমিয়েছে। রাণীদিদিমণি তার চাকরির কথা জানেন না। তাঁর ধারনা পড়াশুনার চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ তিনি জানেন রঞ্জিতের এবছরই ফাইনাল পরীক্ষা।

কিন্তু শনিবার বিকালে রঞ্জিতের আসার ব্যতিক্রম হয়নি এখনও। তার সঙ্গে আসে সীতা। রাত্রিটা সীতা মণিমার কাছে কাটায়। পরদিন সকাল বেলা বাড়ী যায়। গোটা রবিবার কাটে বাড়ীতে। তারপর সোমবার থেকে টানা শনিবার পর্যন্ত আবার হাসপাতালে। মণিমার চোখের অসুখের ফলে এ ব্যবস্থাটা হালফিল।

রাত্রিবেলা ছোট স্টোভে রান্না করে মণিমাকে খাওয়ায় সীতা। দু'একদিন রঞ্জিতেরও নিমন্ত্রণ থাকে। এদিনটা ঝি এর ছুটি। মণিমা বলেন—ভাগ্যিস চোখের মাথা খেয়েছি—তাই তোকে একটা রাত্তির কাছে পাই।

দিদিমণির কণ্ঠে প্রকাশ্যে এরকম স্নেহাতুর কথাবার্তা সীতার কানে নেহাৎ তালভঙ্গের মত শোনায়।

এই শনিবারের বিকেল আর রাত্রি! বাস্তবিক কি ভালই না লাগে এই নিঃসঙ্গ অবস্থায়! ওরা ছুটিতে সেদিন একত্রে আসে। একত্রে ওদের দুজনকে দেখতে বেশ লাগে মণিমার। চোখে আবছা দেখেন। বাকীটুকু কল্পনায় ভরাট করে নেন।

ভবভূতিবাবুর কথাও ভাবেন। বলেন মেয়েকে,—তোর বাবার অসুখ আর আমার চোখ, এরা কেমন পরামর্শ করে এসেছে দেখিছিস। পাছে আমি তোর বাবাকে দেখতে যাই, কিম্বা তোর বাবা আমাকে দেখতে আসে। বিধাতার চক্রান্তটা বোঝ্।

দিদিমণির অসুস্থতার সূত্রে অনেকেই তাঁকে সাহায্য করতে আসেন। তাঁর শিক্ষিকা সহকর্মীরা, ছাত্রীরা, এমনকি রাজা বসাকের ভ্রাতুষ্পুত্র অজয়ও। কিন্তু রাণীদিদিমণির পক্ষপাত ইদানীং অন্যত্র।

রঞ্জিতকে কথাপ্রসঙ্গে বলেন—দেখ রঞ্জিত, সীতার মাস্টারকে যা করতে বলতে পারি, ওদের কী তা বলা সাজে!

রঞ্জিত বিস্মিত হয়। বলে—সে কি কথা মণিমা! আমার তো মনে হয়, ওদের ওপরও আপনার দাবি সমান শোভন। কারণ ওরাও আপনার শুভানুধ্যায়ী।

ম্লান একটু হেসে, ভ্রূর উপর হাত দিয়ে ক্ষীয়মাণ দৃষ্টিপাতকে আলো থেকে বাঁচিয়ে, সংহত করে তাকানোর চেষ্টা করেন। তারপর ধীরে ধীরে একটু আবেগপীড়িত স্বরে বলেন—শুধু অক্ষম হয়ে পড়েছি বলেই কী সবার কাছে সবরকম দাবি করার অধিকার জন্মায় রঞ্জিত!

—ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা। বেশ বলেন। হঠাৎ শেষে এসে এমন করে সব কথার লজিক ছিঁড়ে ফেলেন যে···

—যে ফেমিনিন ভাইস দেখতে পাও, এইতো?—মুখের কথা কেড়ে নেন দিদিমণি।

নিজের সৃষ্ট ভারী বাতাসটা কি ভেবে নিজেই অকস্মাৎ হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করেন। প্রথম পরিচয়ের সময় কি কুক্ষণেই শব্দটা উচ্চারণ করেছিল। একটু কুণ্ঠিত হাসি হেসে রঞ্জিত বলে,—সত্যি কথা বলতে কি, পাই। নইলে সবাইকে ছোট করে, শুধু সীতার মাস্টার হবার কোয়ালিফিকেশানটা বড় হয়ে ওঠে কোন্ যুক্তিতে বলুন তো।

ঝঙ্কার তুলে হাসেন দিদিমণি। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, পাণ্ডুর একফালি হাসি। আর রঞ্জিতের মনে হয় এ যেন মণি মা নন—অন্য কোন তরুণীর কণ্ঠলাঞ্ছিত হাসির ঝঙ্কার। মণিমার হাসির ঝঙ্কারের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রাণ-প্রাচুর্যের এ দীপ্তির ঝলক কোথা থেকে আসে রঞ্জিত ভেবে পায় না।

এমন সময় ঝি এসে পড়ে। নইলে দিদিমণি অত্যন্ত ঘরের লোকের মত রঞ্জিতকে স্টোভ ধরিয়ে চা করতে বলেন। রঞ্জিত চা করে। দিদিমণি চা খেতে খেতে বলেন—বুড়ো হয়েছি। একটু বেশী বক্ বক্ করি। অনেক অবান্তর কথাও হয়ত বলি। তবু সত্যি কথা বলতে কি—তোমার উপর যেমন নির্ভর করতে পারি, এমনটি যেন আর কারও উপর আসে না। এর আর কেন জিজ্ঞাসা করো না মাস্টার। বিশ্বাস কর ইচ্ছে করে আমি অন্য কাউকে ছোট করতে চাই না।

মাস্টার অগত্যা গম্ভীর হয়ে যায়। সত্যিকারের কিছু বলারও থাকে না এর পর। তারপর উঠে পড়ে। এমনি করে এক অবিশ্বাস্য সাম্য গড়ে ওঠে এই দুই অসম বয়সীর বন্ধুত্বে। অত্যন্ত অল্প সময়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে উভয়ের সম্পর্ক।

ওদের পরিচয়ের সূত্রপাত সূত্রাকারে যত নিবিড় হয়ে উঠছে তত নিশ্চিতভাবে আর একটি বস্তু রঞ্জিত অনুভব করছে। রাণীর সঙ্গে যতটুকু পরিচয় এইটুকুই তাঁর সব নয়। তাঁর জীবনের চারপাশ ঘিরে রয়েছে এক শক্ত তৈরী করা আবরণ। আর সে আবরণের তলাকার রহস্যের এক দুর্নিবার কৌতূহলও তাকে রাণীর প্রতি টানছে সবেগে।

তবু পরিপূর্ণভাবে কোন মানুষকে যদি জানার কথা ওঠে তো বলতে হয় —সংসারে ক'জনাকেই বা ক'জন জানে ষোল আনা। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের পরিচয়ই তো সেদিক থেকে আংশিক। কিছু না কিছু আবরণ সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী এবং স্বাভাবিকও। তার আড়ালে পরম ঘনিষ্ঠতমেরও কিছু না কিছু-না দেখতে পাওয়া দিক অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। এ সীমাবদ্ধতার কথা মানুষ বোঝে না এমন নয়। তবুও সামগ্রিক পরিচয় করায়ত্ত করার অসম্ভব প্রচেষ্টায় তার বিরাম নেই।

মণিমা-সীতা সাক্ষাৎকার এই একই কারণে রঞ্জিতের দৃষ্টিতে ভারী মজাদার। উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে রঞ্জিতের কাছে যথেষ্ট প্রাণ খুলে ব্যবহার করেন। কিন্তু ওঁদের দুজনকার মধ্যে যখন দেখা হয়—হঠাৎ ওঁদের ব্যবহার সংকুচিত হয়ে ওঠে। পরস্পর তাঁরা তা জানতেও পারেন না।

মণিমা হঠাৎ মুখে রুক্ষতা এনে বলেন—কাজকর্ম মন দিয়ে শিখছিস্ তো ?

কিছুক্ষণ পূর্বে সীতার মুখে হয়ত খই ফুটছিল। সে হঠাৎ নখ খুটতে শুরু করে দেয়। মুখ কাচুমাচু করে বলে—হাঁ মণিমা।

রঞ্জিত একবার ভাবে—এমন একটা মন্তব্য করব যাতে ওঁদের এই ছদ্মবেশ পরস্পরের কাছে কিঞ্চিৎ শিথিল হয়। কিন্তু তা না করে শেষ পর্যন্ত উপভোগ করে আর মৃদু হাসে। মনে মনে ভাবে—এঁরা উভয়েই আসলে কত সাবলীল। অথচ এই মুহূর্তে পরস্পরের মধ্যে আড়াল সৃষ্টির কি দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা। একান্ত বশংবদ স্নেহাস্পদা মেয়ে ছাড়া সীতার অন্তরূপের সঙ্গে যেমন মণিমার পরিচয় লাভ ঘটল না, তেমনি সীতাও নেহাৎ রুক্ষভাষী একজন গুরুজন ছাড়া মণিমার মহিমাময়ী নারী মানসের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পেল না। বেচারীরা !

রঞ্জিত-সীতা বন্ধুত্বের মধ্যেও সাম্য বেড়েছে অনেকখানি তা একটু লক্ষ্য করলেই নজরে পড়ে।

সীতা শনিবার বিকালে হোস্টেলে রঞ্জিতের জন্য অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মণিমাকে দেখতে আসার জন্য সে একাই যথেষ্ট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রঞ্জিতকে বাহন না করে কোনদিনই এযাবৎ বেরিয়ে উঠতে পারল না। বাহন না করলেও যে রঞ্জিত খুশী হত এমন কথা আজ আর হলফ করে বলা চলে না।

সেদিন কারখানা থেকে সোজা বেরিয়ে সে চলে গেল হাসপাতালে। তারপর রাস্তায় আসতে আসতে অনুযোগও তুলল—তুমি স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য চাকরি করতে পার—আর একলা আসতে পারো না ?

সীতারও কথা ফুটেছে ইদানীং। সে জবাব দিলো—কেন, শোনেননি, মেয়েরা অবলম্বন পেলে অক্ষম হয়ে পড়ে।

রঞ্জিতও কথার পিঠে কথার জাল বোনার মোহে মেতে উঠলো—চাকরি জিনিসটা দেখছি, শুধু চেহারাকেই স্মার্ট করে না, আলাপকেও ধারালো করে। তবু তো সবে ট্রেনিং।

—আচ্ছা আমার চাকরির উপর আপনার অত হিংসে কিসের বলতে পারেন ?

—তুমি বুঝি জান না মেয়েদের চাকরি বাকরি করায় ছেলেদের ভীষণ হিংসে হচ্ছে আজকাল।

মণিমার চৌকাঠ এসে যায়। কথায় কথায় অতিঅল্প সময়ে পথ ফুরিয়ে যায়। আলাপের অন্ততঃ শেষাংশ মণিমার কর্ণগোচর হয়েছে শীঘ্রই তার নিশানা মেলে। তিনি বলেন—কিসের হিংসের কথা, মাস্টার।

রঞ্জিত ঘরের মধ্যে উঠে পড়ে। তার পেছন পেছন সীতাও।

—মেয়েদের চাকরি করার প্রতি ছেলেদের হিংসের কথা।

—সে আবার কী! —মণিমা অবাক হন। মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়ায় ছেলেদেরই তো বোঝা কমে। তাদের হিংসে হতে যাবে কোন্ দুঃখে! কে, সীতা বলছিল বুঝি?

—না আমি।—রঞ্জিত সোজা গিয়ে জানালার কাছের চেয়ার অধিকার করে।

মণিমা উত্তর শুনে আরও থ হয়ে গেলেন। বললেন—বল কি, তুমি বলছিলে? তা তোমার এ বুদ্ধি হতে গেল কেন?

ছদ্ম গাম্ভীর্য বজায় রেখে উত্তর দিল রঞ্জিত—এক নম্বর এবং প্রধান নম্বর, হেঁসেল সামলাবে কে! দুই নম্বর—ছেলে বেকারের সংখ্যা বাড়বে।

সীতা হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো। এতক্ষণে মণিমা বোধ হয় বক্তব্যের মূল সুর ধরতে পারলেন, তাই সহসা গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিন্তু মনে মনে পুলকিত হলেন না—একথা হলফ করে বলা চলে না।

সীতা জবাব দিলো ধীরে ধীরে—মাইনে দিয়ে হেঁসেল সামলানোর লোক রাখবে। আর ছেলে বেকার বাড়বে বলে মেয়েরা বুঝি আজন্মকাল বেকার কাটাবে। ওঃ সে স্যাকৃরিফাইসের যুগ উল্টে গেছে—বলুন মণিমা?

রঞ্জিত খুশী হল। সীতা মণিমাকে অস্বাভাবিক সমীহ করে কথা বলার হাত কাটিয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

মণিমা আন্দাজে আন্দাজে উঠে আলো জ্বাললেন সুইচ টিপে। সীতা শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালো—আমায় বললেই তো পারতেন মণিমা।

মণিমা বললেন—আমি এখনও একেবারে অন্ধ হয়ে যাইনি যে আলো জ্বালাতেও অন্যের সাহায্য নিতে হবে।

বাইরে মোটরের হর্ণ বাজলো। সীতাকে বললেন মণিমা—দেখ তো সীতা। অজয়বাবুর আসার কথা।

—অজয় বাবু এখানেও আসেন!—সীতার চঞ্চলতা হঠাৎ ঝিম মারল।

—ক্যাপ্টেন বসাক নিজে আসলেই কী তাই খুশী হোস?

এরপর আর কথা চলে না। সীতা চুপ করে যায়। মণিমা কৈফিয়ৎ দেবার সুরে বলে যান—তবু অজয়বাবু আসেন তত্ত্ব নিতে। নইলে ডাঃ লাহিড়ীর মত চোখের সার্জেনকে চোখ দেখানো কী আর আমার মত লোকের কপালে জুটতো?

সীতা কথা না বলে পারল না ; বলল—ডাঃ লাহিড়ীর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই এমন নয়। আমাকে তো আপনি বলেন নি একদিনও।

মণিমার কণ্ঠে বিরক্তির স্বর ছুঁয়ে গেল—তাও তোকে বলে হুশ করিয়ে দিতে হবে নাকি। যাক তাতে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি। তুই এগিয়ে দেখ তো—ওই বোধ হয় এসে পড়লেন এতক্ষণে—

সীতা দরজায় দাঁড়ালো।—আসুন অজয়বাবু—

অজয় ভিতরে প্রবেশ করলো।

পরনে দাম স্যুট। তার সঙ্গে অজয়ের চৌকস চেহারার জৌলুস যেন মণিমার ঘরের পক্ষে বেমানান।

ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় চেয়ার না থাকায় সীতা মুশ্‌কিলে পড়ল প্রথমটা। তারপর বুদ্ধি করে রঞ্জিতের কাছে গিয়ে কড়া হুকুমের মত স্বরে বলল—উঠুন তো। যান খাটের ওপর গিয়ে বসুন।

রঞ্জিত উঠে দাঁড়ালো এবং আড় চোখে তাকালো সীতার মুখের পানে। ক্ষুণ্ণ হল কী না বোঝা গেল না। নিঃশব্দে আদেশ প্রতিপালন করল। মণিমার খাটের বাজুতে হাত দিয়ে বসল।

অজয় দেখল। কিন্তু পরিচয় জিজ্ঞাসা করল না।

চেয়ারে গিয়ে আসন গ্রহণ করে সীতাকে জিজ্ঞাসা করল—আপনি এখানে?

—হাঁ—খুব সংক্ষেপে উত্তর দিল সীতা।

—আমি ওদিকে আপনার হোস্টেল গিয়েছিলাম এবেলা।

—ও গিয়েছিলেন বুঝি?—শশব্যস্তে সীতা শুধালো।

—হাঁ, কিন্তু ডিস্‌অ্যাপয়েণ্টেড। আপনার বান্ধবীরা বললেন, আপনি পালিয়েছেন।

—খুব প্রয়োজন হয়েছিল বোধ হয়।

—তা খুব প্রয়োজন বলা চলে বৈ কী। আমার এখানে আসার কথা আজ। ভাবলাম আপনাকে অবাক করে তুলে নিয়ে একসঙ্গে এখানে আসবো।

সীতা মাথা নীচু করল। বলল—তা আপনাকেই অবাক হতে হবে শেষটা ভাবেননি। আপনাকে ডিস্‌অ্যাপয়েণ্টেড হতে হল বলে দুঃখপ্রকাশ করছি।

রঞ্জিত নীরবে শুনছিল। মণিমাও কিছু বলছিলেন না। হঠাৎ সীতাকে উদ্দেশ করে বললেন—যা সীতা, বেশী না বকিয়ে, স্টোভ ধরিয়ে একটু খাবার আর চা কর্। অজয়বাবু অনেকদিন পরে এলেন। রঞ্জিতও চা খায়নি।

রঞ্জিত পাশে এসে বসেছে খেয়ালই করেন নি এতক্ষণ। খেয়াল হল, রঞ্জিত ও অজয় যখন আকস্মিক একই সঙ্গে, স্টোভ ধরানোয় আপত্তি জ্ঞাপন করলো।

মণিমার মনে পড়ল রঞ্জিত অজয়ে পরিচয় নেই। বললেন—রঞ্জিত এস তোমার সঙ্গে অজয়বাবুর পরিচয় করিয়ে দি।

রঞ্জিত বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ না করায় সীতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে রঞ্জিতের ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। বলল—আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

রঞ্জিতের ভব্যতা জ্ঞান প্রখর না হলেও ভোঁতা নয়। সে এবার আর উঠে না দাঁড়িয়ে পারল না। অজয়ের পানে মুখ করে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে নিজের পরিচয় নিজেই দিতে শুরু করল—আমি রঞ্জিত চৌধুরী……

সীতা যোগ করল—আমার মাস্টার মশাই।

তৎসহ মণিমা যুক্ত করলেন—কিন্তু ঘরের লোক—

অজয় একটু বিব্রত হাসিতে মুখ কোঁচকালো। তারপর সীতা অজয়ের পরিচয় জানালো—ইনি অজয় বসাক। আমার চাকরিদাতা।—অজয়ের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করলো দেখে খেয়াল হলো কথাটা শোভন হয় নি। চট করে কণ্ঠস্বর সিরিয়াস করে ভুল সংশোধন করতে বসল—অর্থাৎ আমার অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, হাসপাতালে চাকরি যেটুকু জুটেছে তার মূলে ইনি। তাছাড়া ইনি কম্বাইন্ড কোর্সের ছাত্রও একজন।

অজয় বিপন্ন বোধ করল। কিছুই বলল না। শুধু হাত তুলে নমস্কার জানালো। রঞ্জিতও খুব খুশী হতে পারল বলে বোধ হয় না।

কিছুক্ষণের মধ্যে এপরিবেশ কেন যেন তার বিশ্রী লাগতে লাগল। তার মনে হতে লাগলো বাজে বাজে সময় নষ্ট হচ্ছে কেবল। সীতার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় বাড়ানোয় আপাততঃ কোন স্বার্থ সে দেখছে না। আগ্রহও বোধ করছে না তেমন।

চাকরিদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধের প্রয়োজন সীতা ও মণিমার পক্ষে অপরিহার্য হলেও তার পক্ষে নয়। ওদিকে কী সব কথাবার্তা হচ্ছে তার কানেও যাচ্ছিল না। হঠাৎ এক হেচ্‌কায় উঠে দাঁড়ালো।

—ভীষণ একটা জরুরী কাজ আছে। আমি চললাম।—তারপর কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা না করে বিদ্যুৎ বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। পেছনে সীতা ও মণিমা কী যেন বাধা দিয়ে বলছিলেন। সে কথা কানেও ঢুকল না তার।

নাঃ আর দেরি নয়। আজই যতীনের সঙ্গে দেখা করবে সে। কাল কাল করে যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে ইতিমধ্যে। তবে এখন এই মুহূর্তে কোন্ ঘাঁটিতে তাকে পাওয়া যাবে সে নিশ্চিত করে বলতে পারে না। দরকার হলে সে এক এক করে প্রত্যেক ঘাঁটিতে ঢুঁ মারবে—হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠল যেন।

ক'দিন ইউনিয়ন অফিসে গিয়েও পাত্তা পায় নি। তাই সেখানে ঢুঁ মারার প্ল্যান করল সবার শেষে।

অনেক ভেবে চিন্তে 'চাবুক' কাগজের আপিসে হাজির হল সর্বপ্রথম। বাংলা দেশের একখানি খ্যাতনামা প্রগতিশীল মাসিক সাহিত্যপত্র 'চাবুক'। একে ঘিরে প্রাত্যহিক সান্ধ্য মজলিস বসে। সম্পাদক রথীন রক্ষিত এই সান্ধ্য মসলিসের নামকরণ করেছেন ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল আড্ডা। প্রতি শনিবার এ মজলিসের বৈঠক জমজমাট হয়ে ওঠে বিভিন্ন বিষয়ের দিক্‌পালদের আগমনে। যতীনও মজলিসের মতে একজন দিকপাল হিসাবে গণ্য। অতএব তারও আসার কথা আজ।

রঞ্জিতকে এ মহলে বিশেষ কেউ চেনে না। কিন্তু রথীন রক্ষিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনকার—তার কবিতা রচনাকে কেন্দ্র করে। ভদ্রলোকের স্বভাবটি বড় মধুর—অত্যন্ত সদালাপী এবং ব্যঙ্গরসিক।

রঞ্জিত যখন উপস্থিত হল তখন আসর জাগাতে মাত্র জন চারেক উপস্থিত আছে। একটা ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে রথীন রক্ষিত বিড়ি ফুকছে। গায়ের আধ ময়লা খদ্দরের জামাটি খুলে ইজি চেয়ারের পেছনে ঝোলানো।

কলেজ স্ট্রীট মহল্লার একটা ঘিঞ্জি গলির শেষ প্রান্তে বাড়ীখানা। ঘরটা চিলে কোঠায়। বাইরের দিকের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। একতলায় প্রেস। গোটা ছাদটা গরমকালে মজলিস কিংবা সভাসমিতির প্রয়োজনে ব্যবহার করা চলে। ঘরটা ছোট। আসবাব ও সামান্য। আধভাঙ্গা চেয়ার টেবিল বেঞ্চি আর সস্তা র‍্যাকে কিছু ফাইল। তা ছাড়া টলস্টয় থেকে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রমুখ দেশী বিদেশী মনীষীদের কিছু ছবি টাঙানো। ছবিগুলোয় পুরু হয়ে ধুলো জমেছে। ঘরের মেঝেয় পোড়া বিড়ি আর সিগারেটের টুকরো ইতস্তত: ছড়ানো।

ওকে দেখে রথীন রক্ষিত সোজা হয়ে বসে নিল।

—আরে রঞ্জিত যে এসো এসো। কোথায় থাক আজকাল একদম পাত্তা নেই—

—যতীন দা এখানে আসেন আজকাল?

—আসেন আজকাল মানে? না এলে শ্রমিক দপ্তরের পাতা লিখবে কে?—তা

সে হবে 'খন। তুমি বস, একটু জিরিয়ে নাও। একটা চেয়ার ঠেলে দিল রথীন রক্ষিত। তারপর হঠাৎ বিড়ির বাক্স খুলে এগিয়ে ধরল—খাও, বিড়ি খাও—

রঞ্জিত বলল—আমি স্মোক করি না।

—খুব খারাপ কথা—গম্ভীরভাবে বলে বিড়ির বাক্স বন্ধ করল খপ করে। তারপর ঝোলানো জামার পকেটে বিড়ির বাক্স ঢোকালো। নিজে নতুন আর একটা বিড়ি ধরালো—এক গাল ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর বলল—দুনিয়ার প্রকৃত সত্যের সঙ্গেই তোমার পরিচয় ঘটল না। আর সেইজন্যই বোধ হয় ইদানীং কবিতা বের হচ্ছে না তোমার কলমে।

বসে নিল রঞ্জিত, হেসে ফেললো—কী রকম ?

—দেখ, সৃষ্টির চরম সত্য হচ্ছে এই স্মোক, এই ধোঁয়া। এই সত্যোপলব্ধির জন্যই স্মোকিং অপরিহার্য বুঝলে হে রঞ্জিত।

রথীনের কথায় হাসির কলরব উঠল খানিক।

পাশের ভদ্রলোক সিনেমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রথীনের বন্ধু এবং চাবুকের সিনেমা বিভাগের সম্পাদক। ছত্রিশ পাতা কাগজের এইরূপ ছত্রিশটি বিভাগের ছত্রিশজন বিভাগীয় সম্পাদক আছেন। তাঁরা আসলে যাই হোন, সেই সেই বিভাগের বিশেষজ্ঞ বলেই রথীনের দপ্তরে গণ্য। আপাততঃ অন্যান্যেরা অনুপস্থিত। শুধু সিনেমা, অর্থনীতি ও কিশোর বিভাগ উপস্থিত আছেন।

হাসির কলরব শেষ হতেই সিনেমা বললেন খুব সিরিয়াস ভাবে—গুড ডায়লগ।

সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি বিভাগও যেন কি একটা মন্তব্য করলেন।

রঞ্জিত এসব কথায় তেমন মনোযোগ না দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল—আপনি নিশ্চিন্ত তো—যতীন দা আসবেন—নইলে মিছিমিছি বসে থেকে লাভ কী!—যতীন মিস্তিরের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত সে ঠিক স্থির থাকতে পারছে না যেন।

রথীন রক্ষিত জামার হাতা গোটালো। নাকের উপর নেমে আসা চশমা চোখের উপর ঠেলে দিল; তারপর কী বলতে যাচ্ছিলো। দরজা দিয়ে যতীন ঢুকলো।

একটু থেমে রঞ্জিতকে উদ্দেশ করলো রথীন—এখন বিশ্বাস কর, আমি ম্যাজিক জানি।

তারপর যতীনকে বলল—এই যে যতীন—তোমার বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে রঞ্জিত তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

যতীন ঈষৎ হাসলো। রঞ্জিতের পাশের চেয়ারে বসল। পিঠে হাত দিল—কেমন আছ।

রঞ্জিত উত্তর দিতে গিয়ে দেখল যতীন ততক্ষণে রথীনের সঙ্গে কথা শুরু করে দিয়েছে।

—আগামী ১৫ই মাননীয় রাজমন্ত্রী কলকাতা সফরে আসছেন—এ সংবাদ সু-নির্ধারিত সংবাদ তা জানা।

—আসছেন নাকি—রথীন নির্লিপ্ত ভাবে বলল।

—আসছেন বণিক সংস্থার বাৎসরিক সভার উদ্বোধন করতে অন্যান্য বারের মতই। এ সভার মাধ্যমে রাষ্ট্রের কর্মনীতির আভাষ পাওয়া যায়। এবারও পাওয়া যাবে।

—খুবই স্বাভাবিক।

—এবার তো দেশের সামনে তোমাদের বহুপ্রচারিত সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনার কর্মকাণ্ডই রয়েছে।

—হুঁ হুঁ। তুমি বলে যাও, আমি মাঝে মাঝে হুঁ করবো। যতীন না হেসে থাকতে পারলো না। —তা যে হারে বিভাগীয় সম্পাদক চড়াচ্ছো, তাতে হুঁ করা ছাড়া বিশেষ কিছু কাজ তোমার বাকী থাকারও কথা নয়।

ফোঁস করে উঠলে রথীন—তা তো বলবেই চাঁদ। তোমরা তো লিখেই খালাস। কোথা থেকে জল ওঠে টেরটি পাও না। একটা কাগজ চালাতে গেলে, তার টাকা, বিজ্ঞাপন, তার সেন্সার, তার লিখিয়েদের থেকে বিনি পয়সায় লেখা সংগ্রহ—এ সব ঝামেলা তো আর সামাল দিতে হয় না।

—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ ; আমার উক্তি আমি প্রত্যাহার করছি।

—বেশ তাহলে যা বলছিলে বল। আচ্ছা তোমার সপ্তবার্ষিকী প্ল্যানের আইডিয়াটা একটু পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে বল তো শুনি। আমার তো মনে হয় প্ল্যানটায় বেশ মৌলিকত্ব, বেশ একটা স্বকীয়তার ছাপ রয়েছে।

আসলে রথীন রক্ষিত যতীনকে খু চিয়ে একটা সারগর্ভ আলোচনা তোলার চেষ্টা করছিলো।

এদিকে ব্যাখ্যা শুরুতে বিলম্ব দেখে সিনেমা বিভাগ মশাই আর চুপ থাকতে পারলেন না। জানালেন—মোটের উপর এ সব ব্যাপার নিয়ে আপনি চর্চা করেন তাই বলা। নইলে কী আর কোন উটকো লোককে বলা হয়েছে ব্যাখ্যা করতে। যেমন আমার সাবজেক্ট সিনেমা। আমাকে রথীনদা বলুন আমার সাবজেক্টের

অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয়ের একটা ব্যাখ্যা দিতে—তার পর রথীনের পানে তাকিয়ে দেখলো।

যতীন পিট পিট করতে লাগলো চোখ। রথীন মুচকি হেসে শুধালো—কি রকম তৈরী হয়েছে বল।

যতীন গোঁচে তা দিল দুবার। তারপর বলল অদ্ভুত—কিন্তু ব্যাখ্যা খুব সহজ! অদ্ভুত কথাটার উদ্দেশ্য বোঝা দুরূহ বলে সিনেমা বিভাগ আর ঘাঁটালো না। তারপর আবার শুরু করল—খুব সহজ। কারণ আইডিয়ায় আর নামে রাশিয়ার অনুকরণ অত্যন্ত পরিষ্কার। সঙ্গে সঙ্গে রথান চেপে ধরল সোজা হয়ে বসে নিয়ে। —ব্যস্, ব্যস্। ধর এটাই তোমার এবারকার লেখার বিষয়বস্তু। কোন আপত্তি চলবে না।

বিড়িটা নিভে গেছল। নেভা বিড়িতে এবার নিয়ে চতুর্থ দেশলাই কাঠি খরচ করল।—তবে হাঁ, সব দিক কিন্তু বাঁচিয়ে লিখতে হবে।

যতীন সে কথার উত্তর দিল না। বলল—একটা বিড়িতে যদি একটা গোটা দেশলাই-ই খরচ করতে হয়, তাহলে বিড়ি খেয়ে সুরাহা কি। সিগরেট খেলেই তো পার।

রথানও বেমালুম প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল,—আচ্ছা সব চাইতে অভিমানী কে বলতে পার যতীন মিত্তির?

বিরক্ত হল যতীন। —না।

অগত্যা রঞ্জিতকে জিজ্ঞাসা করল—কবি রঞ্জিত তুমি কি বল। অবশ্যি তুমি কী বলবে আমি জানি।

—জানেন নাকি! তাহলে শুনিয়ে দিন। আপনার মুখে আমার মনের কথা শোনা যাক।

—তুমি বলবে প্রিয়া। কিন্তু কবি রঞ্জিত, আসলে বিড়ির চেয়ে অভিমানী প্রিয়াও নয়। সে কথা জানে বিড়ি-পিয়াসীরা হাড়ে হাড়ে। তাই বিড়িত্যাগী হয়ে সিগরেট খাওয়ার কথা তারা কল্পনাও করতে পারে না।

গোঁফ নাচিয়ে হেসে ফেলল যতীন—বিস্ফারিত হাসি।

—কি রকম?

—শি উইল এক্সটিংগুইশ হারসেল্ফ্ ইফ ইউ ডু নট কিস্ হার অফন। অবিরত চুম্বন বিহনে সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, নিভে যায়।

আবার উচ্চকিত হাসিতে ভরে উঠল ঘর। কিন্তু যতীন উঠে দাঁড়ালো—আর

বসব না ভাই। রঞ্জিত বেচারা আমার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে আছে।

চক্রাকারে বিড়ি টেনে যেতে লাগল সকলে। আসরের ভিড়ও টুক্ টুক্ করে ভারী হয়ে উঠেছে বেশ।

—যাবে যাও। তবে রঞ্জিত—পরের সংখ্যার জন্য একখানা কবিতা পাঠিও ভাই।

রঞ্জিত আমতা আমতা করে বললে—অনেক দিন লিখি না। কী ছাই যে লিখব ভেবে পাই না।

—তোমার অনুবাদ টনুবাদ ছেড়ে এবার একটু অরিজিন্যাল টরিজিন্যাল ধর হে। বেশ একটু ব্যঙ্গরস মেশানো কিছু লেখ। যেমন ধর—

প্রিয়ার চেয়ে অভিমানী বিড়ি,
চুমোয় চুমোয় স্বর্গে যাবার সিঁড়ি।

ইত্যাদি ধরনের একটা কিছু। আইডিয়া তো পেলে। আসর জমাতে মাঝে মাঝে এসো এখানে। আইডিয়ার অভাব হবে না।

যতীন টেনে বার করে নিয়ে এল রঞ্জিতকে। রঞ্জিত বলল—একটু অভদ্রতা হল না? বিদায় সম্ভাষণটা পর্যন্ত ভালভাবে জানাতে দিলে না।

—বেশী বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে কাজ নেই। এই ইনটেলেক্চুয়াল আড্ডার কাদায় আটকে মারা পড়বে নাকি অকালে।

বেচারী যতীন মিত্তির। জানে না এর চেয়ে কত গম্ভীর কর্দমে রঞ্জিত চতুর্দিক থেকে আবদ্ধপ্রায়।

॥ তিন ॥

পরদিন রবিবার। অতএব চাকরি নেই রঞ্জিতের। কিন্তু অনাহারী তত্ত্ব নেবার কাজের অভাব নেই। বঙ্কিমের বাড়ীতে দিনাতিপাত। এবং বর্তমানে সন্ধ্যাতিপাত মণিমাকে সাহচর্যদানে।

বঙ্কিমের বাড়ীতে সীতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই উক্ত বাক্য-বিনিময়ের উত্তেজক মাধ্যমে কিঞ্চিৎ অশান্তির উদ্রেক হল।

সীতা বলল—ওরকম অশোভনভাবে চলে এলেন কেন বলুন তো কাল?

রঞ্জিতও উষ্মার সঙ্গে জবাব করল—ওখানে বসে থাকার চেয়ে একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেল তাই।

—ভদ্রলোক কী মনে করলেন ভেবে দেখেছেন?

—ভদ্রলোকের যা নমুনা পাওয়া গেল—তাতে আমারই তো মনে করবার কথা। তাছাড়া তোমার চাকরিদাতা অসন্তুষ্ট হলে আমার তো কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তবে তোমার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে খোলাখুলি সেকথা তুমি জানাতে পার—আমি গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসতে প্রস্তুত আছি।—খুঁচিয়ে রাগানোর লোভ হল রঞ্জিতের।

—ওঃ খুব পরোপকারী হয়েছেন! আপনি কী সত্যিই ঝগড়া করতে চান নাকি?

—কার সঙ্গে?—রঞ্জিত হাসতে লাগল।

ভ্রূর পাশের কাটা দাগটা রঞ্জিতের হাসির সময় কোঁচকায়। এই সময় কিন্তু বেশ লাগে দেখতে রঞ্জিতকে। সীতা তাকিয়ে দেখে। উদ্ধত নাকের দুধার রক্তাভ হয়ে উঠছে সঙ্গে সঙ্গে।

—কী দেখছ?—রঞ্জিত জিজ্ঞাসা করল।

লজ্জা পেয়ে গেল সীতা। বলল—ঝগড়া তো দূরের কথা, মারামারিও করতে পারেন আপনি। ভ্রূর পাশে শান্ত ছেলের যা লক্ষণ!

—দিব্যি গার্জিয়ানের মত কথাবার্তা বলছ যে আজ। ব্যাপার কী?

মুচকি হাসল সীতা।—কী আবার ব্যাপার! অনেকদিন মাস্টার মশাই হিসাবে খাতির করেছি। হিসাব করে দেখলাম—আর নয়। এখন কিছুদিন আপনার ওপর মাস্টারি না করলে আর চলছে না।

—অর্থাৎ গুরুমারা বিদ্যে—

জবাব দিল না কিছু সীতা।

অবাকই লাগে। সেদিনকার লাজনম্র মেয়েটা এত অল্পদিনে এত মুখর হয়ে ওঠবার শক্তি সংগ্রহ করল কোথা থেকে।

—দাঁড়িয়ে না থেকে বসুন তো—সীতা চেয়ারটা ঠেলে দিল রঞ্জিতের দিকে। তারপর চলে গেল ভিতরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক রেকাবী পাঁপড় আর একবাটি কফি হাজির করে বলল অত্যন্ত সস্নেহে—

—নিন আগে মাথা ঠাণ্ডা করে নিন।

পরিস্থিতি এমন হল যে সীতার গার্জিয়ানির কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া গত্যন্তর রইল না। তেলেভাজা রঞ্জিতের প্রিয়। কফি বিশেষ মুহূর্তের বিলাস হিসাবে

সীতা ঠিক সে খবরটি রাখে। কাপে চুমুক দিয়ে পরীক্ষা করল সত্যি কিনা। তারপর সীতার পানে চেয়ে রইল প্রাক্তন মাস্টার। আর প্রাক্তন ছাত্রী প্রাক্তন মাস্টার মশাইকে জানিয়ে দিল ছাত্রশাসনের ভঙ্গিতে—হাঁ ওটা কফি।

রঞ্জিত বলল—দেখ যতীন মিত্তির আসবার কথা আছে। একটু রেখো কিন্তু। শনিবার রাত্রে যতীনের সঙ্গে যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি যে এণ্ডারসনের চাকরি আর দেশের কাজের মধ্যে কি দৃষ্টিতে সে রফা করেছে। সেদিন সময় সাব্যস্ত হয়েছে আজ সন্ধ্যা।

তেলেভাজা শেষ হলো। মুখ মুছলো। এবার কফি। বেঞ্চির এককোণে নিল সীতা। মাথার সামনের কালো চুলগুলি তার ঈষৎ কোঁকড়ানো। মাঝে মাঝে তার এক একটা ছোট ছোট গোছা কপালের উপর উড়ে নড়ে এসে পড়ছে—জানালার ভিতর ঢুকে পড়া বৈকালীন মৃদু হাওয়ায়। বারবার সরিয়ে সরিয়ে দিতেও অবাধ্য কেশগুচ্ছগুলি বাগ্ মানছে না।

জানালার দিকে দৃষ্টি পড়ে। ঠিক উপরে টাঙ্গানো বঙ্কিমের ছবিখানায় চোখ আটকায়। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সীতা। ছবিতে ঝুল পড়েছে নিয়মিত পরিষ্কার করার অভাবে।

উপরে দাদার ছবি। সজল হয়ে উঠতে চায় চোখ। আর জানালার বাইরে দূরে যশোর রোডের বড় রাস্তার বায়ুমণ্ডলের উপর একলাইনে অবস্থিত সারি সারি বাদাম আর শিশুগাছের নিচ্ছিদ্র মস্তকরাশি। সেই পরিচিত দৃশ্য। মাঝে মাঝে দু' একটা কৃষ্ণচূড়া মাথা জাগিয়ে আছে লাইনের মধ্যে। ঠিক ওদের বাড়ীর সোজা তেমনি একটা গাছ। সবুজ সারির মধ্যে নিয়মভঙ্গের মত যেন এক ফুলকি আগুন।

সবুজ সবুজ গাছ দেখতে সে ভালবাসে। তার চেয়েও ভালবাসে নিজ হাতে গাছ পুঁততে। ঐ জানালাটার ঠিক অব্যবহিত নীচে চার ফুট মাত্র মাটি—কাঠার সারা বাড়ীর মধ্যে। ঐ চার পাঁচ ফুটেই অমন চারশ রকমের ফুল আর ফলের বীজ পোঁতা নিয়ে কী কাণ্ডই না সে করেছে। দাদারও ছিল অপরিসীম উৎসাহ। একমাত্র পেঁপে গাছটাই বড় হয়েছে। সাক্ষীবহ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজ। আর সেদিনকার লাগানো শিমের চারা এরই মধ্যে তাকে ভর করে লতিয়ে লতিয়ে পেঁপে গাছের মাথাটা ছেয়ে ফেলেছে পাগড়ির মত।

বাবা বলেন, অমনি করে ভর করার লোকের অভাবে এসংসার আর লতিয়ে

উঠবে না। কারও নাম বলেন না কিন্তু ইঙ্গিত স্পষ্ট। বঙ্কিম ছেলে—কিন্তু সীতা যে মেয়ে। তাইতো কথাটা অমন করে উঠছে বাবার মনে। তা উঠুক—কিন্তু চাকরিটা পুরোপুরি শুরু করতে পারার আগে কি করে সে অপ্রমাণ করবে বাবার কথা।

বাড়ীতে ইদানীং সপ্তাহে এই একটা দিন। কতকিছু ভাবনা তাকে ভিতরে ভিতরে কাঁপায় তা কেউ জানে না। যতক্ষণ থাকে মনে হয় যেন একটা অব্যক্ত মমতায় এখানকার প্রতিটি বায়ুকণার সঙ্গে সে সংযুক্ত। অথচ এমনও দিন গেছে বাড়ীর চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী মনে হয়েছে নিজেকে। আর এখন এই একটি দিনের স্পর্শের জন্যও মন হয়েছে ওঠে আতুর।

সীতার মুখের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে হয়রান হয়ে রঞ্জিত অবশেষে জিজ্ঞাসা করল—একেবারে চুপ করে গেলে যে—

—কী বলবো বলুন—কিছুক্ষণ আগের চটুল কণ্ঠ যেন ভারাক্রান্ত শোনালো।

—কেন বেশতো বলছিলে বাপু—

পুরানো মেজাজে ফিরে আসতে খানিক সময় লাগল সীতার। কিন্তু যখন ফিরে আসল, তখন আর তার মধ্যে কোন খাদ রইল না।

বলল—তাহলে বোঝা যাচ্ছে আপনার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে এতক্ষণে।

—আচ্ছা ধরাই যাক যে হয়েছে।

সীতার গার্জিয়ানী কথাবার্তার উপর কেমন যেন একটা আলতো লোভ অনুভব করতে শুরু করেছে রঞ্জিত। কিন্তু রঞ্জিতের প্রতি সীতার প্রশ্ন অত্যন্ত উস্কানিমূলক।

—তাহলে ঠাণ্ডা মাথায় একটা নির্ভেজাল সত্যিকথা বলে ফেলুন তো মন খুলে।

চেয়ার থেকে মাথাটা চেয়ার শুদ্ধ হেলিয়ে দিলো দেয়ালে। মনের মধ্যে কেমন যেন অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন উঠছে রয়ে রয়ে—কথা ক'য়ো নাকো, শুধু শোন। শুধুই যেন শুনতে চায় সে। এ এক অদ্ভুত মেজাজ। কাউকে বলে সে বোঝাতে পারবে না।

—বাড়ীর মেয়েরা বাইরের লোকের কাছে ঘোমটা দিয়ে থাকুক সেকেলে লোকদের মত এটাই তো আপনি চান—নয়?—এবার উস্কানির ডিগ্রী আর একটু তীব্র।

রঞ্জিত মন্ত্রদেশীয়দের মত দুদিকেই মাথা হেলাল মাত্র।

—বোবার শত্রু নেই ভাবছেন নাকি—চূড়ান্ত উষ্মামিশ্রমূলক কথাবার্তা বলেও বেশ হাসতে শিখেছে সীতা।

অগত্যা মুখ খুলতেই হল। সে এক অদ্ভুত যন্ত্রণা। কথা বলার মেজাজ নেই তবু কথা বলা—যেন অনিচ্ছুক সন্তানের মুখ থেকে নির্দয়ভাবে মাতৃস্তন বিচ্ছিন্ন করা।

—তোমার কী মনে হয়?

—আমার যা মনে হয় সে তো বললাম।

—আবার রিপিট কর—মনে হচ্ছে যেন ভুলে ভুলে যাচ্ছি।

ডান হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা থুথ্ নিতে হাত দিয়ে এক অপূর্ব অবাক হওয়ার ভঙ্গিমায় সীতা বলল—ভুলে ভুলে যাচ্ছেন এরই মধ্যে? অবাক করলেন।

অপূর্ব অবাক হওয়ার ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে রইল রঞ্জিত। আসলে অবাক হওয়ার ভঙ্গিটা অপূর্ব কিনা কে জানে—কিন্তু রঞ্জিতের মনের মাধুরী দিয়ে দেখলে সে ভঙ্গিমাকে অপূর্ব বলতেই হয়।

আবার সীতা বলল—বেশ, আবার বলছি শুনুন তাহলে।

—বল।

—আপনার মনটা নেহাৎ সেকেলে। ওরকম অশোভন ভাবে উঠে আসার মূলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—জরুরী কাজের তাগিদের চাইতে সেই সেকেলে মনটার প্রভাবই বেশী।

এবার বলতেই হল কিছু—ভাবছিলাম, বাক্যেন্দ্রিয় বন্ধ রেখে শুধু শ্রবণেন্দ্রিয় খোলা রাখব। আর চোখ বুজে বুজে তোমার গর্জিয়ানি উপভোগ করবো। এমন দুর্লভ মেজাজ তুমি বরবাদ করে দিয়ে তবে ছাড়লে।—খুব শান্তভাবে বলতে বলতে সোজা হয়ে বসল রঞ্জিত। তারপর কণ্ঠের খাদ পরিবর্তন করে বলল—দেখ সীতা, মন জিনিসটা গভীর অরণ্যের চেয়েও অগম্য। সেখানে বৃথা ঢোকবার চেষ্টা নাই বা করলে।

খাদটা যে সিরিয়াসের সীতার তা বুঝতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। কিন্তু ফিক করে হেসে ফেলল। বলল—দোহাই আপনার, অত সিরিয়াস হবেন না। সিরিয়াস হলে আপনার আলাপ এমন সিনেমার সংলাপের মত শোনায়, মাথাটা আমার বেজায় মোটা মোটা লাগে। মানে বুঝতে হিমশিম খেয়ে উঠি।

রঞ্জিত রাগত কটাক্ষ হানলো। বেশ বোঝা যাচ্ছে ক্রমশঃ ক্রুদ্ধ হচ্ছে সে। সীতা আবার ফিক করে হেসে ফেলল। তারপর সেটা চাপলো। বেশ মুরুব্বি-

ম্নানার সঙ্গে বলল—আচ্ছা আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে মেয়েদের সম্পর্কে আপনার মন সেকলে নয়? আপনার মনোভাব সম্পর্কে আমার ধারণা সঠিক নয় এই তো?

রঞ্জিত এবার হতাশ হয়ে বলল—কথার জাহাজ হয়েছ দেখছি।—ক্রোশ হার খেল। আবার চেয়ারের সঙ্গে দেয়ালে ঠেস। মেয়েদের কাছে রাশ একবার শিথিল করলে যে এমন বিপদ তা কী আগে জানতো সে। সীতা যে সমান প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ সমভিত্তিতে কথা বলতে চায়—মুশ্‌কিল হয়েছে সেখানে আগেকার মাস্টারী মনোভাব বজায় থাকলে না হয় ভাবা চলতো—মেয়েটা ভিতরে ভিতরে এত ডেঁপো ছিল অথচ চাপা বলে ধরবার উপায় নেই। কিন্তু হিসেব করতে গিয়ে ধরা পড়ল—সেভাবে চিন্তা করার মন রঞ্জিত খুইয়ে ফেলেছে—নিজের অজান্তে হাল ছেড়ে দিয়ে সীতার কাছে এখন আর অসহায় বোধ করা ছাড়া গত্যন্তর কী! অতএব—হুঁম বলে চুপ করে গেল।

সীতা উঠে দাঁড়ালো। লুকিয়ে হেসে নিল। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। জানালার উপর বসল—রঞ্জিতের চেয়ারের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে। ভিতরে ভিতরে একটুও জমেনি এমন নয়।

গলা শান্ দিয়ে বেশ মিহি করে ফেললো।

—আচ্ছা মাস্টার মশাই—

—উঁ—রঞ্জিতের বিচিত্র সাড়া। অনেকদিন পর 'মাস্টার মশাই' ডাক। মাস্টারির উত্তর কালে অবশ্য মাস্টার মশাই 'দা'-এ পরিণত হয়েছিল। তাই হঠাৎ সেই পুরানো ডাক একটু অভিনব লেগেছে। রঞ্জিত কান খাড়া করে রাখলো একটা অভিনব কিছু শোনার প্রত্যাশায়।

—আমার মোড়লিতে খুব রাগ করলেন তো?—কথার রেশ শেষ হতে না হতেই হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়ালো আবার। বাইরের কাকে সম্বোধন জানাল সহসা জানালা দিয়ে।

—আরে। আসুন আসুন। আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি আমরা।

রঞ্জিত হকচকিয়ে নড়ে চড়ে বলল।

যতীন মিত্তিরের প্রবেশ সম্বর্ধিত হলো। কিন্তু কি মূল্যে—রঞ্জিত বা সীতা তা বুঝে উঠতে না পারলেও বিধাতা বুঝলেন। কে হলফ করে বলতে পারে আরও ঘনিষ্ঠতর মুহূর্ত ওদের মধ্যে সৃষ্টি হত না!

সীতা বলল—আপনার জন্য রঞ্জিতদার অনুরোধে কফি রেখেছি।

যতীন হাসলো ঈষৎ। রঞ্জিত বলল—আর পাঁপড়ের কথাটা চেপে যাচ্ছ বেমালুম।

—হাজির করার সময় চেপে গেলে তখন সে অভিযোগ ওঠে—বলেই অন্দরে ঢুকল সীতা।

রঞ্জিত-সীতার আলাপে যতীনের উপস্থিতি আবার স্বাভাবিকতা আনলো। কোথায় যেন কর্পূরের মত উবে গেল মুহূর্তকাল আগের মনের সেই ফেনানো আবর্ত।

কতক্ষণ পর্যন্ত কফি আর পাঁপড় ভাজা কী রকম খাবার উপযোগী রাখা যায় তা যতীন বা রঞ্জিতের খেয়াল করার কথা নয়। তাই তারা উদ্‌বেগ প্রকাশ করল না। কিন্তু সীতা আবার নতুন করে স্টোভ জ্বালতে শুরু করল অন্দর মহলে।

যতীন-রঞ্জিতের মধ্যে কথাবার্তা হল অনেক এবং অনেক রাত্রি অবধি। একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রদর্শন, কারখানা, কাজ, শ্রমিক, ধনিক, ইত্যাদি বিশ্বের প্রায় সমুদয় আলোচনাই উঠল। রঞ্জিত তারই এক ফাঁকে জানালো, ভিতর থেকে কোম্পানীর সঠিক অবস্থা জানবার যে আশু প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যের জন্য তার চাকরি গ্রহণ করা, এখন সে দেখতে পাচ্ছে—চাকরির পদ এতই অকিঞ্চিৎকর যে উদ্দেশ্য সার্থক হবার আশা নিকট ভবিষ্যতে নেই। যতীন ভরসা দিল—ব্যস্ত কী। দুচার মাস যাক। হালচাল বোঝ। ওয়াকিবহাল হও একটু আধটু। তারপর শ্বশুরের সঙ্গে জমুক। বিয়েটা হোক। তবে তো? এখনই প্রয়োজন পূর্ণ করা হয়ত সম্ভব হবে না। কিন্তু বহু পরিস্থিতি আসবে।

রঞ্জিত একটু পাংশু হোল। চাকরিতে যোগ দেবার দিন থেকে একটা সপ্তাহ বিবাহ প্রসঙ্গে মন গুরুতর খচ্ খচ্ করতো। মনে হত বিবেকের মধ্যে যেন একটা কাঁটা ফুটেছে। তারপর কিছুদিন যেতে বেশ খানিকটা ধাতস্থ হয়ে উঠেছিল। আবার সেই প্রসঙ্গ। আবার খচ্ খচ্ করে বিঁধলো যেন কোথায় একটা কী।

যতীন আরও বলল—তাছাড়া যখন নিয়েছই—বিশেষ উদ্দেশ্য সার্থক না হোক, সাধারণ উদ্দেশ্যের শরীক হতে তো মানা নেই। কেরানী বাবুদের মধ্যে সংগঠন কমজোরী। সেখানে শ্রমিকপ্রাণ মানুষেরও একান্ত অভাব—সেও তোমার অজানা নয়।

একথার অবশ্য জবাব হয় না। তবু কিছু একটা বলা দরকার। কারণ সাধারণ উদ্দেশ্যের শরীক হওয়ার জন্য সে এত দায়িত্ব স্বীকার করত কিনা সন্দেহ। বিশেষ উদ্দেশ্যের বিশেষ প্রয়োজন উঠেছিল শ্রমিক-জীবনের স্বার্থে—তাই তার এত

ঝাঁকুপাঁকু। আর অত্যন্ত অর্থহীন ভাবে অত্যন্ত আগায়, অত্যন্ত কুৎসিত শর্তের প্যাঁচে নিজের জীবনকে প্যাঁচানো।

মনে খিঁচ রেখে বলল—বুঝলাম।

যতীন অমনি চেপে ধরল—বুঝলাম! এর আবার বুঝলাম কী?

—বুঝলাম এই যে, উদ্দেশ্য অকৃত্রিম থাকলে—সব পরিস্থিতির মধ্যেই পথের নিশানা আপ্‌সেই বেরিয়ে যায়।—কাত করা বাঁকা কথা; যতীনের পূর্বের দিনের এই বিশেষ কথাটা যেন সে মনে গেঁথে রেখেছে।

—ঠুকে কথা বলছ তো। তা বল। কিন্তু ব্রাদার—চাকরি নিয়েছ প্রায় একমাস: নিশ্চয় চাকরি নেবার সিদ্ধান্ত করেছ তারও আগে।

—তা করেছি।

—উদ্দেশ্য অকৃত্রিম থাকলে সকল পিচ্ছিল অবস্থার মধ্যেও পথের নিশানা আপ্‌সেই বেরিয়ে যায়—একথায়—তারপরও অবিশ্বাস তোলা কি সঙ্গত? কারণ এক্ষেত্রে প্রমাণ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

যুক্তির প্যাঁচে পড়ল রঞ্জিত। কাজেই প্যাঁচ খুলতে অন্য সুরে কথা বলল—যতই বল, বিবাহ প্রসঙ্গ মনে পড়লেই—চাকরি নেওয়াটা সঠিক পথের নিশানা কিনা, গুরুতর সন্দেহ উঠতে থাকে। তার ওপর আবার সাধারণ উদ্দেশ্যের শরীকত্বের কথা যেভাবে এসে পড়ছে—

অত্যন্ত খুঁটিয়ে যতীন প্রতিটি কথা লক্ষ্য করে যেতে লাগলো এবার।

একসময় রঞ্জিত হঠাৎ এক বেমক্কা প্রশ্ন করল—দেখ, বিয়ের শর্ত আপাততঃ একরকম পেছিয়ে দেওয়া গেছে—সে কথা বলেছি। আচ্ছা ওটা যদি বরাবরের মত সাসপেন্সে রাখা যায় কি রকম হয় বল তো। শর্তটা তো বড় কথা নয়। বড় কথা শ্রমিক-জীবনের সঙ্গে নিজেকে শামিল করার সুযোগ লাভ।—মুখে একটু দুষ্ট হাসির আভা দেখা যাচ্ছে না এমন নয়।

যতীন রঞ্জিতের পরিত্যক্ত চেয়ারে বসেছিল। আর রঞ্জিত বসেছিল সীতার পরিত্যক্ত জানালায়। যতীন হঠাৎ দেয়াল ধরে চেয়ারে দোল খেতে লাগল। আর রঞ্জিত জানালার সিক ধরে বাইরে তাকালো। বাইরে যশোর রোডের সেই পরিচিত দৃশ্যে তার চোখ সংলগ্ন।

—শর্তভঙ্গকে—কী ব্যক্তিগত কী সমষ্টিগত—সৎকাজ বলে কোন শাস্ত্রই তো আজও পর্যন্ত সার্টিফিকেট দিয়েছে বলে আমার জানা নেই।—মিষ্টি করে শক্ত কথা বলতে যতীন মিস্ত্রির ওস্তাদ।

পূর্ব বক্তব্যের সমর্থনে এবার বলল রঞ্জিত—শর্তরক্ষা বড়, না যে উদ্দেশ্যের জন্য শর্ত সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি বড়, আমায় বুঝিয়ে বলতে পার? কণ্ঠ দৃঢ় কিন্তু ভঙ্গীতে রসিকতা প্রচ্ছন্ন।

ভেতরে জ্বালা ধরে যেন এরকম কথায়। হঠাৎ রাগত স্বরে যতীন জানালো—না।

—না!—এক্ষেত্রে নেতিবাচক উত্তরে হোঁচট খেতেই হল রঞ্জিতকে।

—হুঁ—না।—নেতিবাচক 'না'-কে জোরদার করল ইতিবাচক 'হুঁ' যোগ করে। কিছুক্ষণ থামলো। তারপর কি ভাবলো। আবার শুরু করলো—কারণ মানুষের প্রতি ভালবাসার অকৃত্রিমতার উপরই মূলতঃ মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা বা ভঙ্গ নির্ভর করে। তাছাড়া, আমরাও এই সমাজের মানুষ—কেতাবী ভাবে একথাটা বোঝা নয়—হৃদয় দিয়ে এ বস্তু অনুভব না করলে—এক্ষেত্রে কোন্‌টা বড় তা বোঝা যাবে না বলে আমার বিশ্বাস। হৃদয় আর এইসব অনুভূতিকে না খুইয়ে ফেলতে পারলে বাহ্যতঃ যুক্তিসিদ্ধ ঐ সব কথা প্রকৃত পক্ষে সিদ্ধ হবার নয় রঞ্জিত।

অবশেষে একসময় রঞ্জিত টললো। ওস্তাদি রেখে মনের প্রকৃত সমস্যাটা অকপটে হাজির না করে পারলো না। বের হবার পথ যে তার ঘুলিয়ে উঠছে। যতীন মিত্তির ওর বন্ধু। ওর বিশ্বাস তার দৃষ্টি অনেক স্বচ্ছ। কারণ অভিজ্ঞতা ব্যাপক। এ পরিস্থিতিতে যতই হোক তার পরামর্শ যে নির্ভরযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই।

—আচ্ছা বলতে পার—বিবেক বড় না বিবেক বিসর্জনের বিনিময়ে আদর্শের কাজ বড়?—অত্যন্ত সিরিয়াস কণ্ঠস্বর। যতীন মিত্তির নিজের মাথাটা একবার ঝাকুনি দিয়ে নিল। বলল—দাঁড়াও, আগে বুঝে নিই কি বলতে চাইছ।—হুঁ—তা ব্যাপারটা আরেকটু খোলসাই করে বল দিকিনি।

করুণ হয়ে গেল যেন রঞ্জিতের গলা।—বেজায় লড়তে হচ্ছে ভাই বিবেক ব্যাটার সঙ্গে। ভেবেছিলাম শর্তাধীন চাকরি নেওয়াটা বিবেকের সঙ্গে ক্রমে খাপ খাইয়ে নিতে পারবো। কিন্তু শর্ত মানে তো একজন অজ্ঞাতকুলশীলকে বিয়ে। তাই বিয়ের শর্তটা যত স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করা যাবে ভেবেছিলাম—তার চেয়ে কার্যতঃ ঢের ঢের সিরিয়াস হয়ে উঠছে মনের মধ্যে। এরকম পরীক্ষায় কেউ কোনদিন পড়েছে বলে মনে হয় না। আদর্শের জন্য কাজের সুযোগ একদিকে, অন্যদিকে বিবেক—এ এক কঠিন পরীক্ষা ভাই।

—সত্যিকারের আদর্শের কাজ আর বিবেক এদের মধ্যে কী কখনও বিরোধ হয় ব্রাদার! হয় বিবেক ভুল, নইলে কাজ। তা কী ঠিক করলে শেষ পর্যন্ত?

—আমি ভাই কিছু ঠিক করে উঠতে পারছি না। তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু। তোমার পরামর্শের জন্য নইলে আর এত ছোটাছুটি করে মরছি কেন।

—আমার পরামর্শ!—হো হো করে দিলখোলা হাসি হাসল যতীন মিস্তির। —আমার পরামর্শ কী মনঃপূত হবে। মনে হবে তোমার কাকা-রূপী গার্জিয়ানের কণ্ঠস্বর। তাই আগে অনুমতি কর ভয়ে বলব না নির্ভয়ে।

রঞ্জিত হেসে ফেললো। যতীনও হাসলো। তারপর গোঁফে মোচড় মারতে শুরু করল বাঁ হাতে। চিন্তার চিহ্ন। তারপর পরামর্শ দানের জন্য মুখ খুললো।

—আমার কিন্তু মনে হয়—বিয়েটাও সিরিয়াসলি করে ফেল, আর কাজটাও। ও দুটোর মধ্যে এক্ষেত্রে এমন কিছু মারাত্মক বিরোধ দেখছি না আমি।

কথাটা রঞ্জিতের যে মনঃপূত হল না তা মুখচ্ছবিতে উদ্ভাসিত। দেখে আবার হাসল যতীন। আর ভাবল মনে মনে—ছেলেটা কী কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছে না যে অত্যন্ত গভীর ও সিরিয়াস ভাবে বলছে সে।

মুখে বলল—দেখ—শেষ পর্যন্ত এই পরামর্শ মত কাজ করবে যদি স্থির কর—তো আরও একটা উপরি পরামর্শ দেব। গোস্তাকি মাপ করো—সীতার সঙ্গে তাহলে ঘনিষ্ঠতাটা ঈষৎ গোটানো প্রয়োজন হবে।

রঞ্জিত সেকথায় খুব কর্ণপাত করল মনে হল না—বলল—তোমার বিচারে দুটোই সিরিয়াসলি করা সম্ভব। কিন্তু এখনও আমার বিচারে বিবেক ত্যাগ ছাড়া অন্য টীকা হচ্ছে না।

উঠে দাঁড়ালো। মনে হয় উত্তেজনায়। তারপর যোগ করলো—হলে—জানাবো। আপততঃ সাসপেন্সেই চলুক কাজ—কি বল।

যতীন জলে উঠল। অতিকষ্টে চেপে গিয়ে বলল—বিবেক ত্যাগ। আইডিয়াটায় বিলক্ষণ অভিনবত্ব আছে। তবে ত্যাগের জন্য এতই যখন সুড়সুড়ি জেগেছে—বহু ত্যাগের ক্ষেত্র আসবে—এখনই এত ব্যস্ত হবার কী আছে।

যতীনের ঝাঁজালো সুরে খানিক প্রকৃতিস্থ বোধ হল রঞ্জিতকে। বলল—চটেছো যেন মনে হচ্ছে।

—যাই বল বেড়ে আইডিয়া বার করেছো। বিবেক ত্যাগ! উর্বর মস্তিষ্ক

বটে। এবার বিষয়টির উপর একটা থিসিস লিখে ফেল—নিদেন একটা কবিতা। ডক্টরেট যদি নাও মেলে—ইনটেলেকচুয়াল মহলের বাহবা মিলবে।—খানিকক্ষণ চুপ করে ঝিম মেরে থাকল যতীন।

পরিস্থিতি জ'লো করে দেবার বাসনা হল রঞ্জিতের। কারণ নেহাৎ না চটলে যতীন মিত্তির ব্যঙ্গরসের সৃষ্টি করে না। বলল—ত্যাগের সুড়সুড়ি জাগা কী খুব বিচিত্র বলে মনে হয় তোমার?

—রসিকতা রাখ। বিবেক ত্যাগ মানে কি বলতে চাও? ঐভাবে বিয়ে করায় তোমার আপত্তি, না পাত্রী সম্বন্ধে আপত্তি। সন্ত্রাসবাদী যুগের আদর্শ হলে না হয় ব্রহ্মচর্যাশ্রম নীতির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারত। কিন্তু এযুগে ওকথা অমন ভাবে তো ওঠে না ব্রাদার।

একটু লজ্জা পেল রঞ্জিত। সব অবিবাহিত যুবকই প্রত্যক্ষতঃ বিবাহ, ব্রহ্মচর্য ইত্যাকার প্রসঙ্গ আলোচনায় লজ্জা পায়। তবু অনেক সপ্রতিভ ভাবে লজ্জা কাটিয়ে উঠল নিমেষে। তারপর বলল গলা নীচু করে অত্যন্ত ধীরে ধীরে—পাত্রী অজ্ঞাতকুলশীল সে প্রশ্ন আছে। কারণ পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয় পরিচিতির যে পাশ্চাত্ত্যায়িত নিয়ম—ওটা কেমন যেন আমার বিশ্বাসের বস্তু হয়ে গেছে। তাছাড়া ভঙ্গীটাও অত্যন্ত ডিগ্রেডিং।

অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে প্রতিটি শব্দোচ্চারণ লক্ষ্য করল যতীন। তারপর বলল,—আচ্ছা, আর একদিনও তোমায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সীতার প্রেমে পড়েছ কিনা। সেদিন হেঁকে বলেছিলে, প্রেমে আমি পড়ি না। প্রয়োজন হলে আমি প্রেম করি। আজ আবার জিজ্ঞাসা করছি তোমারই ভাষায়, মন খুলে উত্তর দাও তো। সীতাকে কি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছ নাকি রঞ্জিত। তাহলে কিন্তু সমস্ত প্রশ্ন স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বিচারের প্রয়োজন উঠবে।

রঞ্জিত কি একটা উত্তর করতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে সীতার আগমনে উত্তর চাপা পড়ল।

যতীনের উপস্থিতি যেমন রঞ্জিত-সীতার একটা না-ঘটা মুহূর্তের সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছিল—এ যেন তারই জবাব। যতীন-রঞ্জিত সমঝোতার একটি মূল্যবান মুহূর্তকে গ্রাস করল সে।

—উঃ পাকা এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছেন গল্প করে! আপনার পাঁপড় কিন্তু চেপে যাইনি যতীন দা—

পাঁপড়-সহ কফির পেয়ালা গ্রহণ করে যতীন হাসল—একটু সস্নেহ হাসি।

কিন্তু সীতার ফিরে আসায় রঞ্জিত প্রসঙ্গের অসমাপ্ত আলোচনায় আর ফিরে যেতে পারল না বলে মনে মনে উসখুস করতে লাগল।

তাই বিদায় নেবার আগে ইঙ্গিতে, রঞ্জিতের প্রতি খানিকটা উষ্মাই প্রকাশ হয়ে পড়ল।

বলল,—তা ইউনিয়ন অফিসে যাতায়াত, সেটা ছেড়ে দিলে কেন? ওখানে দৈনিক একবার যেও। তাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে বিব্রত হবার অভ্যাস কমে। সমষ্টির স্বার্থকে উর্দ্ধে রাখবার অভ্যাস বাড়ে। যে আদর্শ আদর্শ করে গগন ফাটাচ্ছ সেটার জন্যও ওটা অপরিহার্য কিনা ভেবে দেখো।

শুনে রঞ্জিতের ভিতরটা জ্বালা করতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। সেটা চেপে মুখে হাসির আভাস আনল। এবং এগিয়ে এসে যতীনের কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলল হাল্কা সুরে—

—যতীন মিত্তিরের গলায় শেষ পর্যন্ত কাকাই ভর করলো নাকি।

হাল্কামির জবাব হাল্কামিতে দেওয়াই সমীচীন মনে করল যতীন। পাল্টা রঞ্জিতের কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করল—ইয়েস্ ব্রাদার ইয়েস্। আদার-ওয়াইজ দি রড মে বি স্পেআর্ড অ্যাণ্ড দি চাইল্ড মে বি স্পয়েল্ট।

তারপর পরস্পর খুব একচোট হাসল।

সীতা দূর থেকে উভয়ের মুখের দিকে বারংবার তাকাতে লাগল বোকার মত।

॥ চার ॥

নার্সদের হোস্টেল হাসপাতালের চত্বরের মধ্যে। সুদৃশ্য বাগানওয়ালা কম্পাউণ্ডের বুক চিরে বেরিয়ে গেছে নিজস্ব রাস্তা। সোজা মিশেছে ট্রাম-বাস-চলা বড় রাস্তায়।

দু'পাশে সাবু গাছের সারি। কেয়ারি করা ফুলের ঝাড় মাঝে মাঝে। ডান হাতে হাসপাতাল বাড়ীগুলি। বাঁ হাতের প্রথম স্টাফ্ কোয়ার্টার। তারপর কয়েকটা লেকচার থিয়েটার। তারপর মালতীদের হোস্টেল। তারপরও আছে—অনেকখানি দূরে—সবশেষে—মড়াকাটার ঘর।

হোস্টেলের বাইরে বিজ্ঞাপন সাঁটা আছে। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। শুধু দর্শনপ্রার্থীদের জন্য একখানা ঘর নির্দিষ্ট আছে। খোলার নির্দিষ্ট সময় বিকাল চারটা থেকে ছ'টা।

কিন্তু বিকাল চারটা বাজার আগেই সমস্ত হোস্টেলের মেয়েদের মধ্যে কেমন যেন একটা সোরগোল পড়ে যায়। কেমন যেন একটা সাজ সাজ আবহাওয়া। সারাদিনের আবদ্ধতার মাঝে—রোগ, গোঙানি আর আর্তনাদের হাসপাতালী আবহাওয়ার মাঝে—বিকাল চারটা থেকে ছ'টা—মাধুর্যময় দুটো ঘণ্টা। যেন বন্ধ জানালার কপাট খুলে দিয়ে খোলা হাওয়ার আমন্ত্রণ।

সকলে উদগ্র হয়ে ওঠে। সবদিন সবার কাছে দর্শনপ্রার্থী আসে এমন নয়—তবুও। আসুক না আসুক, যারা হোস্টেলে উপস্থিত থাকে, তারা সবাই সেজে গুজে প্রস্তুত হয়ে নেয়। একদিন, কেউ যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে না তার মন খারাপ হয়।

মালতী সাজে। ময়না সাজে। এবং সীতাও। মালতীর নিয়মিত দর্শনপ্রার্থী তার বৃদ্ধ পিতা। মালতার দুটি নাবালক ছেলের হাত ধরে তিনি আসেন। ছেলেরা মায়ের দেখা পায়।

ময়নামতীর কাছেও মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন তার পিতৃদেব। সবার সামনেই ঘরের মেয়েকে কাজে ইস্তফা দিয়ে ঘরে ফিরে যেতে বোঝানোর চেষ্টা করে করে হয়রান হন। ময়নামতী লজ্জায় পড়ে, ক্ষুব্ধ হয়। ফলে শনিবার বাড়ী যাওয়া পর্যন্ত স্থগিত রেখেছে সে।

আজকাল সীতার কাছেও দর্শক আসে। প্রথম দিকে কেউ আসত না। মন তখন অদ্ভুত ভার হয়ে থাকত। পরে রঞ্জিত কিছুদিন নিয়মিত আসত। ইদানীং সে শনিবার ছাড়া আসে না। কিন্তু অজয়ের সাক্ষাৎ প্রার্থনার স্লিপ প্রত্যহই আসে। তার গায়ে পড়া অন্তরঙ্গ হবার প্রচেষ্টা বেড়েছে।

তা বাড়ুক। প্রথম পরিচয়ের বিকর্ষণের কথাও মনে পড়ে। এসব সত্ত্বেও এই গায়ে পড়া অন্তরঙ্গতা পরিহার করা সমীচীন হবে না বলে ক্রমশঃ তার ধারণা জন্মাচ্ছে। কারণ এখানে তার সহায় সামান্য। এবং দেখে দেখে, শুনে শুনে সে বুঝতে শুরু করেছে—চাকরি ক্ষেত্রে সহায় ওরফে ব্যাকিংএর মূল্য নগণ্য নয়।

ক'মাস বাদেই চাকরিতে পাকা হবার সমস্যা আছে। সেটা যে নেহাৎ সহজ সমস্যা—ভুক্তভোগীদের কাছে এমন শোনেনি।

সব দিক দিয়ে বিচার করে সে অজয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রাখতে চায়। কাজেই ভাল ব্যবহার করে। দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট ভিজিটিং রুমে বসে পাঁচ রকম গল্প করে। এমন কি দু'একদিন তার সঙ্গে হাসপাতালের বাইরে পর্যন্ত বেড়াতে যেতে সম্মতি দেয়।

স্বাবলম্বনের পথকে মসৃণ করার চিন্তা এরই মধ্যে দুশ্চিন্তা হয়ে তার মাথায় চেপে বসেছে।

এই হাসপাতালের সঙ্গে আগে মেডিক্যাল স্কুল কোস প্রবর্তিত ছিল। সেই আমলে অজয় একবার পাস করেছিল। পরে কম্বাইণ্ড কোর্স চালু হওয়ায়—আবার ছাত্র হিসাবে কয়েক বছর কাটাবে মনস্থ করেছে।

কাজেই এখানকার নাড়ীনক্ষত্র অজয়ের মুখস্থ। তা ছাড়া তার প্রভাব প্রতিপত্তি—এখানকার উঁচু থেকে নীচু মহল অবধি—সর্বজনবিদিত। এবং এই প্রভাবের উৎসও কোন গোপনীয় ব্যাপার নয়। সেই অজয় বসাকের পৃষ্ঠপোষকতা।

অথচ মেয়ে হিসাবে অজয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বিপদও অগ্রাহ্য করার নয়। কারণ তার সুনাম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন—অল্প বিস্তর সবাই। বিভিন্ন সময়ে অজয়ের সঙ্গে বিভিন্ন ডাক্তারির ছাত্রী ও নার্স মেয়েকে যখনই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করতে দেখা গেছে, তখনই সত্য হোক মিথ্যা হোক—তাদের সম্বন্ধে মুখরোচক সব গুজব মহারাজেরা পক্ষ বিস্তার করেছেন। এবং গুজব মহারাজদের শক্তি এতই প্রচণ্ড যে এমন একজন মেয়েও নেই যাকে ক্রমে ক্রমে এই ঘনিষ্ঠতা গুটিয়ে ফেলতে দেখা যায় নি।

অজয় অবশ্য এ সব পরোয়া করে না।

সীতার সব চাইতে অন্তরঙ্গ মালতী। সীতাদের চাইতে হোস্টেলের পুরানো বাসিন্দা। এ সকল ঘটনা তার জানা। তাই প্রথম প্রথম রসিকতা করত।

—কিরে সীতা—গা তোল্। বলদ বাবু যে ভিজিটিং রুমে অপেক্ষা করছেন।

সীতা প্রথম প্রথম বুঝে উঠতে পারত না। বলত,—বলদ বাবু! বলদ বাবু আবার কে?

—কেন স্লিপ পাস নি? সেই যে মেয়েদের সঙ্গে বোকা বোকা কথা বলে। আর হ্যাংলার মত গায়ে পড়ে কথা বলার জন্য ছলছুতো খোঁজে।

—ও অজয় বসাকের কথা বলছ তুমি?

ময়নামতীও মুখ টিপে টিপে হাসত। ময়নার স্বভাবই ওরকম। যেখানে একটা কথা বলা দরকার সেখানে সে বড় জোর একটু হাসবে। আর হাজারটা কথার জবাবে ছোট্ট একটি হুঁ বা না করেই খালাস।

মালতীর বয়স ত্রিশের উপর। বিধবা। দুই সন্তানের জননী। কিন্তু খুব হাসিখুশী।

সীতার কানের কাছে মুখ এনে বলে—যে ঘন ঘন রেটে বেচারার আগমন শুরু হয়েছে—তাতে অন্দর মহলে প্রবেশ নিষিদ্ধ না থাকলে—অন্দরে ঢুকে তোর সঙ্গে বোধ হয় গল্প করতে বসত। এত কী গল্প করে বল্ তো।

এসব কথার হুল কোথায় সীতা তা বোঝে। এককালে এই ইঙ্গিতে অত্যন্ত গোঁড়ার মত গা ঘিন্ ঘিন্ করত। এখন মনকে প্রবোধ দিয়ে দিয়ে বাগ মানিয়ে ফেলেছে অনেকখানি। আর অত সস্তা গা ঘিন্ ঘিন্ করলে চলবে কেন ?

এরা তিনজনই হোস্টেলের তিন নম্বর ঘরের রুম-মেট। তিন-শয্যা কামরার ঘনিষ্ঠ সঙ্গ অত্যন্ত অল্প দিনেই এদের ঘনিষ্ঠতাকে ঘন করে ফেলেছে।

'বলদবাবু' নামে সীতার আপত্তি শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকল না। এখন অজয় বসাক সম্পর্কে কোন কথা উঠলে ময়না, মালতী, সীতা সকলেই নিজেদের মধ্যে 'বলদ বাবু' নাম ব্যবহার করে। প্রথম প্রথম হেসেই বাঁচত না কথা বলার সময়। এখন আবার উল্টো ফ্যাসাদ হয়েছে। অভ্যেস এত বিশ্রী হয়েছে যে কখন বাইরের লোকের সামনে অজয় বসাকের জায়গায় 'বলদ বাবু' নাম ব্যবহার করে ফেলে সেই ভয়েই তটস্থ।

এই তো সেদিন। প্রসূতি বিভাগের মেট্রনের সঙ্গে মালতীর লাগলো খটাখটি। শিক্ষানবিসদের পাঁচ ঘণ্টা ডিউটি দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু মেট্রন অতিরিক্ত সময় কাজ করাতে চায়। তার যুক্তি যে-কেস্‌টা হাতে নেবে সেটা সম্পূর্ণ শেষ হবার আগেই ডিউটির নির্দিষ্ট ঘণ্টা শেষ হয়ে গেলে—সে কিছু সাহায্য করতে পারে না। মালতীও নাছোড়। ডিউটির নির্দিষ্ট ঘণ্টার বেশী কাজ করতে সে নারাজ। যদিও সে জানে ডাক্তার মেট্রনের পক্ষে।

সে বলল—আপনার স্টাফ ডাকুন। ট্রেনিং-এ আছি। আমার বেলায় ঠিক স্টাফের আইন খাটে না।

মেট্রন বলে—আলবৎ খাটে। আজ ট্রেনিং-এ আছ। কাল পুরো স্টাফ হবে।

মালতী ফিরিঙ্গী মেয়েটার স্বভাব জানে। আসলে ওসব আইন-টাইন কোন কাজের কথা নয়। মেয়েদের বেশী খাটিয়ে হাউস সার্জেনের কাছে কৃতিত্ব নেওয়া আর চাকরির জয়যাত্রার পথকে বাধাহীন করার এসব হল ফিকির।

যে মেয়ে অবাধ্য হয়—তাকে মেট্রন ডিউটি শেষ হবার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে কায়দা করে ঠিক এমন কাজ চাপিয়ে দেবে যা ডিউটির সময়ের মধ্যে কিছুতেই শেষ হবে না। ব্যস জব্দ। আর ডাক্তারগুলোকে হাত করার কায়দাও জানে ফিরিঙ্গী

মেয়েটা—অত্যন্ত সুনিপুণভাবে। এই ওয়ার্ডে একাধিক মাস্টারকে সে দেখেছে। কেউই ওর মতের বিপক্ষে যায়নি।

শরীরটাও তার ভাল নেই। কালতু খাটুনি কিছুতেই সে খাটবে না কেমন জিদ চেপে যায়। একটা কেস্ ডেলিভারী টেবিলে তুলে দিয়েছে। কিন্তু বোঝা গেল বেশ দেরি আছে। একটু অ-দায়িত্বপূর্ণ কাজই করে ফেলল। এক সঙ্গীকে ডেকে ওয়াচ করতে দাঁড় করিয়ে মেট্রনের সঙ্গে তুমুল তর্কাতর্কি করতে লেগে গেল। দমবার পাত্রী সে নয়।

ওয়ার্ডের শিক্ষানবিসী ছাত্র হিসাবে অজয় বসাককে সামনে পাওয়াটা অবশ্য খুবই আচমকা। ও ডেকে ফেলল তাকে—বলদ বাবু শুনছেন—

ফিরে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো অজয় বসাক।

বলছেন—

কথাটা কানে গেলেও ঠিক হৃদয়ঙ্গম করার কথা নয় অজয়ের। জিহ্বার এই বিশ্বাসঘাতকতায় ঘোরতর বিপদগ্রস্ত বোধ করল। কিন্তু নিজের সৃষ্ট বিপদ নিজে ছাড়া এখন কে ত্রাণ করবে। কাজেই সামলে নিতে হল নিজেকে। সপ্রতিভ ভাবে বলল—হাঁ। তারপর মেট্রন ও তার বিরোধের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করল। এবং অত্যন্ত নিপুণভাবে তার নিরপেক্ষ ও ন্যায্য হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করল।

মেট্রন বসাককে বিলক্ষণ চেনে। ক্যাপ্টেন বসাক হাসপাতালের পরিচালক কমিটির লোক। অতএব তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তক্ষেপ কার্যকরী না হয়ে যায় কোথা। সীতা মারফতই মালতীর সঙ্গে তার পরিচয়ের খানিক ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেই কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক—অজয়ের রায় মালতীর পক্ষে গেল।

ডিউটির নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সে রোগীর জন্য সেবার কাজে উচ্ছল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তার পর—লোকে যাই বলুক—সেবার মত মহৎ কাজও তার কাছে কেমন যেন বোঝা স্বরূপ মনে হয়।

মেট্রন ভিতরে ভিতরে চটলেন। কিন্তু মালতীর সেদিনকার মত জিৎ হলো। পরে কি হবে মাথা ঘামাতে ইচ্ছা করল না। তৎক্ষণাৎ হোস্টেলে ফিরে এলো।

আর লেবার ওয়ার্ডের দালান থেকে তার হোস্টেল বাড়ী মাত্র আধ মিনিট। কামরা বড় জোর দুমিনিট। মাঝখানে শুধু হাসপাতালের বুক চিরে চলে যাওয়া রাস্তাটির ব্যবধান।

হোস্টেলে ফিরতে দেখল চারটার শোরগোল উঠতে শুরু করেছে। ময়নামতী

কাপড়চোপড় পরে জানালার শিক ধরে দূরে পাঁচিল পেরিয়ে আরও দূরে বড় রাস্তার উপর দৃষ্টি প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। সীতা ডিউটি থেকে এসে ধড়াচুড়া পর্যন্ত না খুলে টান টান হয়ে গা এলিয়ে দিয়েছে খাটে।

মালতী ওরকম পারে না। রোগী ঘেঁটে এসে—বাথরুমে না ঢুকে বিছানা স্পর্শ করা তার পক্ষে অসম্ভব।

ক্রমে ধড়াচুড়া খুলে ধীরে সুস্থে তিন বান্ধবীতে গল্প করতে বসল। মালতী তার বিভ্রাট বর্ণনা করতেই নির্মল আনন্দের হাসিতে হেসে উঠল তিন নম্বর রুম।

সীতা শুয়ে শুয়ে বলল—হাসপাতাল তো নয় পাতালপুরী। নামটা ট্রেনিং কিন্তু খাটুনি তো ভুতের।

—আর সবের সেরা খাটুনি মেটার্নিটিতে।

—কাল থেকে আমার আবার সেই মেটার্নিটিতেই পড়েছে ডিউটি। সেই ভাবনায় মরে যাচ্ছি।

ময়নামতীর চোখ দুটো হঠাৎ মুখর হয়ে উঠলো। মনে হলো কিছু একটা বলবে। কিন্তু একটু ঠোঁট বাঁকানো হাসি হেসেই নীরব হয়ে গেল সে।

মালতী বলল—তোর ময়না নামই বৃথা। কোথায় ময়নার মত কপচাবি, হাসবি, হৈ চৈ করবি—তা নয় মুখ গোমড়া আর গোমড়া। যুবতী মেয়ে—আয়নায় মুখ দেখে গুন্‌গুনিয়ে উঠবি—আমার ভুবনে বসন্ত এলো রে—তবে তো তুই ময়না।

সীতা বলে—এ তোমার মিছে অভিযোগ। এই তো হাসলো।

—হাসি না ভেংচী?

ময়নামতীর মুখে এবার কথা ফুটল—আমার ভেংচীই ভাল। আমার বসন্ত এসেও কাজ নেই। ময়না হয়েও কাজ নেই। বুড়ো বয়সে তোমার ভুবনেই বরং বসন্তের রং লাগুক—

—দূর পাগলী—সস্নেহ হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মালতীর মুখমণ্ডল।

সত্যিই ময়নার জন্য সহানুভূতি হয় মালতীর। নারী-জীবনের প্রধান পুঁজি যদি রূপ হয় তবে সেটি তার খোয়া গেছে। একটা চোখ পাথরের। দেহলালিত্যেও নেহাৎ অচল। অথচ বেচারীর সেই পরিমাণ মনের জোরও সৃষ্টি হয়নি যে এই তথাকথিত পুঁজিকে অবহেলা করে। শুধুমাত্র মানুষ এই মহিমায় নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করে।

রূপও যে নারী-জীবনে শেষ পর্যন্ত সার্থকতা সৃষ্টি করতে পারে।—ময়না আর সীতার মত কম বয়সী মেয়েদের তা এখনও বুঝবার কথা নয়।

মালতীরও রূপ ছিল। প্রথম যৌবন তার কেটেছে ঘরের বউ হয়ে। স্বামীর ভালবাসা সে পেয়েছে। কিন্তু স্বামীর ভালবাসাই কী সার্থকতার সবখানি! সংসার-জীবনকে সে যে এদের চেয়েও অনেক পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখেছে।

অবশেষে তাকেও তো অধিক বয়সে সার্থকতার সন্ধানে চাকরির ধাঁধায় ঘুরে বেড়াতে হল। অকাল বৈধব্যের সঙ্গে সকল সার্থকতা যেন কর্পূরের মত উবে যেতে বসল। সন্তান পালনের দুরূহ কর্তব্যের দায় পড়লো ঘাড়ে। শেষ পর্যন্ত এই স্বাবলম্বনের পথ ছাড়া সম্মানের পথ পেল না।

তাই নারী-জীবনেও প্রকৃত সার্থকতার কথা যদি ওঠে তো সে বলবে—স্বাবলম্বনকে বাদ দিয়ে কিছুতেই তা সম্ভব নয়। অনেক বেদনা, অসম্মান আর অনেক মূল্যের বিনিময়ে তার এই উপলব্ধি।

কিন্তু সীতার বা ময়নার স্বাবলম্বনের পথের উপলব্ধির রকম স্বতন্ত্র।

চাকরি ময়নার অবলম্বন-বিশেষ। ময়নার বিশ্বাস—রূপহীনার পক্ষে বিয়ের চাইতে স্বাবলম্বনই অপেক্ষাকৃত উত্তম অবলম্বন। তাই তো পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—এই হাসপাতালে তিন নম্বর রুমের সে বাসিন্দা। তাই পিতার সঙ্গে নিত্য ঝগড়া।

সীতার স্বাবলম্বন প্রচেষ্টায় স্বকীয়তা নেই এমন নয়। কিন্তু মণিমার প্রভাবই সেখানে অধিক। তবে সংসারে বঙ্কিমের অনুপস্থিতির পর থেকে নতুন একটা অবহেলার বেদনা তাকে বিদ্ধ করছে। পরিবারের প্রয়োজনে—পুত্রের যোগ্যতা কন্যাদের পক্ষেও অর্জন করা সম্ভব—একথা প্রমাণ করতে না পারা পর্যন্ত তার মনে শান্তি নেই।

মেটার্নিটিতে ডিউটিতে গেলেই হুজ্জুত লাগে। সীতাও হুজ্জুতে পড়লো। মেট্রনের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে লক্ষী মেয়ের মত হুজ্জুত এড়ালো। অর্থাৎ সাতঘণ্টা খাটলো। যখন ফিরলো—সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিকাল চারটার শোরগোল শুরুপ্রায়।

সীতা ঢুকতেই মালতী দপ্ করে জ্বলে উঠলো। বলল কী রকম মেয়ে রে তুই। দুঘণ্টা বাড়তি খেটে এলি শেষ পর্যন্ত।

—কী করবো বল্। চেষ্টা তো করলাম। কিন্তু মেট্রনটা আমার চাইতে ভাই ঢের সেয়ানা।

—হবে না সেয়ানা! তোদের মত উঠতি বয়সের মেয়েগুলো পর্যন্ত ঘোড়ার মত নেহার করবে। পেয়ে বসবে না!—ঝাঁজ কমিয়ে হঠাৎ গলাটা নামিয়ে স্বগত করে ফেলল মালতী,—একলা তোকে আর দোষ দিয়ে কি করব। খানকার অর্ধেক লোকের দস্তুরই তো দেখছি এই।

সীতা চুপ করে গেল। ধড়াচুড়া ছেড়ে মালতীর খাটের পাশে এসে বসল। ার পর শুয়ে পড়লো পাশে।

মালতী ঈষৎ হাল্কাসুরে বলল—আহা খেটে খেটে চাঁদপানা মুখ শুকিয়ে কেবারে আম্‌সি হয়ে গেছে মেয়ের।

ময়নামতীর খাটখানা ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে উঠলো।

—কি যে বলো যা তা।

—কেন বাপু, আমার মত বুদ্ধি করে বলদ বাবুকে খুঁজে এনে সাক্ষী ানলে তো আর এই দশা হতো না।

চট্ করে উঠে বসলো সীতা।—কী মনে করো তুমি আমাকে—মালতীদি।

—আমার ছোট্ট একটি বোন বলে—মালতীও উঠে বসলো। ফলে সীতার রাগা সুর খানিক ভোঁতা হয়ে গেল।—আর ছোট্ট বোন বলেই বলছি। সাধু াবধান! বলদ বাবুদের মত ছেলেদের থেকে ভয় করার কি কিছুই নেই বোন?

—না। কারণ, হাঁসের গায়ে জল লাগার ভয় থাকে না।

—ও, তুই বুঝি হাঁস?

মাথা নেড়ে সায় দিলো সীতা।

—কিন্তু তুমি রাজহংসী না পাতিহংসী, সেটা তো উল্লেখ করলে না বোন—

ময়নামতী উঠে বসল।—মালতীদি কেবল বোনকে শাসাতেই জানে। কন্তু ছোট বোনের এখনও চা খাওয়া পর্যন্ত হয়নি—সে দিকে তো নজর নই—বলে একটু হাসল ময়নামতী। তারপর স্টোভ ধরানোর উদ্যোগ করল।

মালতী অবাক হয়ে শুধালো—তাহলে তুই ঘুমুসনি ময়না?

—কী করে ঘুমুবে বল; ঠিক সময়ে, ঠিক জিনিসটির অভাবের কথা কে মন করে ভাববে তাহলে আমার জন্য?

বলেই উঠে দাঁড়িয়ে নিলো সীতা। ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত ময়নামতীর পর পড়ল। স্টোভে সবে স্পিরিট ঢেলেছে সে। তুলে দাঁড় করিয়ে জড়িয়ে রে চুমু খেতে লাগল সীতা। বলল—যদি ছেলে হোতাম ঠিক তোকে বিয়ে রে ফেলতাম ময়না।

ঝাপটাঝাপটি করে অতি কষ্টে মুক্ত করল নিজেকে ময়না। তারপর আবার সেই ঈষৎ হাসি। হাসির ভাঁজে ভাঁজে একটা জীবন্ত চোখ সেটাও কুঁচকে ওঠে।

মালতীর বুক আর মনের মধ্যে চকিতে কী একটা বিদ্যুৎস্পর্শের মত পাক মেরে ফিরে যায়। শ্বাসরোধকারী একটা দীর্ঘশ্বাস সে দৃঢ় হস্তে দমন করে। অসম্বৃত কাপড়-চোপড় ভাল করে টেনে টেনে দেয় গায়ে।

সীতা চুলের খোপা খুলে দেয়। বিনুনিটা সাপের মত দোলে আর দোলে, সারাদিনের পরিশ্রমান্তিক জমাট বাঁধা মন—একটুখানি তরল হয়ে উঠবার জন্য।

মালতী হঠাৎ অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে বলে—বড় ডেঁপো হয়েছিস যে সীতা! আগে তো এরকম ছিল না তোর স্বভাব।—নিজের কানেই অসম্ভব কর্কশ লাগে নিজের কণ্ঠ।

সীতা ঘুরে দাঁড়ায়—কী করে থাকবে। তখনও তো মালতীদির বোন হইনি।

—উঃ প্রত্যেকটা কথায় তুই উত্তর দিবি! যেন টেনে বাঁধা তব্‌লা। এতটুকু ছুঁলে এতবড় হয়ে বেজে উঠবে—ঠং করে।

চাকরি করতে এসে বাইরের দশরকমের পরিবেশের পাল্লায় পড়ে একটু ডেঁপো সে হয়েছে বৈকি। পরিবর্তন যে একটা হয়েছে সেটা নিজেই অনুভব করে।

তার আবেগগুলো অনেক নমনীয় হয়েছে। তাদের বাড়ীতে রঞ্জিতের যাতায়াত নিয়ে একবার রঞ্জিতের মা তার মাকে ডাইনী বলেছিলেন—তার মনে পড়ে। আর তার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতের লেজ ধরে তার মন কী মর্মান্তিক জ্বালাই না অনুভব করেছিল। ভাবতে আজ হাসি পায়। যখন সে বাড়ীর চার দেয়াল ছাড়া জানত না, কি স্পর্শকাতরই না ছিল। এখন তার আকাশের সীমানা বেড়েছে—এখন সে কত সাবলীলভাবে রঞ্জিতের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে। আর অজয়ের গায়ে পড়া বন্ধুত্বকে প্রশ্রয় দিতে—মানসিকতা কোনরকম নাকে কান্না শুরু করে না।

এই তো কিছুদিন আগে। অজয়কে সঙ্গদান করতে হল তার অনুরোধে। অজয়ের প্রতি তার একটা কৃতজ্ঞতা-বোধ আছে। আর তার পুরো সুযোগ অজয় গ্রহণ করতে চায়—বুঝেও সে অস্বীকার করতে পারে না। ডাঃ লাহিড়ীর

বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজন হয়ত ছিল। কিন্তু অজয়ের পক্ষে সেটা উপলক্ষ্য—তা সে বোঝে না এমন নয়। গাড়িতে ঘেঁষাঘেঁষি বসলেও কোন্ ঘেঁষাঘেঁষির কোন্ উদ্দেশ্য তা বুঝবার একটা তীক্ষ্ণ বোধশক্তি তার আছে। তারপর ফেরার পথে সেই এম্প্রেস হোটেলের খানা। প্রথম ভেবেছিল, সিনেমা মত! কারণ ওরকম বিলেতী ধরনের হোটেলে সে অভ্যস্ত নয়। আকারে প্রকারে আর সাজসজ্জায় যতদূর মনে হয়—সব কেতাদুরস্ত লোকেদের ভিড় সেখানে। তার মত মেয়ের পর্যায়ের কেউ আছে কিনা সাদা চোখে তা সে মালুম করতে পারেনি। কেমন একটা অনভ্যস্ত পরিবেশে প্রথমটা কেমন ভয় ভয় করছিল। হল ঘরের ঠিক মাঝখানে জ্যোৎস্না রঙের একটা বড় আলো জ্বলছে। তাছাড়া চারদিকের দেয়ালে লাল, নীল, বেগুনী সব আলোর সজ্জা—চোখ ধাঁধায়। কেবিনগুলোর মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে উৎকট চীৎকার উঠছে। আর মাঝে মাঝে কড়া স্পিরিটের গন্ধ। তখন বোঝে নি, তবে পরে জেনেছিল স্পিরিটের গন্ধের আসল অর্থ কী। আরও অনেক মেয়ে আছে দেখে সে যাত্রা ভয়টাকে সে সামলাতে পেরেছিল।

খেতে খেতে অজয় বলছিল—নীল আলোয় কিন্তু আপনাকে ভারী সুন্দর লাগে দেখতে।

ডান কাঁধের কাপড় আরও টেনে দিয়ে কাত করে তাকালো সে অজয়ের চোখের দিকে। তাড়াতাড়ি কোনরকমে হোস্টেলে ফিরতে পারলে সে বাঁচে যেন। অথচ পরিচিত পরিবেশে অজয়কে তো তার এমন ভয় করেনি কোনদিন!

সেদিন হোটেলপর্ব শেষ হতে রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। সাধারণ নিয়মে মেয়েরা রাত্রে হোস্টেলের বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু সাধারণ নিয়মকে ফাঁকি দেওয়ার অসাধারণ মন্ত্রগুলি জানে অজয়।

পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল সীতা। যা ভেবেছিল তাই। মালতী ঘুমোয়নি।

শুয়ে শুয়েই দুকথা শোনালো সে।—আমাকে লুকিয়ে কি হবে বল্। আমার তো অজানা নেই কিছু।

বাদানুবাদ সংক্ষেপ করার জন্য চটপট্ অন্যায় স্বীকার করে নিল সীতা। —স্বীকার করছি—অন্যায় হয়েছে রাত্তির করা। আর হবে না এ রকম। হোল?

—না হোল না। মালতী বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো।

—ওমা, সত্যি সত্যি তুমি ঝগড়া করবে নাকি রাত দুপুরে?

—করবো। তবে গলা নামিয়ে। কেন জানিস? কারণ ছেলেদের বলদ

হলে চলে। কিন্তু মেয়েদের চলে না। কারণ তুই ঠিক বুঝবি না এখন। মেয়েদের যে মা হতে হয় রে—উত্তেজিত হয়ে উঠল মালতী।

—সব জিনিসকে বাড়িয়ে দেখার ওই এক অভ্যাস তোমার।

মালতী মুচকি হাসল—তাই যেন হয়। তবু, রাত্তির করে ঘরে ফেরা এখানকার পরিবেশে সত্যিই আমি পছন্দ করি না।

—বেশ তোমার পছন্দের সম্মান রক্ষা করে চলবো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—তারপর গম্ভীর হয়ে গেল সে।

এই তো কিছুক্ষণ আগে অজয়ের সান্নিধ্যে নিজের স্পর্শকাতরতার কথা ভেবে হঠাৎ হাসি পেল তার। কৈ, কি কারণ ছিল অমন স্পর্শকাতর হবার। এই তো সে তার হোস্টেলের তিন নম্বর রুমে সম্পূর্ণ সুস্থ ও অক্ষত অবস্থায়। মালতীদের আর কি দোষ। তার মনই তো এখনও পর্যন্ত ঐ রকম বাড়িয়ে দেখছে পরিস্থিতি।

একটু হেসে কথা বললে, একটু সঙ্গে বেড়াতে গেলে, অজয়ের মত ছেলেদের কাছ থেকে যদি অকৃত্রিম উপকার পাওয়া যায়—যে উপকার তার পক্ষে প্রয়োজনীয়—ক্ষতি কী। কেউ তো ক্ষয়ে যায় না তাতে। এ নেহাৎ গোঁড়ামি তার।

এমনি করেই তার আত্মবিশ্বাস উত্তরোত্তর বেড়েছে। মালতীকে কথা দিয়েছে তাই রাত আর করেনি। কিন্তু অজয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে ছাড়া কমেনি। একদিন ইতিমধ্যে বোটানিক্সে গিয়ে একত্র ছবি তুলেছে। পিক্‌নিক্ করেছে। ছবি তোলার কথাটা মনে পড়ে। সেই পুরানো ইতস্ততঃ ভাব। পরে আবার অকারণ স্পর্শকাতরতা ছাড়া কিছু নয় মনে করে সম্মতিও দিয়েছে।

আর একদিন। অজয়ের বাড়ীতে কি একটা উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়েছিল। নিমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিদের বিদায়ের পরও অনেকক্ষণ থাকতে হয়েছিল তাকে। অজয়ের মা ও বোনের সঙ্গে দিব্যি জমেও উঠেছিল তার। দিব্যি মিষ্টি মানুষটি অজয়ের মা। কিন্তু বেবী মেয়েটিকে ঠিক সে পছন্দ করেনি তেমন। যেন ঠাটের আড়ালে আসল ঢাকার আতিশয্য। পাশের ঘরের পর্দার আড়ালে যখন বেবী অজয়কে পরিহাস করছিল তখন আবার সেই পুরানো স্নায়বিক দুর্বলতার প্রভাব অনুভব করেছিল।

বেবী বলছিল—এই তাহলে দাদার ফিঁয়াসী।

—কী ইয়ার্কি করিস। মেয়ে বন্ধু হলেই ফিঁযাসী হতে হবে—এ যে কী অদ্ভুত ধারণা তোদের—

—বেশ, তাহলে ফিঁয়াসী নয়। একসঙ্গে তোলা ছবিতে অ্যালবাম তো দিব্যি ভর্তি করেছো।—সেইজন্যই তো লেগেছে মুশ্‌কিল।

—তোর আবার কী মুশ্‌কিল—

—মুশ্‌কিলটা এই, মেয়ে বন্ধু যে তোমার কলেজের সেশান পাল্টানোর মত পাল্টায়।

স্নায়বিক দুর্বলতা উত্তেজনায় পরিণত হয়েছিল। কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে এসেছিল একলা।

অজয় বসাকের বোকা বোকা ব্যবহারের জন্য তাকে মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে বটে কিন্তু হোস্টেলে ফিরে এসে তখনকার স্নায়বিক উত্তেজনা ও তজ্জন্য অশোভন আচরণের কথা ভেবে লজ্জাও বোধ করেছিল।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও—এইতো সে। জলজ্যান্ত হোস্টেলের ঘরে—অক্ষত দেহে। একটি চুলও তার খোয়া যায়নি।

।। পাঁচ ।।

এওারসনের প্রথম ভোঁ বাজে, কারখানা শুরু হবার দশ মিনিট থাকতে। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটায় হাজিরা। প্রথম প্রথম অত সকালে তৈরী হয়ে নিতে ভারী কষ্ট হ'তো।

ঠাণ্ডারামের সাব্যস্ত করে দেওয়া মুদীর দোকান থেকে জিনিসপত্র এনে প্রথম কয়েকদিন হাত পুড়িয়ে খাবার চেষ্টা করেও দেখেছে।

বহুদিন বামুনদি চুলো ধরিয়ে দিয়ে ভাতের হাঁড়ি পর্যন্ত বসিয়ে দিয়েছেন। অবশেষে অবস্থা দেখে তিনিই একদিন এসে বললেন—তা গোসাঁই আমরা বামুনেরই ঘর। আমাদের রান্না খেলে তো আর জাত যাবে না।

—না, তা যাবে না। তবে—শংকর মাথা চুলকাল।

—এর মধ্যে তবে আবার কী বাপু। কথায় বলেছে—পর ভেতো হয়ো, পর ঘ'রো হয়ো না। ঘর তো তোমার আলাদাই আছে। বল তো একটা ব্যবস্থা করি। আর তো বাপু তোমার অনাসিষ্টির রেঁধে খাওয়া চোখে দেখা যায় না।

কথা স্পষ্ট। কিন্তু মুহুর্মুহু ঘোমটা টানার চোটে মুখচ্ছবি অস্পষ্টই বলা যায়।

বৈরাগীবাবার আওয়াজ পাওয়া গেল সমর্থনমূলক। বামুনদিকে নিছক

একটু আমড়াগাছি করার জন্যই সে সমর্থন—বুঝতে কষ্ট হয় না।—লাখ কথার এক কথা বলেছো গো বামুনের মেয়ে।

—তুমি থামো দিকিনি—বৈরাগীর প্রতি বামুনদির কণ্ঠ ঝঙ্কার করে উঠলো।— পরের কথায় না'হক নাক গলানোর বড় বিটকেল স্বভাব তোমার।

চুপ করে গেল বৈরাগীবাবা।

বামুনদি শংকরকে উদ্দেশ করলেন—আর তোমাদের ঠাকুরও ঐ কথা বলছিলো।

ঠাকুর অর্থাৎ জগৎঠাকুর।

এরপর বামুনদি চলে যেতে বৈরাগীবাবাজী শংকরকে এসে পরামর্শ দিতে বসলো। বলল—সাত রাজার ধন শুনেছ গো সাত রাজার ধন। সেই যে একমানিক।

শংকর ঘাড় নাড়লো।—তা শুনিছি—

—শুনেছ বেশ। তেমনি সাত শাস্তরের সার হচ্ছে তোমার বোষ্টম শাস্তর। সেই বোষ্টম শাস্তরে কী লেখে শুনেছ?

—তা শুনিনি—মাথা নাড়লো শংকর।

—শোননি?—বৈরাগী শুধাল।

—উহুঁ—

—বেশ। তবে শোন—বলেছে আগাপাস্তলা উল্টো কথা। পর ঘ'রো হবে, পর ভেতো হবে না।

—তোমাদের শাস্ত্রে বুঝি আবার এই সব কথাও লেখা থাকে—

—থাকে আবার না! বাপরে বাপ। বোষ্টম শাস্তর হল মহাপ্রভুর শাস্তর; সে বড় বিরাট শাস্তর। বলেছি তো সাত শাস্তরের সার। পেশা ভিক্ষে সত্যি কথা। কিন্তু দুটো চাল ফুটিয়ে অন্ন করে নেবার বেলা সেই নিজের হাঁড়ি, গোসাঁই, সেই নিজের হাঁড়ি। গুরু গুরু।

শংকর সংকটে পড়ল। ভয়ে ভয়ে মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করবে ঠিক করলো। কারণ বৈরাগী যে তার অকৃত্রিম একজন কল্যাণকামী তার প্রমাণ তার কাজ। বৈরাগীর সঙ্গে যুক্তভাবে একবেলা স্বপাক আর অন্যবেলা কারখানার ক্যান্টিনে। নীট ফল ফলল। ঘুমুতে সেই রাত বারোটা।

বামুনদি চটলেন। শুনিয়ে শুনিয়ে ঠুকলেন ঠাণ্ডারামকে।—বোষ্টমের হাতে

খেতে জাত যায় না। জাত যায় বামুনদির হাতে খেতে। এমন বামুনের ছেলে আমি তো বাপু আমার বয়সে দেখিনি, বুঝলি ঠাণ্ডা—

—তাহলে এইবার দেখ—ঠাণ্ডারামের সেই চ্যাটাং চ্যাটাং উত্তর।

—তা বলবি নে। তুই নিজে হলি নেমকহারাম। তোরই তো বন্ধু বান্ধব—আর হবে কত।—মুখ ঝামটা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন বামুনদি।

ঠাণ্ডা সেদিক তাকিয়ে উজবুকের মত হাসল। তারপর শংকরকে বলল—বামুনদি লোকটাকে কেন মিছিমিছি চটাচ্ছ—গোসাঁই।

কার্যকারণ চট্ করে ধরতে পারল না শংকর। তবে বুঝল বামুনদির মেজাজ ঠিক নেই। অথচ বামুনদিরই শরণাপন্ন হবে ভেবেছিল এখনই। প্রায় হপ্তায় মাইনে পাবার কথা। এখন শুনছে নতুন ভর্তি হওয়া লোকেদের কি সব হিসেবের গণ্ডগোলের জন্য প্রথম কয়েক মাস, মাসে মাসে মাইনে দেওয়া হয়। মাসের শেষ হয়ে এলো। মাইনে পায়নি এখনও। প্রথম মাইনে। প্রথম স্বোপার্জনের মূল্য—নোটে, টাকায় আর আনি দুআনি পয়সায়। ভাবতে বিচিত্র লাগে।

দু একদিনের মধ্যেই মাইনে সে পাবেই। তখন সে আর কারও ধার ধারবে নাকি। কিন্তু এখনকার মত কিছু ধার একান্ত প্রয়োজন। লজ্জার মাথা খেয়ে যদিও শেষ পর্যন্ত বামুনদির ঘরের দাওয়া অবধি এসে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তাঁর মেজাজের খবর শুনে ইতস্ততঃ ভাব বৃদ্ধি পেলো। কেউ অবশ্য তাকে বলে দেয়নি যে বামুনদির কাছে ধার পাওয়া যায়। এ কিন্তু বাড়ীর আবহাওয়ায়, ও কথা কাউকে কেউ বলে দিতে হয় না।

বামুনদির দাওয়ায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বামুনদির সঙ্গে সম্পর্ক এখন তো আর মারফৎ নয়—প্রত্যক্ষ। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের লজ্জার আশঙ্কায় চিন্তিত হয়। হাজার লোক মন যে তার আর দশজনের তুলনায় অনেক ঠুনকো—এটা সে একেবারে বুঝতে পারে না। আজকাল এমন নয়। ভাবনা তাই। কিন্তু বামুনদিকে দেখলে কেমন যেন একটা অকারণ ভরসা আসে তার। কেমন যেন নির্ভর করতে নির্ভয় লাগে।

আর ভাবতে হলো না তাকে। ভেতর থেকে আওয়াজ এলো—হাবার মত অমন দাঁড়িয়ে আছো কেন গো ভ'র সকালে।

শংকর ঈষৎ লালাভ হল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। তারপর বলল—একটু আসবেন বামুনদি। কণ্ঠ থেকে জোর করে উৎসারিত স্বর যেন।

—আ আমার মরণ। একটু আসবেন! মরদ তো নয় যেন লজ্জাবতী মেয়ে কথা বলছে।

রং বদলালো শংকরের। এবার পীত। তবে একথা এতদিনে বুঝেছে বামুনদির গালমন্দকে আর যাই হোক ঠিক গালমন্দ বলা যায় না। বামুনদি কাছে আসায় গলাকে আর এক দফা পীড়ন করতে হলো স্বর সংযোগ করতে।

—বলছিলাম ইয়ে মানে পাঁচটা টাকা যদি যোগাড় করে দিতে পারেন। আমি দিয়ে দেবো এই দু একদিনের মধ্যে মানে ইয়ে আর কী।

—দিনে দিনে কী কথার ছিরি হচ্ছে গা, ইয়ে আর মানে, মানে আব ইয়ে। তা আমার কী টাকার গাছ আছে নাকি!—পত্রপাঠ ঝঙ্কার।

—না তা নয় মানে।—শংকরের মনে হলো ধরণী দ্বিধা হোক।

কণ্ঠে ঝঙ্কার অব্যাহত রেখেও পরমুহূর্তে বামুনদি সুর পাল্টালেন, বললেন—তা এসো, দেখি ওবেলায়। তোমাদের ঠাকুর আসুক, বলে কয়ে দেখি, যদি যোগাড় অন্ততঃ করতে পারি। ঘরের কর্তা তো সে, আমার তো আর নিজের কিছু নেই।

দুর্দাব্ আওয়াজ করতে করতে ঘরে ঢুকলেন বামুনের মেয়ে। ঘোমটা টানার বহর সমানই আছে।

যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো শংকরের। ঘরের মধ্যে থেকে গজর গজর শোনা যাচ্ছে তখনও।

—আমিও তাই বলি, পশ্চিমে যে সূয্যি উঠলো ব্যাপারখানা কি! বামুনদিকে দেখার জন্য গোসাঁইর দরদ যে একেবারে উথলে উঠল সকাল বেলা।

অন্য দাওয়া থেকে ঠাণ্ডারাম শুনে শুধালো রহস্য করে—কার সঙ্গে কথা বলছ গো বামুনদি।

—কার সঙ্গে আবার। বলছিলাম, লোহার খানা তো নয় খোঁয়াড়। পোহাতী তারা দেখে খোঁয়াড়ে ঢোক আর সন্ধ্যে তারা দেখে বেরোও। ও খোঁয়াড়ে যে ঢুকেছে তার টিকিটি দেখতে পাওয়া অমন চাড্ডিখানি কথা নয়।

শংকরের দেয়ালা করার আর সময় নেই। উর্ধ্বশ্বাসে ছুট মারার আয়োজন করতেও কিছু সময় লাগলো। কথায় কথায় বেলা হয়ে উঠেছে। ঠাণ্ডারাম ইতিমধ্যে কখন বেরিয়ে গেছে। সারাদিন গলিটায় লোক চলাচল কম থাকে। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ লোক সমাগমে গলিটা জমজম করে—হাতে সব টিফিনের কৌটো ঝুলানো। পথচারীদের আনাগোনা হঠাৎ বেড়ে ওঠে। তাও কমে এসেছে ইতিমধ্যে। শীতের সাড়ে সাতটা, কথাটা সোজা নয়। নির্ঘাৎ দেরি

হয়ে গেছে। কারখানায় গিয়ে টিফিনে অনেকে স্নান করে। উঠতে নিয়মিত দেরি হতে থাকলে ওটাই শংকর রপ্ত করবে কিনা বিবেচনা করছে।

ছোটার মাত্রা অত্যধিক বাড়াতে হল। ঢুকতে এক মিনিট বিলম্ব হলে সেই এক ঘণ্টার পূর্বে আর গেট খুলবে না। রোজ থেকে এক ঘণ্টার দাম কাটা যাবে। সোজা কথা নয়। পেটে ফিক ব্যথা উঠে যায়। পেট চেপে ধরে দৌড়তে হয় শেষ পর্যন্ত। মাত্র দু সেকেণ্ডের জন্য কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল লেটের কাঁড়া। ভিতরে গিয়ে একেবারে মেসিনের পাশে গিয়ে দম ছাড়ে।

ছোটার ক্লান্তিতে কুকুরের মত জিভ বার করে হাঁপায়। তবু তৃপ্তিতে বুক ভরে ওঠে। লেট্ তো বাঁচিয়েছে।

তাকিয়ে দেখে পাশের মেসিনে পাঁচুও হাঁপাচ্ছে। হাঁপানীর ধমকে পিঠের পেশী-গুলোর ওঠানামা দেখলে আতঙ্কিত হতে হয়। একে হাঁপানীর রোগী। তার উপর শয্যাত্যাগে বিলম্ব ঘটেছিল। তারও আজ একই অবস্থা।

বুদ্ধুর মেসিনে কাটা এক কাঁড়ি মাল তার মেসিনে এসে পরের স্তরের কাজের জন্য জমা হয়ে পড়ে আছে।

ডিপাটে ডিপাটে দৈত্য হুস করে গর্জন করে জেগে উঠেছে অনেকক্ষণ আগে। এ গর্জন আর সেই টিফিনের আগে থামবে না।

পাঁচুর শরীরের জন্য মেসিন ধরতে অনেক দেরি হল। বুদ্ধুর শরীরে মায়াদয়া নেই—শংকর ভাবলো। কারণ এই সুযোগ গ্রহণ করে সে ঠুকলো পাঁচুকে। নিজে ফূর্তিসে মালের বড়ি কাটা শুরু করেছে এক নাগাড়ে। সকালের দিকে কাজের গতি একটু দ্রুতই থাকে। তাকৎ তখনও থাকে তাজা। এ মেসিন, সে মেসিন থেকে নানারক শব্দ উঠেছে। কোঁ-ও-ও-ও। চ-ন্-ন্-ন্। ঠং-ঠং।

শংকর হাঁপিয়ে হাঁপিয়েই যোগান দিতে শুরু করেছে বুদ্ধকে। পাঁচু তখনও বসে।

বুদ্ধু ঠুকল—কোম্পানীর আদমীরা সব কুত্তা মাফিক দিনভর হাপাবে না কাম কাজ কিছু করবে।—বুদ্ধুর রকমই ওই। পাঁচু কোম্পানীর খাতায় ওঠার পক্ষে তার চেয়ে অযোগ্য একথা সে কিছুতেই ভোলে না। সুযোগ পেলেই পাঁচুর সঙ্গে খটাখটি লাগানোর এক বিদিকিচ্ছি অভ্যেস জন্মে গেছে।

বিব্রতের মত তাকায় পাঁচু। হাঁপানীর টান উঠে গেছে তার লেট বাঁচানোর কসরৎ করার পরিশ্রমে। সামলে নিতে সময় লাগবে। নইলে সেও জবাব দিতো মুখের মত।

শংকরের চোখ বুদ্ধুর হাতের পানে নিবদ্ধ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সে নতুন মাল কাটার কায়দা করণ। ঠিক এমনি করেই দেখে সে প্রত্যেক রকম মাল কাটার কসরৎ আর টুল সেট করার কারিগরি। মালকাটার চেয়ে মালকাটার জন্য টুল সেট করতে মাথা নাকি অনেক পরিষ্কার হওয়া চাই। মেসিনে হাত লাগাতে পায় কম। বুদ্ধ এদিকে টাইট। নাড়াচাড়া করার সুযোগ থাকলেও সে খিটখিট করে ওঠে। বলে—তুমি সব বরবাদ করে ফেলবে। আখেরে আমাকে ফেলবে নোকসানে।

সেদিন ঠাণ্ডা এসেছিল ভাইস শপে পুলের চামড়ার সেন্ট মেরামত করতে। শংকর ঠাণ্ডাকে ধরেছিল চেপে বুদ্ধকে একটু বলে দেবার জন্য। যাতে একটু মেসিন ধরবার আর কাজ শিখবার সুযোগ পায়। ঠাণ্ডা হেসে বলে—কারিগর লোকদের কাজ শেখানো হলো হাতের পাঁচ ভাই। প্রাণের দোস্ত সুপারিশ করলেও হাতের পাঁচ হাতছাড়া করে না তারা। বুদ্ধকে ওস্তাদ বলে মান, তাকে খুশী কর, তবে যদি রাস্তা পাও। কী বল বুদ্ধু ওস্তাদ।

বুদ্ধুর সামনেই কথা হচ্ছিল। বুদ্ধু শংকরের মিহি কাঁধে বিরাশি শিক্কার থাপ্পড় মারে আর চিল্লিয়ে ওঠে—দো মাহনা যেতে না যেতেই তুমি তামাম শিকে লিতে চাও বাবা। ইট্টু তর সইছে না—কেনে ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে এসেছ নাকি।

শংকর ডান হাত দিয়ে বাঁ কাঁধে হাত বোলাতে লাগল মুখ কুঁচকে। আর তাকাতে লাগল বুদ্ধুর দিকে।

ঠাণ্ডারাম পালাচ্ছিল। বুদ্ধু বললে—তুমি ভি ঘোড়ায় জিন চড়িয়েছো। লে বাবা—গরীব আদমীর ইট্টু চা-ই না হয় খেয়ে যাও।

—বলছো বটে। কিন্তু তোমার মত জায়গায় দাঁড়িয়ে তো আর আমার কাজ হবে না। সারা কারখানাময় ট্যাঙ্গোস ট্যাঙ্গোস করে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হবে। ভেবে দেখেছ—

বুদ্ধুও নাছোড়।—দেকেছি ভেবে হ্যাঁ। মগ এগিয়ে দিয়ে বলল—এ ছুকরা বাবু, চা লিয়ে এস তো আফজলের থেকে। তোফা চা বানায় আফজল—

কেনেস্তারের উপর থেকে বিরাট সাইজ মগ তুলে নিল শংকর।

—হা করে ভাবছো কী! শ্রিফ হা করে দৈঁইড়ে দৈঁইড়ে ভাবনা করলেই কী কামকাজ সব শিকে লিবে। ঐ যে নন্ত মিস্ত্রী দেখছ—বড় মিস্ত্রী। ওর থেকে কাম বাগাতে পাক্কা পাঁচটি বচ্ছর লেগেছিল এই শম্মার। গাঁটের পয়সা খরচ

করে ভি ফাইফরমাস খেটেছি। কত তালিম দিয়েছি—তবু আসল মাল কী ছাড়তে চায় ব্যাটা কঞ্জুস। বলুক ঠাণ্ডারাম।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়—কেনেস্তারার উপর বসে নিল ঠাণ্ডারাম।

শংকর পালাতে পথ পায় না মগ নিয়ে। ঠাণ্ডারামের উপর রাগও হল। খিঁচড়ে উঠল মন। ওঃ ওস্তাদের ফাইফরমাস খাটতে হবে। ঠাণ্ডারামও কম লোক নয়—দিব্যি সায় দিচ্ছে।

পরমুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে। কারণ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ক্রমে তীক্ষ্ণ হচ্ছে তার। কবে ঘি খেয়েছিল তার গন্ধ শুঁকবার চেষ্টা করে তার নাক আর নাকাল হয়ে পারে না। তার চেয়ে এই বুদ্ধ ওস্তাদের ফাইফরমাস খেটেও যদি কাজ শেখার সুযোগ পাওয়া যায়—তাই করা ছাড়া পথ কোথায়। তাতে কাজ তো শিখতে পারবে। যে ডাল আঁকড়েছে সে ডালের উপর হাতের কব্জি তো শক্ত হবে। আর ঠাণ্ডারাম! নাঃ কারও উপর আর সে রাগ করবে না। ওরকম রাগ করার মানেই বা কী!

রং ঝালাই লাইন এসে গেল। সামনেই আফজল বসে। মগটা রাখল আফজলের সামনে। চোখটা তার দিকে নিবদ্ধ। কিন্তু মন অন্যত্র।

কিন্তু এত করে শেষ পর্যন্ত কাজ ঠিক ঠিক শিখতে পারবে তো। ক্যাপ কাটার কায়দা করণ ওস্তাদের অসাক্ষাতেই সে আয়ত্ত করেছে—ওস্তাদ জানে না। কিন্তু টুল সেট। সেটাই তো আসল। চোখে দেখে দেখে সে হরেক রকম টুল বাঁধার কায়দা মুখস্থ করে ফেলেছে বলতে গেলে। কিন্তু হাতে কলমে কোথায় ঠিক আটকে যাবে কে জানে। যেমন আটকেছিল ক্যাপ কাটার বেলা। একটু আধটু ফাঁক যে পায় না এমন নয়। কিন্তু টুল বাঁধার কাজে হাত দিতে ভয় লাগে। তার আবার মাপজোখ নানারকম হিসেব। যে মাল কাটবে তার ডায়মেটার দেখ, স্ট্যাণ্ডের সাথে ক' সুতো ফারাক রেখে টুল বাঁধলে ক' সুতোর মাপে মালের ডায়মেটার কাটা হবে সে সব এক কাঁড়ি হিসেব পত্তর। দশ বারো রকমের মালের টুল বাঁধার পদ্ধতি সে দেখেছে। দু' তিনবার হাতও দিয়েছে কতক পরিমাণ। কিন্তু তবুও ভরসা করে না এত হিসেব পত্তর মাপজোখ করে হাত দিতে গিয়ে—কি জানি যদি ভাঙ্গচুর হয়ে যায় কোন একটা কিছু। টুল জিনিস নাকি বেজায় দামী। বুদ্ধর হবে ফাইন—এটাই রীতি। আর তার কপালে কী ঘটবে সে অনুমান করতে পারে না। নস্কর মিস্ত্রীর যা মুখ। তার উপর মেইন সাহেবের ইংরেজী গালাগালি—বাব্বাঃ দরকার নেই অত ঝামেলায়।

আফজল ইতিমধ্যে চা-এর মগে চা ভর্তি করেছে।

—খী—ছা যে ফানি অইয়া গেল।

রং ঝালাই-এর লাইনে গ্যাসের আগুনের কারবার। বেশ দূরেই দাঁড়িয়েছিল শংকর। গায়ে তাপ আসে অত দূরে থেকেও। আফজলেরা কাজ করে কি করে এত আগুনের তাপে। যে ক'জন কাজ করে রং ঝালাইএ, অধিকাংশই নোয়াখালির মুসলমান কারিগর। রোজ অল্প। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রায় প্রত্যেকেই বে-আইনীভাবে চা তৈরি করে বিক্রি করে কারখানার ভিতরে।

আগুনের তাপে বসে কাজ। তাই আইনতঃ দুধ পাবার অধিকারী এরা। গত ট্রিবুনালের রায়ে মাথাপিছু দু'বোতল দুধ বরাদ্দ। আফজলের হাতে এসে পৌঁছায় এক বোতল।

সেই এক বোতল দুধও প্রকাশ্য-গোপন চা বিক্রির ব্যবসায়ে লাগিয়ে দেয় সে। বলে—খী অইব। এ অইল হালায় ভাড়তি পাওনা। ধুদ খাইয়া ভিলাসিতা করণের চাইয়া নগদা পয়সা আইলে ঢ্যার লাব।

ও লাইনে পাঁচজন শ্রমিক। প্রত্যেকেই প্রকাশ্য-গোপনে চা বিক্রি করে। কারখানার শ্রমিকেরা খরিদ্দার। খরিদ্দার এলে বাঁ হাতে বড় মগের তৈরী করা চা গরম করে ঢেলে দেয়। এদিকে ডান হাতে ঝালাইএর কাজ তা বলে বন্ধ হয় না। দুহাত এমন সমান চালু।

প্রকাশ্য-গোপন চা বিক্রির জন্য মোহনবাবুকে নজরানা দিতে হয়। তাছাড়া তাঁর সারাদিনের চা উপরি।

বড়বাবুর চা তাঁর আপিসের কেরানীরা খায়। আর বড়বাবুর জন্য আসে দুধ গরম হয়ে। ইদানীং এক একদিন রঞ্জিতের টেবিলে গরম দুধের পেয়ালা পাঠান মোহন। এই বিশেষ খাতিরের ভিতরের কথা ভেবে রঞ্জিতের দুধ শেল হয়ে ওঠে।

দীপেশ আড় চোখে এসব দেখে। আর ফুরসৎ খুঁজে নিয়ে বলে—কি গো রঞ্জিতবাবু, চোলাই দুধের স্পেশাল খাতির যে—ব্যাপার কী মশায়।—তারপর অত্যন্ত সহজ মনেই ইয়ার্কি করে—জামাই করবে নাকি বুড়ো।

অত্যন্ত সহজ কথা অত্যন্ত অসহজভাবে আঘাত করে রঞ্জিতকে। সে প্রায় বেগুনী হয়ে উঠতে উঠতে সপ্রতিভ হয়ে হাসে। বলে—চোলাই দুধ মানে?

—চোলাই মদই হয় শুনেছেন। এখানে চোলাই দুধও হয় দেখবেন—

—কী রকম?

—রকম খুব সাধু। যেমন ধরুন রং ঝালাইএর পাঁচজন শ্রমিক। ওদের জন্য

আসে দশ বোতল দুধ। হিসেব শুনবেন—তিন বোতল, দু'বোতল আর পাঁচ বোতল—বুড়ো, বড় সাহেব আর ওরা পাঁচজন।

—ও এর নাম চোলাই। বোঝা গেল।

—বুঝলেন তো, এসব ভিতরের কথা—কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করলো দীপেশ—বে-জায়গায় বলিনি তো?

রঞ্জিত স্মিতহাস্যে আস্তে আস্তে বলে—আমি লোকটা খুব খারাপ নই, নির্ভর করতে পারেন।

জগমোহনবাবু এক একদিন মনের দুর্বলতাকে সাফাই করবার জন্যই বলেন—ছোট লোকদের দুধ পেওনের কোন মানে আছেনি। অ্যারা প্যাডে খাইব? ..। প্যাডে খাওনের দুধ দিয়া কিনা চা-এর ব্যবসা ফাঁদছে। একবার বড় সাহেবের কানে কথাডা উঠাইলে বেবাক দুধ বন্ধ হইয়া যাইব না।

দীপেশ পেছন থেকে তখন রঞ্জিতের কানের কাছে মুখ এনে দাঁত কিড়িমিড়ি করে বলে—বড় সাহেবের কানে তুললেই হল। নগদ পাঁচ পাঁচে ক্লীন বস্।

ভাবী শ্বশুরের কীর্তি কলাপ দেখে আর রঞ্জিত বমকে যায়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় লাইনে বেরুনোর ফাঁকে ফাঁকে আপিসের নির্দিষ্ট চেয়ারে এসে বসে উৎপাদনের হিসাব মিলাতে হয়। জগমোহনবাবুর দক্ষিণ দিক আলো করে তার চেয়ার পড়েছে।

সেদিন মাইনের কিউ পড়েছে শপে। এক একটা চেয়ার টেবিল নিয়ে এসে সব অফিসাররা বসে গেছেন মাইনে দিতে। পাশে একজন করে কেরানী অফিসারের হাতে টাকা তুলে দিচ্ছেন। অফিসার নির্দিষ্ট শ্রমিকের নম্বর ধরে ডেকে মাইনে দিচ্ছেন। আর টিক্ মারছেন। অফিসারের টিক্‌ই যথেষ্ট।

শ্রমিকদের এখানে টিপ দিয়ে বা সই করে মাইনে দেওয়ার রেওয়াজ নেই।

মাইনের দিনে কাজের কঠোরতা খানিকটা শিথিল হয়। জগমোহন একটা বিড়ি ধরিয়ে টানছিলেন। চোখের ওপরকার কাঁচা-পাকা ভ্রূগুলো নাচছিল। তাঁর চিন্তা করার লক্ষণ। ডাকলেন ভাবী জামাইকে—কেমন লাগত্যাছে—কাজকর্ম।

রঞ্জিত যোগ করতে করতে মুখ তুলে তাকাল। কিছু উত্তর দেওয়া উচিত হবে কিনা ভাবতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে ভাইস্ ডিপার্টের মোহন সাহেব

হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হলেন। রক্ষা পেয়ে গেল রঞ্জিত। মোহনবাবু এমনভাব করলেন যেন দেখতেই পাননি সাহেবকে।

পাইপ বার করলেন। দু'ভাগ করা সিগারেটের টুকরোর একটা টুকরো পুরে দিলেন পাইপের মাথায়। তারপর অগ্নিসংযোগ করলেন। ততক্ষণে মোহন সাহেব সামনের চেয়ারে বসে পড়েছেন।

—ব্যাড্ ব্যাড্ বেরী ব্যাড্ মিঃ মোহন।—মোহন আড়চোখে তাকালেন।

—ইনসাল্টিং বিফোর ওয়ার্কার ইজ বেরী ব্যাড্।—মেইন ক্ষোভ প্রকাশ করলেন অত্যন্ত সংযত ভাষায়।

রঞ্জিতের যোগ মাথায় উঠলো। কান আটকে গেলো কথাবার্তায়। একটু দূরে দীপেশের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। চোখে চোখ পড়তেই চোখ টিপল সে রঞ্জিতকে।

মোহন এতক্ষণে মেইনের পানে মনঃসংযোগ করলেন বাহ্যতঃ। তারপর ভ্রূ নাচিয়ে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করে ইংরেজীতে বললেন—বাট্, হোয়াট ডে? ইউ ইনসাল্টেড মি বিফোর অর্কার।

বলেই দন্তবিহীন মাড়ীর মধ্যে ঠোঁট দুটো ঢুকিয়ে ভ্রূকুটি করলেন।

মনে হোল মেইন ঘাবড়ে উঠেছেন। অফিসসুদ্ধ সকলে যেন একটু বেশী করে নিজ নিজ টেবিলে চোখ নিবদ্ধ করল। আসলে কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় সকলেরই অস্বাভাবিক উৎকর্ণ।

মেইন সাহেব কি বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মোহনের চেরা গলার দাপটে তা চাপা পড়ল।

—ইউ,—ফোরম্যান অব দি অন্‌লি রিপেয়ার স্যাকশান, এণ্ড আই—এ পর্যন্ত বলে বিরাট এক ছেদ টেনে চতুর্দিকে তাকিয়ে নিলেন ভ্রূকুটিভয়াল দৃষ্টিতে। তারপর বাক্যের অবশিষ্টাংশ শেষ করলেন—হ্যাড্ ক্লার্ক অব দি হ-অ-ল অব দি কম্পানী।

হ-অ-ল কথাটা একটু দীর্ঘায়িত করে উচ্চারণ করলেন। আর দক্ষিণ হস্তের তর্জনী মাথার উপর ঘুরিয়ে হ-অ-ল এর ব্যাপকতা নির্দেশ করলেন।

সারা ঘরে বিস্ফোরণোন্মুখ একটা চাপা হাসি যেন কিসে চেপে রেখেছে।

পরক্ষণেই আবার—মাই র‍্যাস্‌প্যাকট ইজ ল্যাস্?—উপর থেকে নীচু ও নীচু থেকে উপরে মস্তক সঞ্চালন করলেন কয়েকবার—যেন বোঝাতে

চেষ্টা করলেন মস্তক সঞ্চালনের ইঙ্গিতে যে বাক্যটি প্রশ্নবোধক। দীপেশের পানে চক্ষু নিবদ্ধ করলেন, শুধালেন—কি দীপ্যাশ্!

দীপেশ মুখ ভাবগম্ভীর করল, ভ্রূ কাঁচকালো, এবং তারপর পর পর দুবার সমর্থনসূচকভাবে মাথা নাড়লো।

মেইন কুপোকাত। কি বুঝলো সাহেব কে জানে। সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে বোকার মত মুখ করে উঠে দাঁড়ালো। মুখ বাঁকিয়ে কাঁধ দুটো শ্রাগ করেলো। তারপর বড়বাবুর মতে পলায়ন করল।

মোহনবাবু জগজ্জয়ের ভঙ্গিতে চেয়ারে সম্পূর্ণ দেহভার রক্ষা করে চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে লাগলেন।

দীপেশ বড়বাবুর সামনের চেয়ারে গিয়ে বসল।

ভাবসাব দেখে উঠতে গিয়েও ওঠা হল না রঞ্জিতের। দীপেশ বলল—খুব টাইট দিয়েছেন কিন্তু সাহেবকে বড়বাবু।

—টাইটের এখনতর হইছে কী।

—আবার লেগেছে বুঝি পেছনে?

—চুনো পুটি। ও আবার পেছন লাগবো কী! বড় সাহেবই টাইট দিছে। অর্ডারী মাল। সময় মত ভুইলা না দিতে পারলে দিব না টাইট! ফোরম্যান হইছ, স্যাকশান চালাইতাছ!

—অর্ডার ক্যানসেল করে দিল নাকি পার্টি?

সেয়ানা ছেলে বটে দীপেশ—রঞ্জিত দেখে শুনে ভাবতে লাগলো।

—দিবই তো। বার বার ইরেগুলার হইলে মুখ থাকবো নাকি কম্পানীর খদ্দের পার্টির কাছে। হেই লইয়াই তো বড় সাহেব আমার সামনে বইয়াই টাইট দিছে। ব্যাটায় বলে কিনা কণ্ট্রাক্টর সিস্টেম উঠাইয়া দাও। এ সিস্টেমে কাজ চালাইলে প্রগ্রেস হইব না, কোয়ালিটি খারাপ হইব, অ্যাফিস্তান্সি কইমা যাইব—হ্যান্ ত্যান্—

—আবার সেই পুরানো কাসুন্দি—বড়বাবু—

—আরে বল ক্যান্। লাজ লজ্জা আছে নাকি অ্যানা। হেই লইয়া ভাইস উপাটে দাড়াইয়া আমার লগে তক্ক। আর হেইয়ার নাম—শোনলাই তো—ইনসাল্ট—সাহেবের মানে ঘা লাগছে।

বোঝা গেল ব্যাপার। রঞ্জিত বেরিয়ে এল কালবিলম্ব না করে।

কেমন যেন ঝিম মারা ভাব কারখানায়। একদলের মাইনে নেওয়া শেষ

হয়েছে। পাঁচু তার মধ্যে অন্ততম। ইদানীং কোম্পানীর খাতায় উঠেছে বলে, কন্ট্রাক্টরের লোক বুদ্ধুর বিষ নজরে পড়লে কি হবে—নোট গুনতে গিয়ে পিত্ত জ্বলে যায় তার। বলে সহকর্মীকে—শালাদের ঘটে যদি ছিটে ফোঁটা বুদ্ধি বিবেচনা থাকে। শুধু কোম্পানীর খাতায় নাম ওঠা নিয়ে কী ধুয়ে খাব। চাকরি করেও যদি সেই উপোসের ভাবনা ভেবে মরবে—তো পুরো দেমাকের সঙ্গে খাটবে নাকি কারিগর লোকেরা—না খাটতে পারে?

পেছন থেকে রঞ্জিতের স্পর্শ। কোম্পানী-বিরোধী ভাবনা পাঁচুর আসে না এমন নয়। কিন্তু কথাবার্তায় সে যথেষ্ট সতর্ক। হঠাৎ ভয় হলো কারণ যতই হোক সবে কোম্পানীর খাতায় উঠেছে। তাকিয়ে দেখে মালবাবু মুচকি মুচকি হাসছে।

—কী কথা হচ্ছিল গো পাঁচু ভাই।

রঞ্জিত ইতিমধ্যে বেশ জমিয়ে ফেলেছে ভাইস ডিপার্টের শ্রমিকদের সঙ্গে—যাদের মধ্যে তার কাজ।

—কিছু পীরিতের কথা লয় গো মালবাবু, ভাগ্যের কথা বলছিলাম।

জমেছে বটে। কিন্তু ফ্যাসাদও হয়েছে কম নয়। কারণ অবস্থা তার সংকটের। কাজ কেরানীগিরি। দৈনিক মেসিনের উৎপন্ন মাল গুনে গুনে রেকর্ড করা, আর তার হিসাব নিকাশ দরকার হলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ও দৈনিক দাখিল করে সংশ্লিষ্ট ফোরম্যানকে কাজের গতি সম্বন্ধে হালফিল ওয়াকিবহাল রাখা। এমন কেরানীগিরি যার কাজ প্রত্যক্ষভাবে কারিগরদের নিয়ে। বাবু হিসাবে অবিশ্বাসের ভাব জয় করার প্রশ্নও নেহাৎ ফেলে দেবার নয় এখানে। অথচ কাজের অবস্থা আর কারিগরদের পরিশ্রমের বহর দেখে সহানুভূতিতে আপ্লুত হতে হয়। কিন্তু তার কতটুকু প্রকাশ করা সঙ্গত আর কতটুকু নয় তা বুঝতে দস্তুর মত হিমশিম খেয়ে উঠতে হচ্ছে এখনও।

সামান্য হাজিরা প্রসঙ্গই ধরা যাক। সেই ঘোর না কাটা শীতের প্রত্যুষে সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে কারখানাশ্রয়ী হাজারো মানুষদের শয্যাত্যাগ করে, প্রাতঃকৃত্য সেরে, এমনকি খাওযাদাওয়া পর্যন্ত সমাধা করে বেরিয়ে পড়তে হয় রাস্তায়—ভাবতে আসোয়াস্তি লাগে রঞ্জিতের।

কোন চারতলা বাড়ী থেকে দৃষ্টি দিলে মনে হয় পিঁপড়ের সারির মত কাতারে কাতারে উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান একপাল লোক। আরও উপর থেকে ধরা যাক বিমান থেকে, তখন আর 'মত' নয়—মনে হবে সত্যিকারের পিঁপড়ের সারিই চলেছে বুকে হেঁটে পিল পিল করে।

এসব মানসকল্পনা এরকম পরিবেশে দাঁড়িয়ে রঞ্জিতের আসেও। মানসকল্পনা কেকী—কারণ বলতে গেলে তখনও সে বিছানায়। কারিগরদের হাজিরা সাড়ে সাতটায় হলেও বাবুদের হাজিরা নটায়। বাহ্যতঃ তাই কারিগরদের মনে হতে পারে এ ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের বাবুপ্রীতির লক্ষণ। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী —পাঁচু এসে মাল কাটলে তবে তো মালবাবু রঞ্জিতের মালগণনার চাকরি শুরু করার কথা ওঠে।

এই ধরনের বিভিন্ন কারণে বাবু ও কারিগরদের সম্পর্ক মধুর হওয়ার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

পাঁচুর সমুখ থেকে পা ধীরে ধীরে এগুতে থাকে। শংকরও নোট গুনছিল একটু দূরে আর একটা মেসিনের আড়ালে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে। জীবনের প্রথম উপার্জন। ধাক্কাটা সামলাতে তাই দেরি হচ্ছিল। পেয়েই একটা গভীর তৃপ্তিতে প্রথমটা ঠোঁট চেটেছিল সে। তারপর কোথা থেকে এসে হাজির হল ইসাক। ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বাজপাখীর মত স্বীকৃত নজরানা। এরপর আছে কিছু ক্যান্টিনের পাওনা। চাকরির আশায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর নিজের রক্ত জল করা উপার্জনের টাকা থেকে ঝকঝকে নোট প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ত্যাগ করা—এই দুয়ের মধ্যে যে কত তফাৎ—শংকর এর আগে তা বোঝেনি এমন করে। পিতৃসত্যপালনের জন্য রামচন্দ্রের রাজত্ব ত্যাগও যেন এর চেয়ে অনেক সহজকাজ।

ইতিমধ্যে টিফিনের ঘণ্টা বেজে গেছে কখন ভ্রূক্ষেপ নেই। ঠাণ্ডার সঙ্গে সেই যে বেরিয়েছে বুদ্ধু ওস্তাদ পাত্তা নেই এখনও। স্ট্রাকচার ডিপার্টে কি গণ্ডগোল লেগেছে—চা খেতে খেতে খবর দিয়ে গেছে একজন। ঠাণ্ডারাম ছুটেছে। বুদ্ধু লেজুড়ে। কোথায় কোন ঘটনা ঘটলে—মেসিনের কাজকর্ম তার মাথায় ওঠে—সেখানে তার যাওয়া চাই। কেমন একটা উন্মাদনা পেয়ে বসে লোকটাকে!

যে যার লঘু আহারের পাট চুকিয়ে নিচ্ছে মেসিনের ছত্রছায়ায়। লাইটগুলো সব নিভে গেছে। অন্ধকার হয়ে উঠছে কারখানার অভ্যন্তরভাগ টিফিনের আধ ঘন্টার জন্য।

—কি গো অনেক টাকা পেলে বুঝি—এত সময় লাগছে গুনতে।

শংকর চোখ তুলে তাকালো। মালবাবু হাসছে। দূরে পাঁচুও হাসছে কথা শুনে। একথার কি বা উত্তর আছে। চোখ ফেটে জল আসতে চায়।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রঞ্জিতের মনে হলো চোখ দুটো ছল ছল করছে যেন শংকরের। অপ্রস্তুত হয়ে পিঠে হাত দিলো তার।

শংকর হাসলো ম্লান হাসি—হাঁ মানে—তা অনেক টাকাই। রঞ্জিতের মনে হলো হাসি তো নয়—যেন হাসির ছদ্মবেশ পরা আর কিছু।

শংকরের সে অনেকখানি ঘনিষ্ঠ হয়েছে সে। একটুখানি সহানুভূতিসূচক আচরণের দ্বারাই এখনও অল্পেই শংকরকে জানা যায়। বেচারা শংকর। ভদ্রলোক পরিবারের ক্ষীণ সামর্থ্য নিয়ে শ্রমিকের সমর্থ পায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা যে কী দুঃসহ—রঞ্জিতের ধারণা ওর মত এমন মর্মান্তিক ভাবে তা কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। তাই সহানুভূতির সঙ্গে শংকরের প্রতি শ্রদ্ধাও তার অপরিসীম। সে যা পারে না—জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক—শংকর সেই সাধনায় মত্ত। শুধু চিন্তাদ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর একাত্মতা অর্জন করার ফাঁকা চেষ্টা ছাড়া সে আর কি করেছে আজ পর্যন্ত?

রঞ্জিত শংকরকে টেনে নিয়ে এলো কারখানা ঘরের বাইরে। বলল—চল বাইরে খাওয়া যাক। একটু খোলা হাওয়ায়।

মৃদু আপত্তি জ্ঞাপন করলো শংকর—আমার খেতে হবে ক্যান্টিনে।

—কী খাবে—

—আমি? ভাত খাব।

—বেশ চল—

—আপনিও ক্যান্টিনে খান বুঝি?

—আমি? না—হাঁ খাই বৈকি মাঝে মাঝে।

কথাটা অবশ্য সত্য নয়। তবুও শংকরের সঙ্গলাভ করার একটা অদম্য বাসনা জন্মালো হঠাৎ।

ফটকের সামনেই কলতলা। টিফিনের খাওয়া সেরে ইতিমধ্যে কলতলায় এসে হাজির হয়েছে সব। কয়েক হাজার গোলামের জন্য মাত্র ত্রিশটি কল। লেখা আছে বটে উপরে "পানীয়"—কিন্তু কাজ চলছে সবরকম। কেউ টিফিনের বাক্স ধুচ্ছে, কেউ মুখ। একদল লোক—একজনের পিছনে আর একজন সারিবদ্ধ হয়ে—দাঁড়িয়ে আছে কলের প্রত্যাশায় অথচ অবকাশ মাত্র টিফিনের আধঘণ্টা। তারও কিছুক্ষণ ইতিমধ্যে ব্যয়িত।

এক অল্পবয়সী ছোকরা কারিগর ইতিমধ্যে গামছা পরে স্নান শুরু করেছে কলের তলায় বসে। পাশে উঁচুতে কাপড় রাখা। সকালে নির্ঘাৎ উঠতে বিলম্ব হয়েছিল

বেচারীর। মাথায় জল পড়ে কল থেকে আর চোখ বুজে বু বু করে শব্দ করে মুখে। আর একজন এসে দাঁড়াল। তার ধৈর্য কম। অধৈর্য ভঙ্গী সহকারে সে টিটকারি ছুড়তে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—কেয়া ভাই গোছল। বহুতাচ্ছা। লেকিন ভাইয়া—এইসি বড়িয়া কারখানা ঔর কাঁধার মিলোগে কহ। ইসপর গোছলখানা মিলোগে, দাওয়াইখানা মিলোগে—ইত্যাদি নানারকম খানা যোগ করল। পরে পুরো একটা বিরক্ত কটাক্ষে ছোকরাকে বিদ্ধ করে বিলম্বিত লয়ে শেষ করলো—সবহি মিলোগে ভেইয়া—লেকিন একঠো মেম নেই মিলোগে—বলে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় চতুর্দিক দৃষ্টি ঘোরাতে লাগল।

রঞ্জিত থমকে দাঁড়িয়ে গেল। দেখল বক্তা আর কেউ নয়। বুদ্ধু ওস্তাদ স্বয়ং।

দূরে ঠাণ্ডারাম দাঁড়িয়ে আছে। পরনে সেই কালিমাখা সাদা পোশাক। আর কাঁধে ঝোলানো যন্ত্রপাতির ঝোলা। কারখানার সর্বত্র তার গতি। তাই পরিচিতিও ব্যাপক। কোথায় কখন ডাক পড়বে কে জানে। কাঁধ থেকে ঝোলা নামানো অবস্থায় ঠাণ্ডাকে কল্পনা করা দুঃসাধ্য। কারখানা আর ঝোলা-হীন ঠাণ্ডারাম অচিন্ত্যনীয়।

ঠাণ্ডার মত যারা হালচাল জানে কারখানার তারা বলতে পারে বুদ্ধু ওস্তাদের একথার সূত্র কোথায়। মাসে মাসে কারখানা পরিদর্শনে পদার্পণ করেন সাহেবরা সব স-মেম। বুদ্ধুর পরিহাসোক্ত "মেম নেই মিলোগে"র সাথে উক্ত ঘটনার কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

—এই যে ঠাণ্ডারাম ভাই, আছ কেমন—

ঠাণ্ডা নড়ে চড়ে উঠলো। রঞ্জিতকে দেখে বলল—ও আপনি?

—হাঁ আমি, মালবাবু।

হো হো করে হাসলো ঠাণ্ডা।—জবর নামখানা বার করেছে আপনার।

বুদ্ধু এসে পড়ল এতক্ষণে—আরে মালবাবু যে, আরে মোশায়, এদিকে মার ডাণ্ডা ব্যাপার যে এস্টাক্‌চারে। চেয়ারে বসে বসে ঘুম মারবেন কি করে দুনিয়ার পাত্তা লিবেন।—বুদ্ধুর কথার ছিরিতে নেহাৎ আপন জনের পিত্ত জ্বলে যাবার কথা। রঞ্জিত শুধু হাসল।

শংকরের সঙ্গলাভ করতে তার আসা। শংকর এদিকে খানিকটা দলছাড়া হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে—ভ্রূক্ষেপ করতে ভুল হয়ে গেল তার। বুদ্ধুকে লক্ষ্য করে বলল—তাই বল। আমি এদিকে ওস্তাদকে খুঁজে মরছি—একদম পাত্তা নেই ওস্তাদের—

—আজকার দিনে ওস্তাদকে অত খুঁজলে আপনার খোঁজাটাই নোকসান। কিছু নাফা নেই মালবাবু—

ঠাণ্ডারাম যেন জানতো ও কী বলতে চায় তারপর, তাই বললো—একে আজ তলবের দিন, তার ওপর এস্টাকচারে মারডাণ্ডা—কি বল।

—জরুর! আজ ভি ফি ঘণ্টায় মালের হিসাব দিবে নাকি বুদ্ধু ওস্তাদ। বাড়ি দিয়ে তো যাবেন ছুটির টাইমে—একসাথে সব বুঝিয়ে দিব। আট ভাগ করে বসিয়ে লিবেন রেকাটে—ব্যস। আপনার দেপেশ বাবু ভি এইসা করতো।

রঞ্জিত এ আক্রমণে লজ্জা পেয়ে গেল।

—না না সে জন্য নয়। ওস্তাদ আমার দোস্তও তো বটে। দোস্তের সঙ্গে দোস্তের কি দেখা করতে নেই ওস্তাদ?

ঠাণ্ডারাম পরিস্থিতি বুঝে বলল—ছাড়ুন দিকিনি ওস্তাদের কথা। তা ইউনিয়ন আপিসে যাওয়া ছেড়ে দিলেন যে একেবারে।

—না না যাব বৈ কি। এক কারখানায় শেষ পর্যন্ত যখন কাজ করতে হল—না গিয়ে কি উপায় আছে নাকি! ব্যাপার কি বল দিকিনি স্ট্রাকচারে?

—মার্লো বলে সেই হারামী ফোরম্যানটা আছে না?

—হাঁ।

—মোহিনী সিংএর লাইনের এক কারিগরকে মেরে বসেছে রাগের মাথায় এক থাপ্পড। বরাবরই ব্যাটার ওই রকম মেজাজ।

—তারপর—

—তারপর আর কি। চেপে ধরেছে সবাই। মোহিনী সিং পর্যন্ত বিগড়ে গেছে। ব্যাটা ভাঙ্গে তবু মচকায় না।

—মোহিনী সিং মানে সেই সংগ্রাম কমিটীর······

—পিরসিডিং—বুদ্ধ পাদপূরণ করলো।

—ওরা বলছে ক্ষমা চাইতে হবে। মার্লো সাহেব কারিগর লোকের কাছে মাথা হেঁট করবে না কিছুতেই। এখন বড় সাহেবের কাছে গেছেন মোহিনী সিং খোদ। বড় সাহেব এসে যদি মার্লোকে বোঝাতে পারেতো·········

—নইলে?—রঞ্জিত উদ্‌বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করল। খুব ঠাণ্ডা মাথায় হাসল ঠাণ্ডা। রঞ্জিত অনুভব করে এরকম পরিস্থিতির মুখে ঠাণ্ডারামের ব্যক্তিত্বের নিকট সে অনেক অসহায়। সে জানে না নইলে কি হবে। কিন্তু ঠাণ্ডা জানে।

বুদ্ধু নিজের ময়লা গেঞ্জিটা টেনে টেনে লম্বা করতে করতে বিকটভাবে চিল্লিয়ে উঠল—নেহি হেট্ট হোগা তো ট্রাইয়া হোগা।—ভাবটা যেন ট্রাইয়া নামক বস্তুটি তার হাতের মেসিনের স্টিয়ারিং হুইল মাত্র। শুধু মোচড়ের অপেক্ষা।

বলবার ভঙ্গীটি হাস্যকর। রঞ্জিত কিন্তু হাসে না। একদৃষ্টিতে লোকটার দেহের স্ফীত বাঁধুনির দিকে তাকিয়ে থাকে। বক্ষোদেশ যেমন প্রশস্ত পাণ্ডুর রং আর হাড় বার করা মুখের চোয়াল তেমনি নিষ্প্রভ। শুধু মাত্র মুখের অস্বাস্থ্যের পানে চাইলে মনেই হয় না—বুকের ছাতি আর স্ফীত শিরা বহুল পেশীতে ওর বিস্ময়কর শক্তি আছে। কারিগর জাতিটাই অদ্ভুত। ওদের জীবনী শক্তি প্রবাহিত দেহে—মুখে নয়। ক্ষয়, ক্ষতি, দারিদ্র্য আর যাবতীয় দুঃখ দাহের ছাপ পড়ে মুখমণ্ডলে তাই মুখে অস্বাস্থ্য।

কিন্তু ঐশ্বর্য্য দেহে, সৌন্দর্য বাঁধুনিতে। তোবড়ানো গালের উঁচু হয়ে থাকা হাড় যেমন অসহায়—সহায় তেমনি বিস্তৃত বুক আর সতেজ পেশী।

ঠাণ্ডা ওস্তাদের হাত ধরে টেনে পালালো। বলল—ওস্তাদের মুখ তো নয় ক্ষুর। ক্ষুরের ধারে আপন পর ভেদ নেই। সব পাটিই কাটে। ওর কথা ধরবেন না। ও শালা পাগল।

বুদ্ধু কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বললে না। চলে গেল ঠাণ্ডার সঙ্গে।

শংকরকে খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল সেও পালিয়েছে কখন কিছু না বলে।

রঞ্জিত কারখানা ঘরের ফটকের মুখে আবার ফিরে এল। ঝিমমারা অভ্যন্তর ভাগে তাকাল। শ্রান্ত দৈত্যের মত সে ঝিমোচ্ছে। আর মেসিনের পাশে পাশে শ্রান্ত শ্রমিকদের অবকাশ নেবার জটলা। লাইট নেভা আলো আঁধার কারখানা ঘরের মধ্যে তাকাতে মনেই হয় না—এই শান্ত সুবোধ যন্ত্রগুলি কয়েক মিনিটের মধ্যে দামাল দানবের মত জেগে উঠবে। যেন ঘুমন্ত কুম্ভকর্ণ।

ঘুমন্ত কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হল কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘর্ঘর আওয়াজে চারদিক তোলপাড় করে। বাকী দিনের কর্মব্যস্ততার ফাঁকে আর ঠাণ্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি রঞ্জিতের। কিন্তু ঠাণ্ডার কাছ থেকে মেইনের জবাব জানবার জন্য অত্যন্ত শিশু-সুলভ ভাবে মন উসখুস করেছে বারংবার। কারখানা জীবনের শ্রমিক বিরোধের উত্তেজক অনেক সংবাদ সে এযাবৎ সংবাদপত্রে পাঠ করেছে। কিন্তু ঘটনার এত প্রত্যক্ষ প্রতিবেশী হওয়ার অভিজ্ঞতা নতুন বলে মনের মধ্যে উত্তেজনার তেজ এত তীব্র ও রোমাঞ্চক।

॥ ছয় ॥

শনিবারের বারবেলা। হাসপাতালের দর্শনার্থীদের ঘরে অভাবনীয় ভাবে জগমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো রঞ্জিতের। জগমোহন একটি মেয়ের সঙ্গে বসে কথা বলেছিলেন। রঞ্জিত প্রথমে না দেখার ভান করলো। চিরকুট পাঠালো ভিতরে। একটা থামের আড়ালে বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। আত্মগোপন করার ইচ্ছা।

শেষ পর্যন্ত জগমোহনের দৃষ্টি থেকে অবশ্য অব্যাহতি পাওয়া গেল না। জগমোহন কখন যেন লক্ষ্য করেছেন। রঞ্জিতের পাশে এসে বসলেন মৌজ করে। আর সঙ্গে সেই মেয়েটি।

—আরে বাবাজী এইখানে।

—আপনি ?—অগত্যা জিজ্ঞাসা করতেই হল রঞ্জিতকে।

—আর বল কেন ? এইডি আমার মাইয়া। তুমি তো দেখ নাই এখনও—

কোন রকমে এড়াতে পারলে বাঁচে বুড়োকে। তাই বলে—আজ্ঞে না—অত্যন্ত সংক্ষেপে। কিন্তু জগমোহন যে মানুষ—সে আশা কম—তাই সশঙ্কিতচিত্তে অপেক্ষা করতে থাকে—কি জানি আরও কী বেকায়দা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

ময়নামতী নমস্কার করল। কালো চশমার ভিতর দিয়ে কৃত্রিম চোখটা চেনা যায় না। বাধ্য হয়ে রঞ্জিতকেও জানাতে হলো বিনিময় নমস্কার।

—দেখ তুমি নি বুঝাইবার পার। আরে—এই তো তোর কোন আজগুবী সখ। মাইয়া আমার চাকরি করস। দায়ে না ঠ্যাক্‌লে, প্রয়োজন না পড়লে পুরুষ পোলাইনি চাকরি করণ চায়। যতই না কও সেই দাসত্বই তো।

এসব কথা ময়নামতীর পছন্দসই নয়। কটমট করে বাপের পানে চেয়ে ভ্রূকুটী করে সে।

রঞ্জিত একটু বিস্ময় বোধ করে। জগমোহনের যে কন্যার খবর সে জানে সে চাকরি করে বলে তার জানা ছিল না!

যাই হোক এ এক অভাবনীয় পরিস্থিতি। শনিবার সীতার বাড়ী যাওয়ার দিন। তাই রঞ্জিতের চিরকুট পেলে সে একেবারে তৈরী হয়ে বাইরে আসে। সীতা এসে পড়ল। পরিস্থিতির প্যাঁচ থেকে আত্মরক্ষার একটা উপায় হোল।

এসেই জিজ্ঞাসা করল—একী ময়না! তোর সঙ্গে পরিচয় আছে বুঝি রঞ্জিতদার ?

ময়না বলল—না। পরিচয় আমার বাবার সঙ্গে—

জগমোহন বাবু জানালেন সঙ্গে সঙ্গে—হ, আমার অপিসেই যে চাকরি করে বাবাজী।

রঞ্জিত প্রমাদ গণল। বিস্ফারিত চোখে সীতা কি একটা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে চুপে গেল।

রঞ্জিত দেখল কথাবার্তার জালে জড়িয়ে পড়া যুক্তিযুক্ত নয়। তাই বেশ অশোভন ভাবেই উঠে পড়ল কথার মাঝপথে। জগমোহনের জেরা সবে শুরু হয়েছে—ইনি বুঝি হইতেছেন তোমার······

বেঞ্চি থেকে উঠে পড়েছে রঞ্জিত ততক্ষণে। যেতে যেতে কথার মাঝখানে বুড়োকে থামিয়ে দিয়ে উত্তর করল—হঁা আমার আত্মীয়া। এস সীতা। ওদিকে দেরি হয়ে যাবে আবার।

জগমোহন ঠিক ভালভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না তার বাবাজীর এতাদৃশ আচরণ। চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে। সামনে দীপেশ থাকলে হয়ত জিজ্ঞাসা করতেন—কি হে দীপ্যাশ, ব্যাপারডা যেন কেমন কেমন ঠ্যাকৃত্যাছে।

তারপর বসে বসে ময়নামতীকে জিজ্ঞাসা করলেন একসময়—তুঁরা তো আধুনিক মাইয়া হইছস। বলতে দোষ নাই। এইরকম পোলার লগে যদি তুঁর বিয়া করাই—

প্রথমে ময়নামতী চুপ করেই থাকবে ভাবলো। কিন্তু পারল না। বাবাকে প্রচ্ছন্নভাবে ধমকই দিল বলতে গেলে—আচ্ছা বাবা, তুমি কি আমার দাদু।

বুড়ো চমকে গেল মেয়ের কথায়।—হঃ কথাডা তো মন্দ কস নাই।

ময়নামতী অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো আপন মনে বেশ সাবধানে। মনে মনে গোটা ব্যাপারটা ভেজে নেবার চেষ্টা করল। মনে হল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যেন সমস্তটা। তবু "এইরকম পোলার" একটা খটকা রয়ে যাচ্ছে। অস্পষ্টতার ঘোর তাই কাটছে না পুরোপুরি।

তাঁর রূপ আর অঙ্গহীনতার গুরুতর ত্রুটির কথা জেনে যারা তাকে বিয়ে করতে চাইবে হয় তারা দেবতা, নইলে তাদের অন্য উদ্দেশ্য আছে বলে তার একান্ত বিশ্বাস। তার বাবার বাবাজী, সীতার রঞ্জিতদা—বাবার অফিসে চাকরি করে। তবে তার অমতে বাবা কি এরই বাগ্‌দত্তা করেছেন ময়নামতীকে! কথা দিয়েছেন বলেই কি এত পীড়াপীড়ি! রঞ্জিতদাকে অনেক দিন দেখেছে সে সীতার কাছে

আসতে। সে আলাপ করতে উৎসাহ বোধ করেনি তেমন। যেমন কোন ছেলের সঙ্গেই সে উৎসাহের সঙ্গে আলাপ করতে অভ্যস্ত নয়। আচ্ছা ভদ্রলোক চুলগুলো অত বড় বড় করে রাখেন কেন। খোঁচা খোঁচা দাড়িও কি সময় মত কামাতে পারেন না। বাড়ীতে কি মা বোন কেউ নেই এসব তত্ত্ব নেবার।

কত আর বয়স ভদ্রলোকের। জোর বাইশ। কিন্তু সেজে থাকবেন যেন বত্রিশ। একি ওদের কারও চোখকে পীড়া দেয় না! নইলে একজোড়া স্বপ্নালু শানিত চোখ, মিশকালো জোড়া ভুরু, উদ্ধত নাসা,—রংটা কিঞ্চিৎ চাপা কিন্তু বিস্তৃত কাঁধ দুটো—সব মিলিয়ে সীতার রঞ্জিতদার চেহারাটা তো নেহাৎ……। হঠাৎ লজ্জা পেয়ে যায় মনে মনে।

এসব কথা মনে আসার কোন মানে হয় না। কারণ সীতাই তো আছে—বোন। ভদ্রলোকের অভ্যেসই হস তো এ'রকম আগোছাল। সীতা কী সত্যি বোন!—না পাতানো রঞ্জিতদা! অন্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাতানো দাদাদেরই যে জয়জয়কার আজকাল।

যাই হোক এসব অস্পষ্টতা এখানে দাঁড়িয়ে দূর করা সহজও নয় সম্ভবও নয়। নানারকম সাতপাঁচ ভেবে আচমকা রাজী হয়ে গেল জগমোহনের সঙ্গে বাড়ী যেতে। অনেকদিন সে বাড়ী যায়নি। কাজেই জগমোহনের কাছে অচিন্ত্যপূর্ব মেয়ের সম্মতি। অত্যন্ত উৎফুল্ল হলেন তিনি। নিজের হাতযশের কথা চিন্তা করে ডগমগ হলেন আত্মতৃপ্তিতে। আর ফোকলা গালের সেই অনবদ্য হাসি এবং চোখ কুৎকুৎ করে ওঠা চশমার নীচে। দীপেশ সামনে থাকলে নিশ্চিত শোনাতেন—ওষুধ ধরছে, বোঝলা দীপ্যাশ।

কন্যা সম্পর্কে জগমোহনের উদ্‌বেগের ভাবটা এতে করে কিঞ্চিৎ প্রশমিত হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু রঞ্জিতের মন বড্ড থমথমে হয়ে উঠলো রাস্তায় উঠে। ময়নামতী আর সীতা আর জগমোহন এদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রচণ্ড অসৎ মনে হচ্ছিল। কথা বলতে হচ্ছিল যেন চোরের মত—যা সর্বাপেক্ষা সে ঘৃণা করে।

যদিও হলফ করে সে বলতে পারে না এই ময়নামতীই সেই প্রতিশ্রুত পাত্রী। কিন্তু একথা তো হলফ করে বলতে পারে সীতাকে দেয় কোন প্রতিশ্রুতি তার নেই এখনও পর্যন্ত। অথচ এদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার মনে হচ্ছিল যে কোন এক পক্ষের সম্মুখ থেকে পালাতে পারলে সে যেন বাঁচে।

পথে উঠে সে সীতার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল উর্ধ্বশ্বাসে। সীতা

তো অবাক। বলল—কী ব্যাপার হঠাৎ এমন মরিয়া হয়ে উঠলেন কেন রঞ্জিতদা?

এমন করে তার হাত ধরা এই প্রথম।

খেয়াল হতে হাত ছেড়ে দিল রঞ্জিত। একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামালো হাত তুলে। ট্যাক্সি থামতে, কোন কিছু জিজ্ঞাসার অবকাশ না দিয়ে প্রায় ধাক্কা মেরে সীতাকে ট্যাক্সিতে চড়ালো। তারপর তার পাশে গিয়ে নিজে বসল। সীতা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলো।

—ড্রাইভার চালাও—সোজা দক্ষিণে—

গাড়ী স্টার্ট নিলো।

—কিছুই তো বুঝতে পারছি না রঞ্জিতদা আপনার কাণ্ডকারখানা—

—ভূত দেখেছি—

মনের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে তোলপাড় করে। বিবেক ত্যাগের অর্থ কি সম্পর্কের এই দ্বৈততা? যে দ্বৈততার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে চোর মনে হয়। মনে হয় নিজেকে একান্ত ছোট বলে। তবে এ দ্বৈততার অবসান হোক আজই, এখুনি! আবেগ-তাড়িত সিদ্ধান্ত সঙ্গে সঙ্গে।

একদিক থেকে আজ ভালই হোল। সীতা সম্পর্কে নিজের কাছে নিজের মন এমন পরিস্কার হত না—এঘটনা না ঘটলে।

সীতা ঠিকই বলেছে। সে যেন মরিয়াই হয়ে উঠেছে। অথচ কয়েক দণ্ড পূর্বে সে চিন্তা পর্যন্ত করে নি—এমন মরিয়া হয়ে উঠতে হবে তাকে। সীতার সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে আর গড়াতে দেওয়ার পরিণতি হবে আরও জটিল। সীতার সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে একটা জায়গায় এনে দাঁড় করাতে হবে আজই, এখুনি।

আর সে সম্পর্ক যদি প্রেমই হয়—তবে জেনেশুনে প্রেমে পড়ার ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দান করার পক্ষপাতী সে নয় কোন কালেই। কাজেই তত্ত্ব হিসাবে প্রেমে পড়ার ব্যাপারটাকে নাচক করল মনে মনে। এবং প্রেম করা তত্ত্বের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখার জন্য চটপট মনে মনে ছক কসে ফেলল কার্যক্রমের।

এসবই তার ঘটনা-তাড়িত তৎক্ষণাতের সিদ্ধান্ত। সীতা জিজ্ঞাসা করল—কোথায় চলেছি আমরা রঞ্জিতদা—

—কোথাও না।

—তার মানে—

—তার মানে ট্যাক্সিটা এখন কিছুক্ষণ ঘুরবে—

—ঘুরবে মানে !—চোখ কপালে তুললো সীতা। এরকম অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সে পড়েনি।

—ঘুরবে মানে, ধরমতলা শ্যামবাজার, শ্যামবাজার ধরমতলা······এমনি করে ঘুরপাক খাবে খানিকক্ষণ।

—খানিকক্ষণ ?

খুব গম্ভীর ও মোটা গলায় শোনাল রঞ্জিত।—হাঁ খানিকক্ষণ। কারণ তোমার জন্য আমার অনেক কথা জমা হয়েছে সীতা।

দুপাশে সেন্ট্রাল এভিনিউএর বড় বড় বাড়ীগুলো সরে সরে যাচ্ছে ক্রমশঃ। আর সরে যাচ্ছে বাস, রিক্‌শা, আর মানুষ ছবির মত।

সীতা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না। তার সন্দেহ জাগছে রঞ্জিতদা প্রকৃতিস্থ কিনা! মুখে জিজ্ঞাসা করল—তার জন্যে ট্যাক্সিকে ঘুরপাক খাওয়াতে হবে খানিকক্ষণ ?

—কারণ ট্যাক্সি ছাড়া কলকাতার শহরে একান্তে কথা বলার মত নিরালা স্থানের একান্ত অভাব।

এরকম অদ্ভুত কথা কে কবে শুনেছে সীতা জানে না। চিবুক ডান হাতের চেটোর উপর রক্ষা করে বাঁ চোখের ভ্রূ তির্যক করে জিজ্ঞাসা করল—

—খুব ভাল কথা। তা খানিকক্ষণ মানে আপনার হিসাবে কতক্ষণ অর্থাৎ ক'ঘণ্টা ?

—তা ঠিক বলতে পারি না এখুনি—কারণ তোমার সঙ্গে কথা শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে, তার উপর নির্ভর করবে ক'ঘণ্টা ঘুরপাক খাবে ট্যাক্সি।

সীতা মনে মনে বলল—তাজ্জব কাণ্ড বটে। প্রকাশ্যে বলল—কিন্তু মিটার যে অনেক উঠবে।

—তা উঠুক—

—নতুন চাকিরর মাইনে পেয়েছেন, না ট্যাক্সিকে যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুরপাক খাওয়াবো বলে ঠাকুরের কাছে মানত নিয়েছেন—

একটু চুপসে গেল রঞ্জিত। কারণ চাকরির খবরটা এমন ভাবে ওর কানে উঠেছে মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে যাতে ন্যায্যতঃ একটু বিক্ষোভ প্রকাশ করার থাকতে পারে তার। চাকরির খবর সে এখনও ফাঁস করেনি।

গলা একটু নামিয়ে আর কণ্ঠে ভাবোচ্ছ্বাস থামিয়ে বলল—মানত আমি

ঠাকুরের কাছে করিনা এ তুমি জানো সীতা—মানত যদি করেই থাকি তো সে একমাত্র মনের কাছে।

কেমন যেন আবেগ ভরে কথা বলতে ইচ্ছা করছে তার। পূর্ব থেকে এত ছক কষেও—অহেতুক কথার উপর কথা সাজানোর কেমন একটা মাদকতা লাগছে তার।

মৃদু একটু হেসে সীতা মুখে বলল—সাবধান! আবার কিন্তু আলাপগুলো সংলাপ হয়ে উঠছে আপনার।—আর সমস্ত ঘটনাটা তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল। কপালে ভাঁজ পড়ল। অধরে দৃঢ়তা ফুটে উঠতে লাগল—একটা সংকল্পের। রঞ্জিতের গরমিল আচরণের আঘাতে হতবাক হওয়ার ঘোর দূরে ছুড়ে ফেলে শক্তহাতে ঘটনার রাশ ধরবার জন্য সচেষ্ট হলো সে। ক্ষণেকের মধ্যে সে পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার কথায়—আপনার উপর দেখছি গার্জিয়ানির রাশ একটু আলগা দিলে আর রক্ষে নেই।

আরক্তিম নয়নে তাকালো রঞ্জিত।

—অমন করে তাকালে কী হবে। একটুখানি কথা গুছিয়ে যে বলতে পারে না তার কোন কথা আমি শুনতে চাই না।

কি একটা আরও বলতে যাচ্ছিল রঞ্জিত। কিন্তু সীতা নিজেকে অত্যন্ত সজোরে প্রতিষ্ঠিত করে মুখ বন্ধ করল রঞ্জিতের—উহুঁ কোন কথা নয়। ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাও—যশোর রোড।

বৌবাজার পার হয়ে সবে মিশন রোর বাঁক ধরেছে ট্যাক্সি। ঘ্যাচ করে থেমে গেলো। পেছনে তাকালো ড্রাইভার। চোখে সপ্রতিভ মুচকি হাসি একটু। রঞ্জিত তখনকার মত কেমন যেন আড়ষ্ট মেরে বসে থাকল। বাধা দিল না।

অন্যদিন মণিমার কাছে যাওয়ার কথা প্রথম। আজ ব্যতিক্রম হল। সীতার বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো ট্যাক্সি। ট্যাক্সি বিদায় করে প্রথম কথা বলল সীতা—এবার প্রমাণ হোল তো—ঠাকুরের কাছে মানতের চাইতে আপনার মনের কাছে মানত কত নিষ্ফলা।

রঞ্জিত হুম করে গম্ভীর হয়ে গেল।

এরপর বাড়ী প্রবেশ পর্ব, মা বাবার সঙ্গে দেখার করার পর্ব শেষ করে দুজনে এসে বাইরের ঘরে বসল।

সীতা বলল—আপনি আজ কিছু খেয়েছেন নাকি?

রঞ্জিত হেসে ফেললো।

—ছি ছি আপনি হাসছেন ?

এই সমান ভিত্তিতে কথা বলার প্রচেষ্টা আজ কিছুমাত্র উষ্মার সঞ্চার করে না রঞ্জিতের মনে।

—নইলে এত বেমানান আপনি হতে পারেন এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

রঞ্জিত কিছু না বলে জানালার ধারে চেয়ার টেনে আনলো। অনুভব করলো নিজেকে এবার একটু অধিক শক্ত করা প্রয়োজন। জানালার ওপর লতানো শিমগাছের একটা কচি ডগা আলতো করে এসে ছুঁয়েছে। তারই ফাঁক দিয়ে দৃষ্টিগোচর হয় একফালি পশ্চিমের আকাশ। গোধূলির বর্ণ সমারোহে উজ্জ্বল একফালি অপরূপ আকাশ।

রঞ্জিতের মনের অবস্থাটা বেশ তরল। তাই যোগাযোগটা হঠাৎ বিচিত্র লাগে। আকাশে গোধূলির রং। পৃথিবীতে তার মায়া। প্রাণে প্রেমে পড়ার নিরুদ্ধ আবেগ। আর বুদ্ধিগোচর মনের যে অংশ সেখানে হাতড়ালে পাওয়া যায়—প্রেম করার প্রতি আনুগত্য-বোধের দুরন্ত এক ছক কষা প্রচেষ্টা।

কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয় আনল রঞ্জিত। বলল—কোণ আঁধার থেকে জানালার ওপর এসে বস।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানালায় পিঠ লাগিয়ে এসে বসতে হল সীতাকে ওর মুখোমুখি। মা এসে এক সময় চা দিয়ে গেলেন। যেন বলে গেলেন কিছুক্ষণের জন্য ঘরের নিরালা ভঙ্গ করার কেউ নেই।

সীতার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে প্যাট প্যাট করে চেয়ে রইল রঞ্জিত। এমন করে মুখোমুখি বসা রঞ্জিতের সামনে সীতার মনে হল—এই প্রথম। কেমন অসোয়াস্তি আর অস্বাচ্ছন্দ্য লাগলো। অবস্থাটা কাটানোর উদ্দেশ্যে নীরবতা ভঙ্গ করল সীতাই আগে।

—কী আপনার এমন জরুরী কথা এইবার বলে ফেলুন দিকিনি।

—জরুরী কিনা বলা মুশকিল, কিন্তু অত্যন্ত একান্তে বলার কথা। কিন্তু একান্ত স্থানের কত অভাব বল তো—পার্কগুলো গিজ গিজ করে লোকে, বাড়ীর ঘরগুলো বাড়ীর লোকে উপচে থাকে আর সেই জন্যই তো আমার ট্যাক্সির স্কীম।—কেমন একটা কৈফিয়তের সুর। স্কীমটা যে উদ্ভট সেটা উপলব্ধি করার আভাসও আছে কৈফিয়তে।

এরকম পরিস্থিতিতেও সীতা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসল। মুখে বলল—সে তো বললেন একবার।

অন্য কেউ হলে সীতা নির্ঘাৎ বলতো যে একান্ত কথা ট্যাক্সি ছাড়া ভূভারতে বলবার ঠাঁই হয় না, সে একান্ত কথার হাত থেকে, দোহাই আপনার, মুক্তি দিন আমাকে।

কিন্তু রঞ্জিতকে দেখে আসছে বহুদিন। তাই তার মত মানুষের পক্ষে—মনের মধ্যে বিষম একটা কিছু তোলপাড় করা অবস্থার সৃষ্টি না হলে এরূপ উদ্ভট আচরণ অসম্ভব। ভেবে উল্টে সহানুভূতিতে আপ্লুত হল সীতা। দু'একবার চিন্তা করার চেষ্টা করল—একান্ত কথা কী হতে পারে। আর এ কথাও চিন্তা করল যে এ পরিস্থিতিতে একান্ত কথা একটাই হতে পারে—আর সেরূপ একান্ত কথার প্রায় সম্মুখীন দু'একবার তার ছোট্ট জীবনে যে হয় নি এমন নয়। কিন্তু রঞ্জিতদার একান্ত কথার গোত্রও কি তাই হবে। চিন্তাকে মুক্তি দিল সে।

জানালার বাইরে আলো আঁধারের আলিঙ্গন। যেন একটা মহান চিত্রপটের পশ্চাৎপট। আর জানালার ফ্রেমের মধ্যে ভাবগম্ভীর সীতার উপবেশন যেন শিল্পীর সুনিপুণ টানে টানে অঙ্কিত সেই মহান চিত্রখানি।

এমন করে মনের রং এ কল্পনার বন্যাকে উদ্দামবেগে ছোটানো—এ না হলে আর রঞ্জিত।

মৃদু হাওয়ায় সীতার শিথিল দুচারটি কেশগুচ্ছ কপালের উপর এসে পড়ছে। আর মাঝে মাঝে অবাধ্য সে চুলগুলি সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে সীতা তার পেলব আঙুল দিয়ে।

নীরবে মুগ্ধ দর্শকের মত চিত্রখানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যেন আর শেষ হয় না রঞ্জিতের। অত্যন্ত নির্লজ্জ মুখোমুখি বসে একান্ত কথা শোনার ক্ষণ গোনাও যেন আর শেষ হয় না সীতার। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে জানালার দিকে মাথাটা হেলিয়ে দেয় সীতা আর আয়ত চোখের পল্লব মুদ্রিত করে আলতো করে।

ফলে চিত্রখানি যেন আরও নিখুঁত হয়ে ওঠে রঞ্জিতের মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

মনে হয় এক দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে পীড়ন করছে অহর্নিশ। মনে হয়—কী নিদারুণ ভালই না বাসে মেয়েটাকে। সুপ্ত কামনারা আবেগের তারে তারে কিলবিল করে ওঠে। দক্ষিণ হস্ত জানুর ওপর বিন্যস্ত সীতার পেলব হাতের চেটোর মধ্যে উঠে আটকে যায়। আচমকা কেঁপে ওঠে সীতা। তারপর কাঠ হয়ে যায়। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা মনে হয় তার দাপাদাপি শুরু করেছে। বাঁ হাতে সেটা চেপে ধরে। স্পর্শ-বিদ্যুতের সংকেতে সে যে রঞ্জিতের একান্ত কথা পড়তে পারছে পূর্বাহ্নেই।

একটা সুর গুনগুনিয়ে ওঠে রঞ্জিতের মনের মধ্যে। মনে হয় তেমনি করে সম্বোধন করে সীতাকে—যেমন করে সম্বোধন করে আসছে সর্বকালের প্রেমিক প্রবরেরা তাদের প্রিয়াদের—সেই কালিদাসের কাল থেকে। প্রথম আত্ম নিবেদনের চিরন্তন সেই সব অন্তরতম ভাষায়—

—হে কুচবরণ কন্যে, তোমার কাজল কালো চোখের স্বপ্নে আমাকে উধাও কর, তোমার বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গিমায় বাণাহত হরিণের মত আমাকে বিদ্ধ কর, মেঘবরণ তোমার এলোচুলের অরণ্যে আমায় হারিয়ে দাও, আকাশের মত অসামান্য আমার প্রেমকে তোমার পেলব কোমল বাহু বন্ধনের সামান্য গণ্ডিতে বন্দী কর ইত্যাদি।

কিন্তু প্রেমে পড়া তত্ত্ব সম্বন্ধে সে অত্যন্ত হুঁশিয়ার। হিসেব কষা ও তার মতে বৈজ্ঞানিক প্রেম করা তত্ত্বের প্রতি সচেতন আনুগত্য তার সর্বক্ষণের পাহারা।

অতএব বক্তব্য পাল্টে যায়। কণ্ঠ হতে ভাবাবিষ্টতার জড়িমা দূর করে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবে বলার চেষ্টা করে—আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি কেমন হয় বল ত সীতা।

আয়ত দৃষ্টি তুলে ধরে সীতা রঞ্জিতের চোখের তারায়। আর যাকেই হোক—রঞ্জিতদাকে এর উত্তরে সে কি বলতে পারে। হাতের মধ্যে হাত সেই যে আটকে আছে—খোলবার কিছুমাত্র চেষ্টা করার শক্তিও সে সংগ্রহ করতে পারে না!

রঞ্জিতদা তার শ্রদ্ধার পাত্র তার কৃতজ্ঞতার পাত্র, এবং ভালবাসার পাত্র নয় এমন কথাও সে জোর করে বলতে পারে না এই মুহূর্তে। কিন্তু সরাসরি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত এ কথার জবাবে কী সে জানাবে তাকে। ধরা গলায় বলে ধীরে ধীরে—সব ছেলেরাই কী এক রঞ্জিতদা?—গলা বুজে ওঠে, চোখও যেন ঝাপসা হয়ে আসে তার।

আস্তে আস্তে কাছে আকর্ষণ করে রঞ্জিত আর বলে—সবার কথা জানি না, শুধু আমার কথাটাই বলতে পারি।

হোক রঞ্জিতদা। তবু একজন পুরুষের দেহভার ক্রমশঃ তার অক্ষত কৌমার্যের সীমা লঙ্ঘনে উদ্যত। পৃথিবী দুলচে সীতার চোখে। চেতনা কী তার লোপ পাবে! তীর যেমন অসহায় বোধ করে—তার বক্ষোদেশে উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গের ভেঙ্গে পড়ার লগ্নে, সীতারও তেমনি নিরস্ত করার ক্ষমতা যেন খোয়া যেতে বসেছে এ মুহূর্তে। অথচ এ তো সে চায়নি।

দুবার ঢোক গিলে তিনবার চেষ্টা করে শুকনো জিভ আর তালু কোনরকমে একত্র করে আর্তনাদের সুরে কথা বলে সীতা—আরও একটুখানি বুদ্ধি গুছিয়ে কী কিছুতেই চলা যায় না রঞ্জিতদা।

ঢেউ আছড়ে পড়ে। অনেক কথা উঠতে উঠতে খান খান হয়ে মিলিয়ে যায় বুদ্‌বুদের মত। অত্যন্ত আলগোছে সীতাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয় রঞ্জিত। সমস্ত আবেগ একত্রিত করে আবৃত্তির মত করে বলে ধীরে ধীরে—

দোহাই তোঁহার, একটুকু চুপ কর
ভালবাসিবার দেরে অবসর।

প্রেম করা তত্ত্বের পাহারা হঠাৎ শিথিল হয়ে পড়ে। প্রেমে পড়া তত্ত্বের পায়ে আত্মসমর্পণ হলো কিনা চিন্তা করার অবকাশ পর্যন্ত লুপ্ত হয়।

সীতা আর ভাবতে পারে না। অবশেষে আত্মসমর্পণের জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে মুক্তি পায়।

তারপর একসময়ে মাথা তুলে বলে—আজ আমার অনেক কথা মনে আসছে।

রঞ্জিতের সম্মতির অপেক্ষায় তার বলার আবেগ থেমে থাকল না।—প্রথমেই মনে আসছে মায়েদের আশঙ্কার কথাগুলো। শেষ পর্যন্ত তাই সত্যি হল রঞ্জিতদা—আর কেঁদে ফেলল শিশুর মত। এবং রঞ্জিত ধীরে ধীরে তার পিঠে চাপড় দিতে লাগলো। যেন প্রবোধ দেবার অবোধ প্রচেষ্টা।

॥ সাত ॥

শনিবারের বদলে রবিবার মণিমার কাছে যাওয়ার যোগাযোগটা ভালই। কারণ ডাঃ লাহিড়ীকে নিয়ে সেদিন অজয় বসাক এলেন। সীতার উপস্থিতিতে রাণীকে তিনি আর এক দফা পরীক্ষা করলেন।

বললেন—চোখ কাটার উপযুক্ত হয়েছে।

এত তাড়াতাড়ি উপযুক্ত হবে এ নাকি তাঁরও আশাতিরিক্ত। সাধারণতঃ এরকম হয় না।

পরে রোগী ও অজয় উভয়কে লক্ষ্য করেই জিজ্ঞাসা করলেন।

—হাসপাতালে যাবার ব্যবস্থা হবে না অজয়ের অন্য কোনরকম ইচ্ছে আছে।

অজয় লজ্জা পেল। বলল—আবার হাসপাতাল কেন, স্যার। বাড়ীতেই হোক না।

তুমি যদি বাড়ীকে হাসপাতাল করে তুলতে চাও একান্ত—I won't oppose। কিন্তু সাধারণ লোকদের পক্ষে হাসপাতালেরই তো সুবিধা বেশী।

—কিছু মনে করবেন না স্যার—টাউন স্কুলের হোল্ লাইফ ইনসিওর করা একজন শিক্ষিকাকে শুধুমাত্র সাধারণের পর্যায়ে ফেলতে সেন্টিমেণ্টে একটু লাগে।

মণিমা শুয়ে শুয়ে কুণ্ঠিত হচ্ছিলেন। এতটা তিনি চান না। তাই অবশেষে জানালেন—হাসপাতালই তাঁর মনঃপূত।

লাহিড়ী কিন্তু সুর পাল্টাটেন—বাড়ীতেও আপনার কিছু অসুবিধা হবে না। আর অজয়ের যখন তাই ইচ্ছা। I agree to honour his sentiment —কি বল অজয়।

বলে খুব হাসলেন একচোট। হাসি শেষ করে রোগীকে প্রবোধবাক্য শোনালেন—আপনি আবার ঘাবড়ে যাবেন না যেন এ সব শুনে। খুব minor operation—একটা পিঁপড়ের কামড়ের চাইতে বেশী লাগবে না।

সন্ত ঝাপ্টা লাগা গাছের মত সীতার মনটা বিস্রস্ত। কোন কিছুতে নিজেকে নিবিষ্ট করতে তাই বেশ অসুবিধা হচ্ছে। কেমন একটা ভারী বোঝা যেন চেপে আছে বুকের উপর।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে ওঁদের কথোপকথন। মণিমাকেও আরও কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করতে চায় অজয়। রঞ্জিতের প্রতি কৃতজ্ঞতার কথাও মনে ওঠে। এ যাবৎ বাধ্য হয়ে যত কিছু কৃতজ্ঞতা অজয় বসাকের নিকট থেকে গ্রহণ করেছে স্মরণ করে—সহসা যেন গা বমি-বমি করে ওঠে।

গতকাল রঞ্জিতের কাছে আটকে পড়ার পর আজ অজয় বসাকের প্রতি সেই পুরানো ভাবটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে যেন।

কিন্তু কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করবে না এমন কথা বলার সাহসও তো তার নেই সরাসরি তবু কিছু না বললে ভাল দেখায় না তাই বলে ডাঃ লাহিড়ীকে—চোখ যদি minor operation, major operation কাকে বলবেন ডাক্তার বাবু! চোখ কী প্রাণের চেয়েও অমূল্য জিনিস নয়?

—হয়ত অমূল্য। কিন্তু ডাক্তারী দূরবীন কষে যদি দেখ—চোখ হচ্ছে সমগ্র শরীরের সামান্য একটা অংশ মাত্র। চোখ ছাড়াও দেহে জীবন থাকা সম্ভব। চোখের প্রাণের চেয়ে দেহের প্রাণ যে অনেক বড়। তুমি তো নার্সিংএর মেয়ে। তোমার পক্ষে কিন্তু এ খুব সঙ্গত প্রশ্ন হল না।

বলে ডাঃ লাহিড়ী খুব মিষ্টি করে হাসলেন সীতাকে লক্ষ্য করে।

সীতা লজ্জা পেয়ে গেল।

ডাঃ লাহিড়ী চলে যাবার আগে সাব্যস্ত হল—এই সপ্তাহেই বাড়ীতে অপারেশন হবে। সীতাই হবে নার্স। অজয় রহস্য করার চেষ্টা করল—Charity begins at home—বাড়ীতেই একটা প্রাকৃটিকাল টেস্ট হবে আপনার।

অন্যদিন হলে পাল্টা রসিকতা করে অজয়ের মনোরঞ্জনের প্রচেষ্টা করত না এমন নয়। আজ কিন্তু নিরুত্তর।

অজয় একথাও সাব্যস্ত করে দিয়ে গেল যে এ সপ্তাহে হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন নেই সীতার। সেজন্য যে ব্যবস্থা করার সে করবে। তাছাড়া আরো কী কী প্রাক্-অপারেশন বিধিব্যবস্থা প্রয়োজন তারও প্রেস্‌ক্রপশান দিয়ে গেলেন ওঁরা। সীতা নিরুত্তর থাকায় মৌনং সম্মতি ধরে নিয়ে সওয়াল অত্যন্ত সহজেই সমাধা হয়ে গেল।

পরদিন সীতা হাসপাতালে গেল না বটে। কিন্তু ডাঃ লাহিড়ীর বাড়ীতে উপস্থিত হল। জানাল রোগীর একান্ত ইচ্ছা হাসপাতালেই অপারেশান হোক। খোলাখুলিই বলল—অজয় বসাকের সামনে আপত্তি জ্ঞাপন তাদের পক্ষে নানা-কারণে সম্ভব নয়।

ডাঃ লাহিড়ী বিচক্ষণ ব্যক্তি। এতেই বিষয় রহস্য বুঝতে কষ্ট হল না তাঁর। তিনি মুচকি হাসলেন। তাঁর বক্তব্যে তা পরিস্ফুট হল।—ডাঃ লাহিড়ীর প্রতি কৃতজ্ঞতাভাজন হতে তাহলে আপত্তি নেই তোমাদের—

সীতা নখ খুঁটল মাটির দিকে তাকিয়ে। আসলে ডাঃ লাহিড়ীর অভিমতও তাই। সেজন্য সহজেই তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

মণিমাকে হাসপাতালে আনবার ব্যবস্থা করতে দুদিন কাটল। তারপর যথাবিহিত তিন নম্বর রুমে ফিরে এল সীতা।

রাত্রে মণিমার বাড়ী পাহারার দায় পড়লো রঞ্জিতের। রাত্রে বাড়ীর বাইরে কাটাবে শুনে রঞ্জিতের মা তাঁর স্বভাবসিদ্ধভাবে আপত্তি উথাপন করলেন। জাকে বললেন—ওমা, সোমত্ত ছেলে বাড়ীর বাইরে রাত্তির কাটাবে এ আমার বয়সে শুনিনি।

ছোট জা বললেন—বিনা শর্তে যে আমাদের কথায় বিশ্বাস রাখে—কথায় কথায় তাকে অবিশ্বাস জানালে ফল তাতে ভাল হয় না দিদি।

এত সহজে মামলা নিষ্পত্তি হবে ছোট জাও ভাবেন নি। রঞ্জিতের মা কি ভেবে

তারপর একদম চুপ করে গেলেন। বাড়ীর বাইরে রাত্তির কাটানোর জন্ত রঞ্জিত অবশ্য অনুমতি প্রার্থনা করেনি। সে বান্দা সে নয়। কাকীমাকে গিয়ে এ অনুরোধও জ্ঞাপন করেনি যে তার হয়ে মায়ের আপত্তি তিনি নিরসন করার দায়িত্ব নিন অথচ তার হয়ে কাকীমা পঞ্চমুখে ওকালতি করেছেন জেনে মনে মনে খুব একচোট হেসে নিল সে।

সে মাত্র ছোট্ট দু'কথায় নোটিস দিয়েছিল—কিছুদিন রাত্তিরে বাড়ী থাকতে পারছে না সে।

সীতাকে বলল রঞ্জিত—মা আজ আবার ক্ষেপেছিলেন—মণিমার বেড থেকে দু'জনে বেরুচ্ছে তখন।

—অপরাধ!

—ছেলেকে যে বাড়ীর বাইরে রাত্তির কাটাতে-হবে।

রঞ্জিত যখন মাস্টারি করত—এই প্রসঙ্গে তখনকার রঞ্জিতের একটা কথা হঠাৎ হুবহু মনে পড়ে গেল সীতার। সেটারই পুনরাবৃত্তি করল সে।

—এসব বিষয়ের অবতারণা করে জল ঘোলা করার রুচি—সে আমার নয় রঞ্জিতদা। মেয়েদের ব্যাপার মেয়েদের হাতেই ছেড়ে দাও।

রঞ্জিত তো অবাক।—তার মানে—

—আপ্ত বাক্য। আপনারই উপদেশামৃত। যখন আমি ছাত্রী ছিলাম।

কোন্ কথাটা যে কখন কি রকম দাগ কাটে, তখন তা বোঝা যায় না। সীতাই কি বুঝেছিল? সে কি জানতো কবেকার একটা সামান্ত কথা মনের মধ্যে আটকে বসেছিল—আজকার এই বিশেস মুহূর্ত না এলে।

ইতিমধ্যে হোস্টেল এসে গেল। সীতা ঢুকে পড়ল বিদায় নিয়ে। এদিকে হাসপাতালের শয্যায় মণিমাকে দেখে অজয় খুব বিস্মিত হল। তাকে কেউ খবর দেয়নি ব্যাপারটা। কিন্তু মুখে প্রকাশ করল না কিছুই। সীতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করল না সে। সীতাও সরাসরি ওকথা তুলতে চাইল না। অজয় অপমানিত বোধ করল কি না বোঝা কঠিন—কিন্তু এই প্রথম মনে মনে সীতাকে বুঝবার চেষ্টা করল। এই প্রথম চিন্তা করতে শুরু করল—নিছক উপকারের দ্বারা কৃতজ্ঞতাজালে জড়ানো যায় যে সব মেয়েদের—সীতা তাদের ব্যতিক্রম কি না। আর যদি তাই হয়, তবে সে ব্যতিক্রমের প্রকাশ এত বিলম্বিত হবার সঙ্গত কারণই বা কী হতে পারে!

সীতার এক ধরনের চেহারা সম্পর্কে এতদিন বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল

সে। অভ্যস্ততা প্রায় নিশ্চিন্ততার পর্যায়ে যখন উন্নীতপ্রায় তখন এ একটা ধাক্কাই বলতে হবে।

মুখ পাংশু হল। কারণ বিলম্বিত ও অপ্রত্যাশিত হলেও সীতার মনের এ এক নতুন দিকের ঠিকানা।

তবে ভরসা, সত্যিকারের ধাক্কা কি না শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহ হতে পারছে না সে।

প্রকারান্তরে একটু পরখ করতে চাইল। ডাক্তারী শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করার যোগ্য পাত্র বলে কস্মিনকালে সীতাকে বিবেচনা করে না সে। আজ সেই আলোচনাই উত্থাপন করল দেখে সীতাও অবাক হলো কম নয়। বলল—ডাক্তারী শাস্ত্রে দুটো অভিমত আছে। একটিতে রোগীর সাইকোলজির উপর জোর দেয়। অন্যটি দেয় চিকিৎসার উপর। বাড়ীতে সাইকোলজির উপর জোর দেবার অবস্থা অনুকূল। আর চিকিৎসার উপর জোর দেবার অবস্থা অনুকূল হলো হাসপাতালে। আমি কিন্তু ভাবিনি এ ছাড়া আরও একটা তৃতীয় পন্থা থাকতে পারে এবং সেটা অরিজিন্যাল।

—কী রকম—

—চিকিৎসার উপর জোর দেবার জন্য হাসপাতাল এবং সাইকোলজির উপর জোর দেবার জন্য প্রিয়জনের সর্বক্ষণের উপস্থিতি। অর্থাৎ দুটো অভিমতকেই কম্বাইণ্ড করবার এই যে পন্থা—এর জন্য You deserve congratulation মিস সান্যাল।

মণিমাকে হাসপাতালে আনবার বিষয়টিকে একটি বিশিষ্ট ডাক্তারী অভিমত-যোগ্য হিসাবে হাজির করা—অভিনব লাগল সীতার। আর খারাপও লাগল।

তার পক্ষে অজয়কে তুষ্ট করে চলবার এখনও যথেষ্ট ও সঙ্গত কারণ বর্তমান। কাজেই প্রত্যক্ষভাবে এই আলোচনার মধ্যে গেলে অপ্রীতিকর সম্পর্কের সৃষ্টি হয়—এই ভাবনায় ভীত ছিল সে। কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত সুকৌশলে উত্থাপিত হওয়ায় খানিক হালকা বোধ হোল বটে কিন্তু জবাব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়ালো। কারণ ডাক্তারী শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করবে এমন পুঁজি তার কি আছে?

অজয় বলল—তবে ছুটিটা বাতিল করিয়ে কিন্তু ঠিক করেন নি। সাইকোলজির দিক যদি চিকিৎসার দিকের সঙ্গে কম্বাইণ্ড করতে হয়, রোগীর পাশেই আপনার বেশীর ভাগ সময় দেওয়া প্রয়োজন।

ছোট্ট একটু উত্তর দিয়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ পেল না সীতা—চেষ্টা করব।

পরথ ঠিক ফলপ্রসূ হল না অজয়ের।

চক্ষু বিভাগ সীতার হোস্টেল থেকে কিঞ্চিৎ দূরে। সোজা রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করলে হোস্টেল ডান পাশে রেখে আরও ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু সেখানকার ডিউটির মেয়েরা তাদের সহকর্মীর মণিমায়ের জন্য একটু বিশেষ যত্ন নেবে সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

তাই সীতার দুশ্চিন্তা কিছু ছিল না তেমন। স্বাভাবিক ডিউটি আর ট্রেনিং ক্লাসগুলো অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু নিদেন অপারেশনের দিনটাতেও মণিমার পাশে থাকবে না—সে কি হয়! মনস্থ করল ঐ দিনটি ছুটি নেবে। শুনে মালতীদি প্রচণ্ড আপত্তি তুললেন। বললেন—তুই একটা গরু। মিছিমিছি অ্যাবসেন্ট করে কি সুরাহা হবে বল্। এতদিনে এটা কি শিখিস নি যে—এসব সময়ে প্রিয়জনদের রোগীর কাছে না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

বেশীদূর এগুল না তার বকুনি। কারণ ডিউটিতে বেরিয়ে পড়তে হল তৎক্ষণাৎ।

মালতী বেরিয়ে যেতে একলা ঘরে সীতা একটু গড়াগড়ি করে নেবার চেষ্টা করল অলস খাটের বাজুতে হাত রেখে। হোস্টেলের ঘরের মধ্যে অফ-ডিউটিতে গড়াগড়ি করা ছাড়া কিই বা করার থাকে। বড়জোর নভেল পড়া। বর্তমানে হাতের কাছে তাও নেই।

ময়না কোথায় ছিল অতি সন্তর্পণে পাশে এসে বসল।

টের পেয়ে চোখ বুজে বুজে জিজ্ঞাসা করল সীতা—কি রে তোর ডিউটি নেই বুঝি?

চট করে ময়না সাধারণতঃ কোন কিছুতে উত্তর দেয় না। সীতার স্বভাবের ঠিক বিপরীত। ইতিবাচক উত্তর হলে নিরুত্তর দ্বারাই তা প্রকাশ করে। সীতা বুঝে নিল উত্তর।

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক একটা কথা জিজ্ঞাসা করল ময়নামতী—তোর মণিমার বুঝি কাল অপারেশান? দেখে এলাম। বেশ ভালই আছেন।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। আবার জিজ্ঞাসা—তোর দাদাকে বুঝি আজকাল রোজই আসতে হচ্ছে মণিমাকে দেখতে? আচ্ছা তোর আপনার দাদা ও ভদ্রলোক?

—দাদা!—চমকে উঠার মত বলে উঠল সীতা।—ওঃ রঞ্জিতদার কথা বলছিস তুই?

সীতা একটু সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় কাত করল। ময়নামতীকে হঠাৎ যেন প্রগলভ শোনাচ্ছে। তাকিয়ে দেখে ময়নামতীও তার দিকে চোখ কাত করে তাকাচ্ছে। সীতার কেমন খট্‌কা লাগল।

—কী দেখছিস অমন করে?

—কিছু মনে যদি না করিস একটা কথা বলি।

সীতা উঠে বসলো। চোখ কুঁচকে তাকালো ওর দিকে।

—বল্।

—তোর রঞ্জিতদা ভদ্রলোক—একদম গুছিয়ে চলার ধার ধারেন না বুঝি? একমাথা চুল। দাড়ি কামানো নেই নিয়মমত। তোরা তো বোন। একটু দেখতে পারিস না?

—কী ব্যাপার বল্ তো ময়না?

—কী আবার ব্যাপার?

—উহুঁ। বিনা কারণে তোর মুখে খই ফুটবে এ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না একেবারেই।

—বিশ্বাস কর্, এমনি!

—এমনি। এক চড় মারবো তোকে। কী ব্যাপার বল্ খুলে। আমাকে লুকোতে পারবি এমন সাধ্যি তোর নেই।

ময়নামতী মহা ফাঁপরে পড়ল। এরকম স্নেহের জোরের কাছে ফাঁপরে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে নাকি?

সেদিন ঘটনাটার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেনি সীতা। তাই ভুলে গিয়েছিল। মনে পড়ে গেল চট্ করে। ময়নামতীর বাবার আপিসে রঞ্জিতের চাকরি প্রসঙ্গ। এবং সেই সূত্রে ওদের পরিচয়। রঞ্জিত সেদিন গোপন করতে চেয়েছিল বলে বিক্ষোভ হয়ত খানিকটা ছিল। কিন্তু সেটাকে সন্দেহের দেখবার মন ছিল না। রঞ্জিতকে সেসব প্রকাশ করেনি অবশ্য এ যাবৎ। সহসা সেই সন্দেহের ভাবটা কেমন যেন কিলবিল করে নড়ে উঠতে লাগল মাথার মধ্যে। অথচ—এটাকে সে ঘৃণা করে। একশ বার ঘৃণা করে।

বাড়ীতে ময়নামতীকে ধরে রাখতে পারেন নি জগমোহন। সে যতটা আন্দাজ করেছিল ঘটনা তার চেয়ে অনেক বেশী। তার অমতে ঘটনা এতটা অগ্রসর হবে

সে ভাবে নি। অগ্রীম যৌতুক হিসাবে পাত্রকে চাকরিতে বাহাল করার অর্থ লৌকিক পাকা দেখা সম্প্রদান প্রভৃতির চেয়েও যে পাকা। সত্যিই কি সে বাড়ীর লোকের গলায় এতই কাঁটা হয়ে বিঁধছে যে বাবা তাকে রঞ্জিতের বাগ্‌দত্তা করবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছেন তার সম্মতি অসম্মতিকে অবজ্ঞা করে।

কিন্তু জগমোহন প্রতিশ্রুত হয়েছেন বলেই তাকে সংকল্পচ্যুত হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

তবু জ্ঞাতসারেই হোক অজ্ঞাতসারেই হোক, পরিচিত কোন বিশেষ যুবকের কেউ বাগ্‌দত্তা—একথা জানার পর সাধারণতঃ সব মেয়েরই কিছু কিছু রোমাঞ্চ জাগে।

আর রোমাঞ্চ জাগা মনের মধ্যে যেসব প্রতিক্রিয়া ওঠে, তার ভার লাঘব করার জন্য মন যেন ওত পেতে আছে অনুক্ষণ।

ময়নামতীও কিছু ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু দৃঢ় হস্তে দমন করল নিজেকে। কারণ ততক্ষণে নিজের সম্মতি ও অসম্মতির প্রশ্ন এসে হাজির হয়েছে মনের কাছে।

আসলে মনের ভাব লাঘব করার জন্যই যে শুধু সে সীতার কাছে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিল এমন নয়। একটা যাচাই করার উদ্দেশ্যও তার ছিল। প্রথমেই সরাসরি সীতার কাছে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা তার ছিল না। কিন্তু মালতীদিও ঠিক বলতে পারেন নি। এত ঘনিষ্ঠভাবে বাস করেও কেউ কারও পারিবারিক খবর সঠিকভাবে রাখে নি এতদিন—ভাবতে অবাক লাগে।

সে জানতে চেয়েছিল রঞ্জিতদা সত্যি সত্যিই সীতার দাদা কি না। ঔৎসুক্যটা মেয়ে হয়েও—বড় মেয়েলী লাগছিল নিজের কাছে। প্রকাশটাও তাই সহজ না হয়ে বাঁকিয়ে বোকার মত হয়ে গেছে—বুঝতে পারছে।

সেই সুযোগে সীতা যত চেপে ধরছে ক্রমশঃ তত নিজেকে দুর্বল মনে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সামাল করে রাখতে পারবে না হয়ত নিজেকে। আবেগের বেগ মাঝে মাঝে বানের চেয়েও বেগবান মনে হয়।

উঠে পড়ল। নিজের উপর আর বিশ্বাস নেই। বলল—যেভাবে ভাই কথার মানে করতে শুরু করেছিল, তোর কাছে বসে থাকা আর পোষাল না।

পেছন থেকে চেঁচিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করল সীতা। কিন্তু পারল না।

এবার চাকা উল্টে গেল। সীতার কৌতূহল নিবারণের সমস্যাই হয়ে উঠল প্রবল। সেই থেকে মালতীকে একান্তে পাওয়ার সুযোগ খুঁজতে শুরু করল।

পরদিন সকালে—ময়না তখন ঘরে নেই—পেল সুযোগ। সদ্‌ব্যবহার করল প্রথম কিস্তিতেই।

—রঞ্জিতদা সম্পর্কে ময়না যেন বড্ড কৌতূহল প্রকাশ করছে মালতীদি।

হেসে ফেললেন মালতীদি। —ওঃ তোকে তো বলাই হয় নি। অবশ্য সময় পেলাম কখন? তুইও ব্যস্ত মণিমাকে নিয়ে।

—কী ব্যাপার?

—নতুন ডেভালাপমেন্ট—ময়না এবার বাড়ী থেকে ফেরার পর—

—কী রকম?

—ওমা! তুই কিচ্ছু খোঁজ রাখিস না। তোরই তো বন্ধু বেশী।

—বিশ্বাস কর। কিছু জানি না।

কিন্তু রঞ্জিত বাবু তোর দাদা। সেদিক থেকেও তোর তো জানা উচিত এসব।

সীতা নাচারভাবে শুধু বলল—মাইরি বলছি মালতীদি।

—ময়নার যে বিয়ে ঠিক করে বসে আছেন তার বাবা। তোর রঞ্জিতদার সঙ্গে। জামাইয়ের অগ্রিম যৌতুক পর্যন্ত দিয়ে ফেলেছেন ভদ্রলোক। শ্বশুরের আপিসে চাকরি।

থ হয়ে গেল সীতা। কেমন একটা ঘৃণা ও সন্দেহের আবিলতা কিলবিল করতে করতে তীব্র একটা যন্ত্রণা সৃষ্টি করল মাথার মধ্যে। বোঁ করে ঘুরে উঠলো মাথাটা। সামলে নিল। ঢোক গিলে বলল—আমার তো তাহলে দুপক্ষের পাওনা—তুমি বল মালতীদি।

খুব হাসল ঘটা করে। তারপর হঠাৎ থামিয়ে দিল হাসি মধ্যপথে। কেমন মনে হল বড় বেশী হেসে ফেলছে। মনে হল কেমন করে তাকাচ্ছেন যেন মালতীদি। ভয় হল মালতীদির সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে আত্মগোপন করতে পারবে না। দাঁড়াল না। বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

মালতীদি নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন মেয়েটার আচরণের পানে।

॥ আট ॥

মন্ত্রী মহোদয়ের সফরকে কেন্দ্র করে দরিয়ায় ঢেউ উঠেছে। সে ঢেউ-এর আছাড়ে শিউনারায়ণ মারোয়াড়ী বিচিত্র রকমের নড়বড়ে হয়ে উঠেছেন।

মাথার পাগড়ি টাইট করে প'রে নিয়ে শেয়ার বাজারের শেষ সংবাদের উদগ্র আগ্রহ হজম করেও ড্রাইভারকে বলতে আটকাল না—ড্রাইভার, চালাও গাড়ি।

সংবাদপত্রের সবজান্তা ওয়াকিবহাল মহলের ভবিষ্যদ্‌বাণী: রাজমন্ত্রীর বণিক সভার বার্ষিক ভাষণে সরকারী নীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ঘোষণা অবধারিত। পরিবর্তনের কিছু কিছু ফিরিস্তিও রটেছে। গ্রামীণ কর্মসূচী অব্যাহত রেখেও বড় বড় বাঁধ বেঁধে জলসেচ আর বিদ্যুৎ শক্তি তৈরির প্রতিই নাকি প্রধানতঃ জোর পড়বে।

এ সকল সংবাদ নতুন ও মুখরোচক কম নয়। ফলে সাধারণ খবরের কাগজ পড়ুয়া মহলে রাজনৈতিক আগ্রহও উঠছে অপরিসীম। চা-এর বাটিতে এখানে সেখানে ঝড় উঠছে হামেশা।

শিউনারায়ণের পক্ষে এ সংবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বাসী হয়ে গেছে বহুপূর্বে। বাহুতঃ এই সব সংবাদ এখনও অনহুমোদিত। কিন্তু সে এমন ভাবে ছোটাছুটি শুরু করেছে যে মনে হয়—চন্দ্রসূর্য বরং অননুমোদিত বিবেচিত হতে পারে কিন্তু এই অনমুমোদিত সংবাদ অবিসম্বাদী।

ক্যাপ্টেন বসাকও সুখে নেই। পেছনে হাত আবদ্ধ রেখে পায়চারি করছেন তাঁর বৈঠকখানা ঘরে। তিনি জেনেছেন, নূতন কর্ম পরিকল্পনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান রাজমন্ত্রী পরিদর্শন করবেন। বসাক ল্যাবরেটরিজকেও সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার সমস্যা নিয়ে তিনি তাই অত্যন্ত বিব্রত।

বেবীর স্বামী উচ্চমহলের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন রাজকর্মচারী। আপততঃ দার্জিলিংএর শৈলাবাসে থাকায় মুশ্‌কিল আরও জট পাকিয়েছে। তাঁকে তার করেছেন কলকাতায় আসতে। আজই এসে পড়া উচিত তাঁর।

আর বেবী বটে এক মেয়ে। সব কিছুতেই ছেলেমাহুষি। এসব ব্যাপার বেবী

মারফৎ জিতেনের কাছে প্রস্তাবিত হওয়াই ছিল শোভন। হাজার হোক তিনি শ্বশুর মানুষ।

কি যে ওদের মধ্যে সম্পর্কের গণ্ডগোল তিনি বুঝতে নারাজ। বেবীর মা অবশ্য বলেন—বেবী সন্তানের জননী হলে গণ্ডগোল দুদিনেই হাওয়া হয়ে যাবে হাওয়ার মত।

তিনি ওসব বোঝেন না। তবু কামনা করেন তাই যেন হয়। না হলে তিনি নিজে বারংবার জিতেনের কাছে সহায়তা পাওয়ার প্রস্তাব করবেন—এ অসহ্য।

জিতেনের সঙ্গে বেবীর বিয়ে দেবার এটাও তো ছিল তাঁর একটা অন্যতম লক্ষ্য।

বেবীর অসম্মতির ফলে—জিতেনের সঙ্গে নিজেই আলাপ করবেন সাব্যস্ত করতে হয়েছে। কিন্তু তাতেও শেষ পর্যন্ত বিশেষ কাজ হবে মনে হয় না। কারণ অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এই শেষ সময়ে কর্মসূচী নির্ধারণ কমিটির কাজে জিতেনের মাথা গলানো হয়ত সম্ভবও নয়।

সোজা গাড়ি চালিয়ে এদিকে বসাকের বাড়ীর সামনে গাড়ি থামালেন শিউনারায়ণ। তারপর গাড়িবারান্দার তলায় গাড়ি রেখে—পুরো এক ডজন সিঁড়ি দ্রুত তরতর করে বেয়ে উপরে উঠলেন।

কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে কামরায় ঢুকে পড়লেন দরজা ঠেলে। ক্যাপ্টেন কি করছেন না করছেন বিশেষ খেয়ালই করলেন না। বললেন—বুঝলে ডাগদার, যতদূর খবর পাওয়া যাচ্ছে নো তোপ।

বসাক চমকে উঠলেন—তুমি!—তা কিসের নো তোপ। ফাটকা বাজারের না কাপড়ের?

হাঁপাতে হাঁপাতে শিউনারায়ণ চেয়ারের উপর আসনপিঁড়ি করে বসে নিয়ে তাকালেন। বসাক অবস্থা দেখে দুঃখ প্রকাশ করলেন—পিটি। আহা—আগে একটু বসে জিরিয়ে নাও।

বিরাটকায় টেবিলের একপ্রান্তে পাগড়ি খুলে মাথায় বাতাস প্রবেশের অবকাশ করলেন। তারপর ঝুলে পড়া গোঁফের অগ্রভাগ আঙুল দিয়ে সরালেন। বয়কে ডেকে খুশবাইওয়ালা মিঠা পান আনার হুকুম করলেন।

বসাকও চরুট বার করলেন।

—কোথাকার খবর, কী খবর এবার এসবগুলো বল শুনি।

—খাস রাজধানীর।

চুরুট জ্বালালেন। দাঁতে কামড়ে ধরে মেজাজের সঙ্গে জানালেন—তোমার দোষ কি জান? মেজাজকেও ডিসিপ্লিন জ্ঞান শেখাতে হয়—তা তুমি মানও না—জানও না।

রাখ ডাগ্দার রাখ। তোমার মেজাজের ডিসিপ্লিন তুমি বহুত আচ্ছা সে মৌজ কর। লেকিন আমাকে জ্ঞান দিবে না।

বসাক জ্বলে উঠলেন ভিতরে ভিতরে। বাইরে সংযত স্বরে বললেন মুচকি হেসে—তাই নাকি! কিন্তু তুমিই ছুটে এসেছ আমার কাছে—যতদূর মনে হচ্ছে কিন্তু জ্ঞান নেবার জন্যই। আমি নই।

এসব কায়দার কথাকে গ্রাহ্য করা কিম্বা গায়ে মাখা শিউনারায়ণের ধাতে নেই। যে-কোন পরিস্থিতিতে তাঁর কাজের কথা বাজে কথার জঙ্গলে হাবুডুবু খায় না—মেজাজে তাঁর ডিসিপ্লিন আসুক আর না আসুক। নিজের গরজেই নিজে কথা বলেন শিউনারায়ণ।

—খাস দিল্লীর খবর। এতটুকু ভেজাল পাবে না।

বসাক বসে নিলেন।

—বেশ বল। তাহলে শোনাই যাক।

—গভরমেণ্ট তামাম পলিসি বদল করছে। শাসনতন্ত্র মতে সারা হিন্দুস্থান ভর আমচুনাও হবে। চিয়াশি কয়েদীদের পর্যন্ত জেহেল রিহাই হবে। তারপর নয়া হিন্দুস্থান গড়ার জন্য সেভেন ইয়ার প্লান এস্তেমাল করা হবে। আরও বহুত কিছু।

শিউনারায়ণ জানেন, বাঙ্গালীরা একটু রাজনীতিক আলোচনা-ভক্ত। তাই প্রসঙ্গটা এরকম ভাবে উত্থাপন করা।

ঠোঁট ওল্টালেন বসাক।—নেহাৎ পচা খবর। দু'একটা আইটেম অদল-বদল করে—এ সব তো খবরের কাগজেই—বেরিয়ে গেছে।

বসাকও জানেন, শিউনারায়ণ তথা ব্যবসায়ীদের মধ্যমণি মহল এসব সংবাদ—সংবাদপত্রে প্রকাশের অনেক আগের ভাগেই সংগ্রহ করেন। তবুও একটু চটানোর ইচ্ছে হল শিউনারায়ণকে।

—খবরের কাগজ, খবরের কাগজ।—খানিকটা খিচিয়ে ওঠার মত করে বললেন শিউনারায়ণ।—তোমাদের বাঙ্গালীদের ঐ এক মজ্জাগত দোষ। খবরের কাগজের খবর না হলে তোমাদের বিশ্বাসই হয় না। আর খবরের কাগজের খবর যেখানে তৈরী হয়—খাস সেখানকার খবর তোমাদের মনেই ধরে না।

সংবাদ সংগ্রহের উৎস যে বিশ্বাসভাজন তার প্রমাণ আছে?
দিতে পার প্রমাণ?—বসাক মুখ টিপে হাসলেন।

—অরে বাবা। গ্রীনরুমের খবর ছাড়া আমার কাছে পাবে না—বিরক্ত হলেন শিউনারায়ণ?

—ওয়েল—তোমার কথাই যদি সত্যি ধরি—তোমার নো হোপের কী কারণ থাকতে পারে?

—নো হোপের কারণ হোচ্ছে মশাই। বাঁধ বাধা আর বিদ্যুৎ কারখানা, আর খালকাটা, এসব নিয়ে আর যারই হোক ফাটকা আর কাপড়ের কারবারের কোন সুরাহা নেই।—বিলাযাত আর বিগ্ গানদেরই বিগ হান্টিং গ্রাউণ্ড। লোহালক্কড় আর ছোটখাট ইন্‌জিনিয়ারিং-এর লাইনে থাকলে হয়ত একটা ফায়দা ছিল। সোসাইটি প্রোজেক্টের গ্রাম উন্নয়নের কাজে তোমার যেসব ওষুধপত্রের কণ্টাক্ট ছিল—নতুন প্লানে সেগুলোর রিনিউ হবেই যদি ভেবে থাকো—ইউ আর লিভিং ইন ফুল্‌স প্যারাডাইস।—তবে জানবে—হোপ এগেনস্ট হোপ ব্যবসার মূল কথা হচ্ছে।

বসাক শিউনারায়ণের সম্যক প্রতিক্রিয়াটুকুই বুঝতে চান। তাই বলেন সরাসরি—তাহলে তোমার অভিমত কী? গহরমেণ্ট এ ধরনের পলিসি চালালে দেশের ক্ষতি হবে?

—আলবৎ হবে। আমচুনাও হবে—বহুত আচ্ছা। শাসনতন্ত্র মত কাম চালু হবে—বহুত আচ্ছা। কিন্তু ছিযাশি কয়েদীদের বিলকুল রিহাই—খুব ভাল কথা কী? কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে মজুর খেপাবে না তাহলে বলতে চাও? কণ্টাক্টের ব্যাপারে হিন্দুস্থানী কারবারীদের দেখা যাচ্ছে ষোল আনা লোকসান। কারণ রিয়েল ইন্‌জিনিয়ারিং-এর ব্যয়সায়ে তারা সবচাইতে ব্যাকওআর্ড। আর সেভেন ইয়ার প্লানে ঐটাই দরকার।—কি উন্নতিটা হোল দেশের?

—কারবারীদের ক্ষতি করে, গহরমেণ্টের আখেরটা কী তোমার ধারণা?

—সে গহরমেণ্ট জানে।

বসাক কাঁধ দুটো শ্রাগ করলেন।

—ভাল। তা এখন বল—এসব বিরাট ব্যাপারে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির কিছু করার আছে কিনা। বিশেষ তুমি আমার বন্ধুলোক—

দেরি করে হলেও আসল কথায় এসে পড়া গেছে—ভেবে খুশী হলেন শিউনারায়ণ মনে মনে।

বললেন—খুবই সামান্য—

—যথা—

—রাজমন্ত্রী কলকাতায় এলে সবাই এককাট্টা হয়ে একটা চাপ দেব মানে দরবার করব বলে মনে করছি।

—বণিক সভার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও কি এই অভিমত পোষণ করেন?

—সবার কথা বলতে পারি না। তবে এটাই মেজরিটি অপিনিয়ন।

—কাঁরা তাঁরা? মানে এই মেজারিটির দু'একজনের নাম বল—

—তুমি বুদ্ধিমান হচ্ছ। তুমি অত জেরা করবে কেন? এটা তো হক কথা বলে মানবে—গহরমেণ্টের যে প্লানই হোক—তামাম ব্যবসায়ীরই তাতে কিছু না কিছু স্কোপ থাকা উচিত।

—মোস্ট লেজিটিমেট। কিন্তু একসঙ্গে সকলকে তুষ্ট করা কোন গহরমেণ্টের পক্ষেই সম্ভব বলে মনে করি না আমি।

—ব্যস্—হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন শিউনারায়ণ। —ঠিক এইজন্যেই তোমার কাছে আসা। বিকজ ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড থিংস লজিকালি। একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। বাঙ্গালী মার্চেণ্টরা যাতে এই সময় কোন রকম দুসরা অপিনিয়ন পরকাশ না করে ফেলে সেটা দেখতে হবে। যেন বলতে পারি তারাও আমাদের সঙ্গে আছে। তোমার সহায়তা এই কারণেই প্রয়োজন—আপ্টার অল বঙ্গ বণিক সভার তুমি একজন সহ-সভাপতি হচ্ছ।

এ পরিস্থিতিতে বসাক শিউনারায়ণের এ ধরনের প্রস্তাবে সায় দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। অথচ ব্যবসায়গত ব্যাপারে অনেক বিষয়ে নির্ভরশীল বলে সরাসরি অস্বীকার করার বাধা আছে। তাই আরও সুচতুর উপায়ে প্রসঙ্গ এড়ানোর চেষ্টা করলেন অতঃপর।

—অর্থাৎ বাঙ্গালী মার্চেণ্টদের প্রতিভূ হিসাবে—

—ঠিক ধরেছো—কথা শেস হবার আগেই একগাল হেসে বলে উঠলেন শিউনারায়ণ।

ইতিমধ্যে পান এসে গেল। কলাপাতা মোড়া। উপরে চুন। একটা মুখে পুরলেন। একটা—ভুলে বসাকের দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে আবার ঘুরিয়ে নিলেন—ওঃ তোমার তো চলে না এসব।—তারপর সেটাও মুখে পুরলেন। পানের রস মৃদু মৃদু গড়াতে লাগল গালের দুধার বেয়ে।

বসাক খুঁটুন করে সিগার ধরিয়ে নিলেন আবার। বললেন—মার্চেন্টদের আবার বাঙ্গালী অবাঙ্গালী কী। আফ টার অল মার্চেন্টস্ আর মার্চেন্টস্।

শিউনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে—গুড—করে উঠলেন।

সেযাত্রা শিউনারায়ণ হৃষ্ট মনে ফিরে গেলেন। কিন্তু বসাকের উদ্‌বেগ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেল। ভাবলেন তখুনি গাড়ি বার করতে বলবেন। বঙ্গ বণিক সভার সভাপতি সার্ সদাশিব মুখার্জীর বাড়ী একবার যাওয়া প্রয়োজন। একটু বোঝা দরকার শিউনারায়ণ একমাত্র তাঁরই উপর বাঙ্গালী মার্চেন্টদের প্রতিভূ-ত্ব অর্পণ করার বাসনা পোষণ করছে কিনা।

চিন্তার খাত যখন এইসব ব্যবসায়গত ব্যাপারে বিব্রত—তখন হঠাৎ অজয় এসে উপস্থিত।

এসেই কাকার সামনের চেয়ারে বসল। তার উপর যখন উপদেশ দিতে বসল ক্যাপ্টেন সত্যিই বিরক্ত হলেন। উপদেশের মর্মকথা—রাণী দিদিমণিকে তাঁর একবার দেখতে যাওয়া উচিত।

উচিত সে কথা ঠিক। কারণ টাউন স্কুলের সম্পাদক হিসাবে তিনি রাণীর কাছ থেকে যথেষ্ট কাজ পেয়েছেন। বলতে গেলে সম্পাদকের সই ছাড়া আর সবই ভদ্রমহিলার উপর নির্ভর করে। তিনি উঠেন নি। তাঁর নিজের সময়াভাবের দরুন সম্পাদকের রিপোর্ট, অভিভাষণ পর্যন্ত তৈরি করে দিতে কার্পণ্য করেন নি তিনি। অদ্ভুত মমতা স্কুলের উপর।

কিন্তু কোন্‌টা উচিত কোন্‌টা উচিত নয় সে কথা অজয়ের কাছ থেকে শুনতে চান না। তাই বললেন—দেখ, ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠার উপর দাঁড়িয়ে স্কুল। স্কুলের প্রতিষ্ঠার উপর ভিত্তি করে ব্যবসা নয়। কাজেই আগেরটা আগে, পরেরটা পরে।

অজয় এর উপর কিছু বলতে সাহস করে না। ভাবে—কাকার কড়া নিয়মতান্ত্রিকতার অন্তরালে হৃদয়, কর্তব্য এসব কি কোথাও আছে। ক্ষেত্রবিশেষে তার হৃদয় ও কর্তব্য সম্বন্ধে আগ্রহাতিশয্য ভাগ্যিস কাকার দৃষ্টিপাতের মধ্যে নয়।

অজয় পালালো। কিন্তু পেছন থেকে হঠাৎ তালভঙ্গের মত কাকা ফেরালেন তাকে। —তুমিই যখন খোঁজ খবর রাখছ—হাসপাতালে ভর্তি হলে—জানিও একবার আমাকে।

রাণী যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন—এর পর এ সংবাদ জানাতে কেমন যেন আটকালো অজয়ের।

অজয় যেতে না যেতে কামাখ্যা গুপ্তা ঘরে ঢুকলেন। ক্যাপ্টেন হতাশ হয়ে চেয়ারে ঠেস দিলেন। এক দঙ্গল কাগজপত্র তাঁর হাতে। রাণী অসুস্থ। তাই কামাখ্যা গুপ্তা স্কুলের দায়িত্বে আছেন আপাতত। এবং এই সুযোগে তিনি কারণে অকারণে এত ঘন ঘন বসাকের কাছে আসা শুরু করেছেন যে বসাক হাঁপিয়ে উঠেছেন।

বসাককে আর যাই হোক বোকা বলা চলে না। ছোট থেকেই তিনি বড় হয়েছেন। কামাখ্যা গুপ্তার আচরণের অর্থ করতে পারেন না এমন নয়। আসলে রাণীদিদিমণি দীর্ঘদিনে যে স্থান অধিকার করেছেন—তা অতিক্রম করে বসাকের মনে দাগ কাটা কারও পক্ষে সহজ নয়।

এর আগেও কয়েকদিন বসাক চোখকান বুজে বলেছেন—দেখুন ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে আমাকে বিরক্ত করবেন না। স্বাধীন ভাবে যা কোচ্ছেন করুন। আর দেখুন—শুধু আয় ব্যয়ের ব্যাপারে স্বাধীন হবার চেষ্টা ছাড়া সব বিসয়ে আপনাকে কম্‌প্লিট ফ্রিডম দেওয়া গেল।

তা সত্ত্বেও কামাখ্যা গুপ্তার আগমন তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ করে বেড়েছে ছাড়া কমেনি।

কামাখ্যা সামনে আসতেই তিনি জোর করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কোনরকম আবাহন বা জিজ্ঞাসাবাদ না করেই নির্দেশের ভঙ্গীতে বললেন—একমাস পরে আসবেন, এখন কিচ্ছু দেখতে পারব না। তারপর বার হয়ে গেলেন লম্বা লম্বা পা ফেলে।

কামাখ্যা হাঁ হয়ে রইলেন।

।। নয় ।।

রাজমন্ত্রীর কলিকাতা সফরকে কেন্দ্র করে নাড়া লাগল এণ্ডারসনের মজুর মহলে। কলিকাতা সফরের বিস্তারিত কর্মসূচী বার হবার এখনও বাকী। কিন্তু কি করে যেন চালু হয়েছে সারা কারখানার মধ্যে—রাজমন্ত্রী কারখানা পরিদর্শনে আসবেন।

সাহেবরা সব ঘন ঘন আসা-যাওয়া করছেন ওয়ার্কশপে। 'আণ্ডার রিপেয়ার' বোর্ড মারা মেসিনগুলো নাড়াচাড়া শুরু করেছেন ফোরম্যানরা। লোহার ছাঁট ভর্তি কোণগুলি সাফ সাফাইএর কাজও শুরু হয়েছে একটু আধটু।

বিরাট দৈত্যাকার অটোমেটিক কম্বাইণ্ড অপারেশন মেসিনটার দীর্ঘদিন মরচে পড়ছিল। ডেনকিন সাহেব সহজে মেসিন ছোন না। তিনি স্বয়ং যখন মেসিনটার মরচে ঝাড়তে শুরু করলেন—সন্দেহ রইল না গুজবের ভিত্তি যথেষ্ট দৃঢ়।

কারখানার প্রবেশপথের দুধারে বাগানে মালীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করল হঠাৎ। ওয়ার্কশপের দক্ষিণের আকাশ ছোঁয়া ইটের দেওয়ালের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে উঠল অসংখ্য বাঁশের ভারা। কলি ফেরানোর তোড়জোড়।

তারপর দক্ষিণ দেওয়ালের কলি ফেরানোর পালা শেষ হল। এবার উত্তরের দেওয়াল। দক্ষিণ দেওয়ালের বাঁশ এবার উত্তর দেওয়ালে উঠবে।

জগমোহন বাবু একবার গেলেন ডেনকিনকে সঙ্গে করে কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে। তখন বাঁশ খোলার কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। উপর থেকে দুম্‌দাম্‌ বাঁশ মাটিতে ফেলার কাজ চলছে সমানে।

এক অসতর্ক মুহূর্তে একটা বাঁশ কান ঘেঁসে মাটিতে পড়ল। জগমোহন লাফিয়ে উঠে এক পাশে সরে গেলেন। সঙ্গে ডেনকিনও।

উপরের দিকে তাকিয়ে কপালের উপর হাতের আড়াল টেনে জগমোহন চিল্লিয়ে উঠলেন চেরা গলায়—উল্লুক কা বাচ্চা! শিরপর পইড়্যা যব্‌ ঘাড় ভাইঙ্গা যাইত গা—ত-অ-অ-ব!

বিশুদ্ধ রাষ্ট্রভাষায় মনের ঝাল মিটিয়ে মাড়ীতে মাড়ী চেপে গজরাতে লাগলেন।

ডেনকিন হেসে বললেন—উই শুড হ্যাভ বিন মোর অ্যালার্ট মোহন।

মোট কথা জগমোহনেরও কর্মব্যস্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে অপরিসীম। সারা দিনের মধ্যে খুব কম সময় পান চেয়ারে বসতে। পরিশ্রান্ত হন অথচ তৃপ্তিও বোধ করেন কম নয়। কোন বিশেষ কিছু উপলক্ষে—এতবড় কারখানার সর্বময় কর্তৃত্বের দিক থেকে কার্যতঃ তাঁর স্থান ডেনকিনের পরেই—এটা সকলের নাকের ডগার উপর প্রদর্শন করার এই সুযোগে তিনি অতীব পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

ফাঁকে ফাঁকে হাঁফ ছাড়বার জন্য চেয়ারে এসে বসেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের বেয়ারা এসে দাঁড়ায়।

—বড় সাহেব সেলাম দিয়া।

আবার হন্তদন্ত হয়ে ছুট মারেন।

ব্যাপরে দেখে অন্যান্যদের মত দীপেশও যেন আঁচ করতে পারে। তবু বুড়োর মুখের কথাটাই হলো প্রামাণিক।

অতএব এক ফাঁকে চেপে ধরে বলল বুড়োকে—গুজবটা তাহলে সত্যি বলছেন?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নিজ মুখের কথার দাম বাড়ালেন বুড়ো। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন—

সত্য অসত্যের কি আছে। যা ছাখত্যাছ চক্ষু আছে দেইখ্যা যাও, যা শুনত্যাছ কান আছে শুইনা যাও।

গৌরবে ঘুরিয়ে কথা বলা জগমোহনের নতুন নয়। কাজেই যা বুঝবার দীপেশ এইভাবে বুঝে নিতে অভ্যস্ত।

চশমার ভিতর দিয়ে বুড়ো রঞ্জিতকে দূর থেকে ইঙ্গিত করেন কাছে আসতে। নিকটের দীপেশকে অগ্রাহ্য করে। দীপেশের চোখ এড়ালো না।

রঞ্জিত বড়বাবুর সামনে উপস্থিত হয়। সীতার সঙ্গে অনিশ্চিত সম্পর্ক অবসান হওয়ার পর থেকে কারখানার চাকরি কিভাবে করছে তা একমাত্র রঞ্জিতই জানে। যতক্ষণ সম্পর্ক অনির্ধারিত ছিল তবু যেন শ্বাস নেবার অবকাশ ছিল। কিন্তু এখন মনে হয় সর্বক্ষণ—কারখানা নয়, চাকরি নয়—ফাঁসির মঞ্চ যেন।

পাংশুমুখে টেবিল সামনে করে দাঁড়াল। হাসপাতাল-সাক্ষাৎ পর্বের পর থেকে জগমোহনেরও খাতির প্রদর্শনের চেষ্টা অধিকতর প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে। কে জানে এর জন্য অব্যবহিত সহকারী দীপেশের অনুভূতি আহত হয় কি না।

—বস।

বসল রঞ্জিত। ঈষৎ গলা নামিয়ে একান্তে কথা বলার ভঙ্গীতে শুরু করলেন জগমোহন। আর ধীরে ধীরে দুঃসহ গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়ে উঠতে লাগল রঞ্জিতের অন্তর।

—আরও বাড়বো কারখানা—বোঝলা।

রঞ্জিত নিরুত্তর।

—সাতসালার কাম যখন আইব, কাজ কইরা কুলান্ হইব না, আরও বাড়বো কারখানা।

প্রমাদ গণতে হল এবার রঞ্জিতকে। সাতসালার অর্থ চট্ করে হাতড়ে পেল না তৎক্ষণাৎ।

ঠিক ধরলেন জগমোহন।

—সাতসালা ক্যান্ কইলাম—বোঝ নাই—এই তো! আচ্ছা বাবাজী তোমরা হইলা আজকালকার পোলা—ক্যান্ কইলাম সাতসালা—কও তো?

এসব কথার জবাব দেবার মেজাজ এতক্ষণে অন্তর্হিত। কারণ আত্মগ্লানি

কানায় কানায় পূর্ণপ্রায়। মনে হয় বুড়োর হাত থেকে উদ্ধার পেলে বাঁচে। কিন্তু বুড়ো নাছোড়।

—ঐ যে সেভেন ইয়ার প্ল্যানের কি বাংলা করছে ?—একটু থামলেন। দীপেশ ভেবেছিল হয়ত দীপেশ হলে আরও খানিক রগড়ে নিজের জ্ঞানের ওজন বর্ধিত করার আশায় আরও বেশী-থামতেন। কিন্তু বাবাজী বিধায় বিরত হলেন। নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন।

—সাতসালা করছে না। আজই তো দেখলাম খবরের কাগজে।

কিছুক্ষণ আগে রঞ্জিত ঠাণ্ডারাম মারফৎ একটা চিঠি পেয়েছে যতীন মিত্রের। মনে পড়ল সেটা।

আগেকার কথাও মনে পড়ছে। আগে শ্রমিকদের পরিবেশে কেমন যেন একটা ধূপের মত পবিত্র গন্ধ উড়তো মনের মধ্যে। যখনই সামাজিক ক্ষুদ্রতার শ্বাসরোধী পঙ্কিলতা অসহনীয় বোধ হত তখনই এই বৃহত্তর পরিবেশের আকাঙ্ক্ষা উদগ্র হতো।

এখন হয় না। সে কী শুধু দূর, দৈনন্দিন হয়েছে বলে! শ্রমিক-জীবনের দৈনন্দিন সান্নিধ্যের একঘেয়েমি মাত্র ? কিন্তু ও জানে তা নয়। কারণ এ দৈনন্দিন তো অনাকাঙ্ক্ষিত দৈনন্দিন নয়। আবার সে গন্ধ উড়ুক এ এখনও তার কাম্য।

সোজা হয়ে বসে। হাঁ যতীনের চিঠি। জিজ্ঞাসা করে—সাতসালার কাজ সাহেব কোম্পানী পাবে বলে আপনার ধারণা ?

—সাহেব কোম্পানী ছাড়া—আবার ইনজিনিয়ারিং কোম্পানী আছে নি! অবশ্য এক অর্থে আছে, কিন্তু নাই। কারণ সাইন-বোর্ডের তো অভাব নাই। ভিতরে খোঁজ নিয়া দেখ গিয়া—জিনারী, কাটালোহা, এর বেশী তৈরি করণের কারিগুরি কোন ব্যাটার নাই।

—তা হলে সব কিছু সাব্যস্ত হয়ে গেছে ?

—বাকী কি! আরও তো কারখানা আছে। কিন্তু রাজমন্ত্রী আইবেন এই কারখানায়। এর কোন মানে নাই বলতে চাও তুমি!

—রাজমন্ত্রী আসবেন, সেটাও কি সাব্যস্ত হয়ে গেছে ?

উত্তর দিলেন না বুড়ো কোনটারই সরাসরি। অন্যদিকে মুখ ঘোরালেন। তারপর বললেন আবার,—তাই কই। এই যে খ্যাখন্ যায় স্কোপ নাই, কিন্তু আছে। কাজকর্ম একটু মেজাজ লাগাইয়া কর। ইতিমধ্যে গ্রাউণ্ডটা পাকা পোক্ত হইব। তখন কাজকর্ম বাড়নের লগে লগে—একটা ভাল জায়গা কইরা বসাইয়া দেওন্ তো লাগবো বাবাজী!

বাবাজীর ধৈর্য এবার অতিক্রান্ত হবার কথা। অনেকের কাছে বৃদ্ধের এই স্নেহামৃত লোভনীয়। কিন্তু অমৃতে অরুচি হয় এমন মানুষও দুর্লভ নয়।

জগমোহনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে বেশ কসরৎ করতে হল শেষ পর্যন্ত।

যা ভেবেছে তাই। দীপেশ তার চেয়ারে বসে ছিল উদগ্র হয়ে।

—কী ব্যাপার রঞ্জিতবাবু? বেজায় খাতির করছে যে বুড়ো। সত্যি সত্যি জামাই করবে নাকি!

—কী যে বলেন!

—বলেন নয় স্যার। কানা মেয়ে আছে একটা বুড়োর, সে খবর রাখেন?

এড়িয়ে গেল এ প্রশ্ন রঞ্জিত।

বলল—আরে দূর। কথা পেলে যে রক্ষে নেই ওর কাছে। দেখুন না ঘেমে উঠেছি একেবারে।

ঘড়ির দিকে তাকাল। ঘণ্টা কাবার।

—উঃ ঘণ্টা কাবার করে দিয়েছে একেবারে। এখনই লাইনে যেতে হবে। গেল ঘণ্টার ফিগারগুলো টোটালই করতে পারিনি এখনও!

পিছনে পিছনে দীপেশও গেল কিছুদূর। পেছন থেকে বলল—দেখবেন স্যার, মিষ্টান্নমিতরে জনা। আমরা যেন বাদ না যাই।

ডেঁটে উত্তর দেবার পরিবর্তে ম্লান একটু হাসল রঞ্জিত। তারপর মেসিনশপের লোহালক্কড়ের অরণ্যে হারিয়ে গেল।

যতীনের চিঠির প্রথম করণীয় সংবাদ সংগ্রহ সম্পন্ন হলো। দ্বিতীয় করণীয় সন্ধ্যায় ইউনিয়ন অফিসে উপস্থিত হওয়া।

উপস্থিত হলো ইউনিয়ন আফিসে। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্বে। ঘর জম জমাট। একটা মিটিং খতম হয়ে আসছে।

বহুদিনের ব্যবধানে ইউনিয়ন অফিসে ঢুকল রঞ্জিত। ওর উপস্থিতি সম্বর্ধিত হতে যতীনের নজর পড়ল। ও আসন গ্রহণ করল চাটাইয়ে, আরও অনেক কারখানার স্যাঙ্গাতের সঙ্গে একাসনে।

বহুবার এসেছে সে এ দপ্তরে। কিন্তু সভা উপলক্ষে জমজমাট ঘরে এই দ্বিতীয়বার।

সেই ঠাণ্ডারাম, নন্ত, বুদ্ধু, মাথা মাথা সব মিস্ত্রীরা। সেই প্রথমবারের সেই সব তারাই। দু'একজন ইতরবিশেষ ছাড়া। কিন্তু তবু অনেক তফাৎ। সেবার

এসেছিল নতুন আগন্তুক হয়ে। যে ক'জন মানুষ সেই ক'জোড়া অপরিচিত চোখের দৃষ্টি সেবার বিদ্ধ করছিল তাকে।

ইউনিয়নেরও তখন ধর্মঘটমুখো আওয়াজের একটি কর্মসূচী নিয়ে আলোচনার উষ্ণতা ছিল। সব মিলিয়ে একটা অস্বাভাবিক থমথমে আবহাওয়ায় অনধিকার প্রবেশের মত লেগেছিল। যতক্ষণ ছিল একটা শত্রুপরিবেষ্টিত অস্বস্তিকর অবস্থায় কেটেছিল—যতদূর মনে পড়ে।

এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। এবার সে ঘরের লোক। চোখগুলো পরিচিত। দৃষ্টি-তাপে আবাহনের ঈষদুষ্ণতা। ধর্মঘটমুখো আওয়াজ বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় কার্যতঃ থিতিয়ে গেছে। ফলে থমথমে আবহাওয়া ফিকে। বাবু বলে সন্দেহ হয়ত কিঞ্চিৎ পরিমাণ খুঁজলে পাওয়া যাবে অনেকের মনের মধ্যে। কিন্তু অনেক সহজ আর সাবলীল। আগের যাত্রার সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাৎ।

বেশ সন্তুষ্টভাবে চেপে বসল। এ সভার শরীক হবার সম্পূর্ণ অধিকার আজ তার মুঠোর মধ্যে। মিটিং শেষ হয়ে এসেছিল। হরেক ডিপার্টের হরেক নতুন লোকের সমাগমে মিটিং বেশ সরগরম। শুধু সংগ্রাম কমিটির প্রেসিডেন্ট মোহিনী সিং এর অনুপস্থিতি লক্ষণীয়।

নন্দ নতুন সভাপতি। সভার কাজ চালানোয় অনভিজ্ঞ। মিটিং এর সমাপ্তি ঘোষণার ভাষণে তা বোঝা যায়।

মিটিংএর সমাপ্তি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে উঠে পড়ল সঙ্গ সঙ্গ। আবার অনেকের মনে মিটিং করার ছোঁয়াচ লেগেছে যেন। বড় মিটিং শেষ করে ছোট ছোট জটলা করে ছোট মিটিংএর সূচনা করতে লেগে গেল অনেকে।

রঞ্জিতও উঠে পড়েছিল। যতীনের ইশারায় বসে পড়ল আবার। বুদ্ধু কোথায় ছিল পাশ ঘেঁষে এসে আলাপ জুড়ে দিল উচ্চকণ্ঠে।

—সেই এলেই যতি—নেটে এলে কেন বল দিকিন মালবাবু? জরুরী মিটিন লাট বেলাট আসা নিয়ে বাৎচিৎ। কত কি সব কারওয়াই ঠিক হল—আর সেই নেটে এলে।

ঠাণ্ডারাম, নন্দ, যতীন একধারে কি সব কথাবার্তা বলছে ছোট জটলার আকারে।

রঞ্জিতের তেমন কানে ঢুকল না বুদ্ধুর কথা। তবু বলল—তা কি কারওয়াই ঠিক হল জরুরী মিটিং-এ।

বাবা, অনেক কতা। অত সব কতার কাঁড়ি গুছিয়ে সমজে বলবো—

সে আমার ধাতে নেই।—তারপর নন্তু, যতীন, ঠাণ্ডাদের ছোট জটলার পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাল—সে সব উরা বলবে।

—বল কি, তুমি তো কথার তুবড়ি!

—সাচ্। লেকিন তুবড়ির আগুনে ভানুমতীকা খেল দিখাবে, ম্যাজিক দেখাবে। রসুই যারা পাকাবে তার তো বিলকুল বুড়বাক্।

দরজার বার থেকে কে ডাকল। বুদ্ধুর জমিয়ে বসা হল না! যাবার আগে উঠে দাঁড়াল। পূর্ব কথার রেশ টেনে বলল যেতে যেতে বুদ্ধু—জানবে মালবাবু—হঁ—তুমাদের কতার তোয়াক্কা করে না, কামের তোয়াক্কা করে। হঁ-অ-অ। তারপর সেই অকারণ গোঁয়াতুর্মির ভঙ্গীসহকারে নিষ্ক্রান্ত হয়।

তারপর আবার চুপচাপ।

একসময় যতীন উঠে পড়ল। পেছনে নন্তু। ঠাণ্ডারামের পরিচিত হাসি বিনিময় হলো রঞ্জিতের সঙ্গে।

তারপর যতীনের সঙ্গে বাইরের সেই গোলকধাঁধার রাজত্বে পদার্পণ। এক অন্ধকার কোণে দুজনে দাঁড়াল। সামনে খানিক ফাঁকা জায়গা। তারপর বাবু-পুকুরের জল চিক চিক করছে রাতের অন্ধকারের মধ্যে—চার পাশের আলোর প্রতিচ্ছায়ায়।

—অনেকক্ষণ বসে বসে কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছি। একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা যাক, কি বল?—প্রথম যতীন কথা বলল।

—আপত্তি নেই—শর্টকাট উত্তর।

—একটা জরুরী মিটিং-এ এরকম লেট করে এলে চলে কখনও?

—হাঁ, বুদ্ধুও বলছিল সে কথা। সেই এলে যতি নেটে এলে কেন মালবাবু।

যতীন হাসল শুনে বেশ সশব্দে।

—ভুলেই গেছলাম, তুমি আর বাইরের লোক নও। ঘরের লোক—ওদের খোদ্ মালবাবু।

—কী রকম উপাধি জুটেছে বল তো!

—হাঁ, মালের সঙ্গে বাবুর যোগাযোগ বিস্ময়কর যোগাযোগ। তবে কপালে টিকলে হয় শেষ পর্যন্ত।

সিরিয়াস হয়ে গেল নিমেষে রঞ্জিত এ কথায়। কোন বিশেষ কথা বলতে চাইছে কিনা যতীন রূপক করে কে জানে।

—কী, ট্যারা করে চাইছ যে? জানি খবর যোগাড় করতে পারবে না তুমি। বারংবার এ রকম উস্কে কথা বলার ঝোঁক ভাল লাগে না রঞ্জিতের।

—না, খবরের কথা নয়। খবর ঠিকই যোগাড় করেছি। তোমার কথার চোটটা কোন্‌দিকে বুঝবার চেষ্টা করছি।

—তাহলে খবরটা আগে বল। চোটের কথা না হয় পরে আলোচনা করা যাবে।

কিন্তু খবরের কথা ছেড়ে চোটের কথার দিকেই রঞ্জিতের ঝোঁক তখন অবারিত হয়ে উঠেছে।

—আমার এক ঠাকুমা ছিলেন। তিনি বলতেন—তাকাই ঘুঘু মারি প্যাঁচা। ঘুঘুর পানে তাক্ করে প্যাঁচা মারার কেরামতির গন্ধ বড় বেশী উড়ছে তোমার কথায় আজ।

—ফাদার! পরিহাস-বিজল্পিত হালকা সুরে ডাক ছাড়ল যতীন আর উবু হয়ে বসে নিল মাটিতে। তারপর আবার বলল—বস হে বস। যেভাবে তুমি আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে কথার মানে করতে শুরু করেছ রঞ্জিত—তাতে তোমার জমিয়ে কথা বলার ইচ্ছাই প্রকাশ পাচ্ছে। এবং না বসে জমিয়ে কথা বলা যায় না।

রঞ্জিতও উবু হয়ে বসে পড়ল খোঁস ঢালা রাস্তার উপর।

—তার মানে?

—মানে এই যে রথীন রাউতের হাওয়া লেগেছে তোমার। জমিয়ে ছাড়া সে কথা বলতে পারে না। এবং আমারও। এই যে রসিকতা-দোষ, এ নেহাৎই রথীন রাউতের।

সাধারণতঃ এরকম হালকা সুরে যতীন মিস্তির কথা বলে কদাচিৎ। আসলে মিটিংটা ভালই হয়েছে। মেজাজের খুশবাইয়ে তারই প্রকাশ। সে দিক ভেবে দেখল না রঞ্জিত। তাই বোকা বনল অস্বাভাবিকতায়। কিন্তু শ্রমিক সংক্রান্ত কর্তব্যের কথার চাইতে যতীন মিস্তিরের কথার মধ্যে চোট্ আছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে বসার মনোভাবও সে অনুভব করল—নেহাৎই নতুন তার পক্ষে।

তাড়াতাড়ি সপ্রতিভভাবে কথার মোড় ঘোরাতে সচেষ্ট হল। বলল—রাষ্ট্রমন্ত্রী আসছেন যতীনদা। তবে দিনক্ষণ ঠিক জানা যায়নি এখনও।

একথায় যতীনের কণ্ঠের তরলতা আবার গাঢ় হয়ে এলো! বাঁ হাত গোঁফে উঠল। সিরিয়াস হওয়ার সূত্রপাত।

—সেই খবরকে কেন্দ্র করেই তো মিটিং ডাকা আজ—

—খবর তোমরা আগেই পেয়েছ নাকি ?

—তা না পেলে চলে কি করে বল। তোমাকে খবর আনতে বলেছিলাম আমাদের খবরকে কন্‌ফার্ম করার জন্য।

রঞ্জিত শুনে খুব খুশী হয়েছে বোধ হল না। যতীন আবার বলল—আসছেন এ খবরটা যখন কন্‌ফার্মড, তখন আসার তারিখ সম্পর্কে যে খবর পাওয়া গেছে সেটাও সঠিক ধরে নেওয়া যেতে পারে—কি বল।

—আমি আর কি বলব।

—তা নয়, একই সূত্রের খবর তো দুটোই—

এ তো রঞ্জিতের সঙ্গে আলাপ নয়। এ যেন আত্মস্থ হয়ে নিজের সঙ্গে নিজের আলাপ যতীনের।

রঞ্জিত মুচকি হাসল। বলল—দুদিন বাদে তো, খবরের কাগজেই বেরুত সব। এমন কিছু গোপনীয় ব্যাপার তো নয়। আগেই অত মাথা ঘামিয়ে কি লাভ। মাথা কি অত সস্তা নাকি।

যতীনের গোঁফে মোচড় অব্যাহত।

—লাভ আছে বৈকি। একটু আগাম সংবাদ একটু তোড়জোড়ের অবকাশ দেয়। কাজ তো একজন নিয়ে নয়। দশ মন দশ জন। একত্র করার উপর সব কাজের ফলাফল নির্ভর করে।

একটু খট্‌কা লাগল। লাগবার কথাও। রাষ্ট্রমন্ত্রী কাজে বহুস্থান পরিদর্শন করেন। এ কারখানাও করবেন। কিন্তু তার সঙ্গে শ্রমিক সভা, একত্র, তোড়জোড় এ সবের সম্ভাব্য সূত্র কি থাকতে পারে।

জিজ্ঞাসা করে রঞ্জিত—রাজমন্ত্রীর পরিদর্শনের সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কী ?

—একটু আছে—

একটু আছে কথাটা এক্ষেত্রে একটু উদ্ভট ক্রিয়া করে। রঞ্জিতের ঔৎসুক্যকে ধারালো করে। চেপে বসবার জন্য সে একটা ইট খুঁজে বার করে। বসার সঙ্গে সঙ্গে একটা আরামসূচক শব্দ করে। আঃ।—তাহলে তো ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আর এ ব্যাখ্যা দাবি করার অধিকার আমার আছে।

শুনে ঈষৎ হাসে যতীন।

—নিশ্চয়। কারণ কিছু বে-কানুনী ব্যাপার নয়। ট্রাইবুনালের নিষ্ফলা চৌকাঠে আটক পড়ার পরে শ্রমিক পক্ষ এখন পথ খুঁজছে মাথা খুঁড়ছে। এমন

সময় রাজত্বের খোদ কর্তার অপ্রত্যাশিত দেখা পাওয়া। তাই সামান্য একটা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ স্টেজ করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা! ঐ জন্যই তো বলেছিলাম মিটিংএ এসো।

—বুঝলাম লেট করে আসা অন্যায় হয়েছে।

অদূরে ইউনিয়ন দপ্তরের দরজায় কি একটা হৈ চৈ উঠেছে হঠাৎ। একটা জটলা, কিছু টানা-হেঁচড়া, কিছু বাদানুবাদের কুণ্ডলী।

যতীন অসমাপ্ত আলোচনা থেকে লাফ মেরে উঠে দাঁড়ায়। রঞ্জিতও।
—আবার কি হুজ্জুৎ লাগল?

রঞ্জিত ও যতীনের, যথাক্রমে ঔৎসুক্য ও ব্যাখ্যা উভয়ই আপাততঃ চাপা পড়ল।

উভয়েই ব্যস্তসমস্তভাবে হুজ্জুতে মাথা গলাতে অগ্রসর হল।

সংগ্রাম কমিটির মূল সভাপতির এতক্ষণে দেখা পাওয়া গেল। মোহিনী সিং। কিন্তু যে অবস্থায়—তাতে রঞ্জিতের চক্ষুস্থির।

সভায় যার মধ্যমণি হবার কথা—সভার বাইরে হুজ্জুতের মধ্যমণি হিসাবে তার সাক্ষাৎলাভ একটু অপ্রত্যাশিত এবং বিচিত্রও।

কিন্তু ভঙ্গীতে স্বপ্রকাশ যতীনের পক্ষে নয়। অন্যান্যদেরও নয় মনে হয়। ঠাণ্ডা, বুদ্ধু, নন্ত, আর কিছু পরিচিত অপরিচিত মানুষ তাকে ঘিরে বেষ্টনী সৃষ্টি করেছে। বুদ্ধু আর ঠাণ্ডারামই মাত্র প্রৌঢ়বয়সী মোহিনীর জোয়ান বাহু ধরে টানা-হেঁচড়া শুরু করেছে। অন্যান্যদের শালীনতাবোধ সাদা চোখে শৃঙ্খলাবোধের মত প্রতিভাত হয়। মোহিনীর পা টলছে। কিন্তু হাত টলছে না তত।

—তুকে কেটে ফেলবে হামি। তুকে কেটে ফেলবে হামি। তু কেন বলিস নি হামাকে। কেন বলিস নি আজ মিটিন্ কা রোজ আছে।

বাঁ হাতের সবল মুঠির মধ্যে একটি মধ্যবয়সী মেয়ের একরাশ চুলের গোছা। আকর্ষণ করছে চুল আর ডান হাত উদ্ধতভাবে শূন্যে তুলে দাপাদাপি করছে সমানে।

চুলের গোড়ায় টান পড়ায় বেশ বে-কায়দায় পড়েছে মেয়েটি। টলা হাতের টলায়মান টানের ধমকে মাথার টলায়মান আক্ষেপ আর্ত হয়ে উঠছে মেয়েটির আর মুখ চোখ দাঁত বিকৃত করছে যন্ত্রণায়।

অসহ্য লাগে। বিশেষতঃ অনভ্যস্ত চোখে। রঞ্জিত চোখ ঘোরালো। হঠাৎ চুল ছেড়ে দিল মোহিনী সিং। বাঁচোয়া। সামনে যতীন। শক্ত প্যাঁচানো

কাপড়চোপড় টানা-হেঁচড়ায় যতটুকু শিথিল হয়েছিল ঠিক করে নিল। তারপর চুল ঠিক করল। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে মেয়েটির।

মোহিনী সিং প্রথম কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করতে লাগল দুরে

ঠাণ্ডারামের পেছনে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে দাঁড়াল মেয়েটা।

—ভাইয়া—

—কি বলছ গো ভাবী।

ঠাণ্ডা আর মোহিনীর ঘর কয়েকখানা ঘর তফাৎ। ঠাণ্ডা ঘনিষ্ঠ পড়শী তাই মোহিনীর বিবির কণ্ঠে সেই ঘনিষ্ঠতা আর ঠাণ্ডারামের উপর নির্ভরতা প্রকাশ পেল বক্তব্যে।

বস্তির এ পাড়ায় বাঙ্গালী বসতি প্রধান। ফলে অবাঙ্গালী মহিলামহলে জগাখিচুড়ি বাংলা চালু। বাঙ্গালী অবাঙ্গালীদের মধ্যে ভাব আদানপ্রদানে এ এক নবসৃষ্ট ভাষা।

মোহিনীর বিবির কণ্ঠে সেই ভাষা। —তু আপনার আদমী। তু দেখবি ভাইয়া। উকে সমঝে বুঝিয়ে লিবি, ডর দেখাবি—লেকিন তু দেখবি কোই উঁকে না মারে। বোল্ ভাইয়া—

হাত চেপে ধরে ঠাণ্ডারামের বলতে বলতে। সকলের দৃষ্টিই মোহিনীর দিকে। কিন্তু রঞ্জিতের দৃষ্টি এড়ায় না।

—হামার বহুত শরম লাগছে। দাঁড়াতে বহুত শরম লাগছে। বোল ভাইয়া তু দেখবি উঁকে।

ঠাণ্ডারাম কি যেন বলে বোঝা যায় না।

মার খেয়েও মেয়েটার লোকটার প্রতি সহানুভূতি—অনভ্যস্ত চোখে প্রথম মনে হয় আদিখ্যেতা। চোখ ফেরায় রঞ্জিত।

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে মোহিনী সিং যতীনের হাত ধরে।—উকে মারবো না কাকে মারবো বোলো।

নন্তু এাগয়ে এলো।

—তুমি হলে বাবা যাকে বলে প্রিসিডিং। তুমিই যদি কারবারের দক্ষযজ্ঞ কর, কি ঘটনাটা দাঁড়ায় তাহলে? তুমি যদি বুড়ো বয়স অবধি বে-লাইনে চল, ছেলে-ছোকরারা কি করবে ভেবেছো? ছি ছি ছি—

নন্তুর জ্ঞান দেবার প্রচেষ্টায় মনে হল হিতে বিপরীত ঘটল।

—হামার জরুকে হামি মারবো। জরুর মারবো। একশ টাইম, টাইম মারব। কেটে ফেলব, ব্যাস্।

বুদ্ধ থাকতে পারল না আর।—হঁ। তা না হলে তামাম আদমী সমঝাবে কি করে প্রিসিডিং সাহেবকে মালে ধরে নিয়েছে।

আরও বলত। নন্তু থামালো।

—মাতা নেই, মুণ্ডু নেই। সব টাইমে বে-নাইনের কথাবার্তা বলবি তুই।

—না বলবে না, হঁ।—বুদ্ধু গজ গজ করতে লাগল।

নন্তু এগিয়ে গেলো আবার, আবার বোঝানোর প্রচেষ্টা শুরু হল তার। —মিস্তিরী! কথাটা বোঝ। নিজের বউ। তাকে কেশ আকর্ষণ করে, মেরেও তোমার ঝাল মিটছে না। তা এরপর দুঃশাসন রাজার মতো বস্তর আকর্ষণ করলেই কি ইজ্জৎ বাড়ত।

কে কার কথা শোনে।

—না নিজের বহুকে মারবে না।—বলে খানিক দোল খেতে লাগল বিড় বিড় করে মোহিনী। যতীনের হাত ছেড়ে দিয়েছে। যতীনও ঠিক এ পরিস্থিতির যোগ্য নয়, কিঞ্চিৎ বোঝা যাচ্ছে।

—সাচ্। এক টাইমে হামি খেত মাল। হর রোজ খেত। লেকিন ইউনিয়নে এসেছে তো—মিটিনের টাইমে হামি খায় না। দিমাক খারাব হয়ে যায়। কামকাজ সব গড়বড় হয়ে যায়। তামাম উ জানে। তবু মিটিনের টাইম ও কেন খেয়াল করিযে দিবে না? উ বিবি আছে। নিজের বহু আছে। কেন খেয়াল করিয়ে দিবে না?

এ এক উদ্ভট অভিজ্ঞতা। ইউনিয়নের কাজের টাইমে কাজকাম সব গড়বড় হয়ে যায় বলে নেশা ত্যাগ করে পাঁড় মাতাল—এ তার জানা ছিল না।

এ তো নিছক বউকে পেটা নয়—একদিন মিটিন্ বিস্মৃত হয়েছে বলে আত্ম-দংশনের বিলাপ। শ্রমিক ভালাইএর কাজকে ছোট করেছে নেশার আকর্ষণ —নেশার মধ্যেও সেই সচেতন আত্মদাহ।

হোক আত্মদাহ কিন্তু আঙ্গিকটি যে সর্বনাশা সেকথা স্বীকার করতেই হয়।

যতই হোক এই উন্মাদ আঙ্গিককে রঞ্জিত সমর্থন করবে কি করে। কিন্তু তবু শ্রমিক ভালাইএর আদর্শ যদি ওর মাতাল হবার অভ্যাসকে ত্যাগ করার শক্তি যোগাতে পারে, আত্মদাহের এই উন্মাদ আঙ্গিকের অভ্যাস থেকেও কি ত্রাণ করবে না একদিন?

শ্রমিক ভালাইএর কাজের মধ্যে যে পবিত্র গন্ধ উড়তো আগে হঠাৎ তার আঘ্রাণ পায় রঞ্জিত।

কিছুক্ষণ আগে মোহিনী সিংএর জন্য তার বিবির সহানুভূতিকে অনর্থক আদিখ্যেতা মনে হয়েছিল। এতক্ষণে সেই আদিখ্যেতাই তাকে পেষণ করতে থাকে সেই মোহিনী সিংএর জন্য।

॥ দশ ॥

হাতের কাজে মনোযোগ ও দৃষ্টি অব্যাহত রেখে, ঘাড় বিন্দুমাত্র না তুলে, যে কেউ বলে দিতে পারে—লাইনে কার পায়ের শব্দ। মেইনের পদক্ষেপ এত পরিচিত।

পায়ের শব্দ ঠিক শংকরের পিছনে এসে থামলো। পাশের স্লটিং মেসিনের মনোযোগ টললো না। সঙ্গে সঙ্গে কান দুটো খাড়া হয়ে থাকলো পাঁচুর।

ক'দিন বুদ্ধু ওস্তাদ তিলার্ধ মেসিনের পাশে থাকছে না। এ'তে করে শংকরের সুবিধা। কারণ তার ইপ্সিত মওকা মেলে। নেহাৎ দায়ে না পড়লে বুদ্ধু ওস্তাদ মেসিন ছাড়তে চায় না।

এই ক'দিন স্বাধীন ভাবে মেসিনে কাজ করবার সুযোগ পূর্ণভাবে ব্যবহার করছে শংকর। আর পাকা মেসিনম্যানের মত পোক্ত হয়ে উঠছে তার হাত। সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাসও।

বিড়াল যেমন কামনা করে বাড়ীর সকলের চোখ অন্ধ হোক, সে থালার উপর থেকে মাছের মুড়ো অবলীলা ক্রমে উদরসাৎ করার সুযোগ লাভ করুক শংকরেরও তেমনি কামনা—ওস্তাদের কারখানা-ময় ঘুর ঘুর করে ঘুরপাক খাওয়ার প্রয়োজন বাড়ুক। আর মেসিনের পয়দা অর্থাৎ উৎপাদন অব্যাহত রাখার দায়ে বাড়ুক শংকরের উপর তার নির্ভরতা।

—ওস্তাদ কোথায়—পরিষ্কার বাংলায় মেইনের হেঁড়ে গলা। শংকর মেসিন ধরে ঝুঁকে পড়ে ঘাড় ফেরালো। মেসিনের খোলে হাত ঢুকিয়ে গোটা কয়েক বড় অ্যান্ভিল হাতে করে পরীক্ষা করলেন ম্যাহন। তারপর বললেন আবার—এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।

সপ্রতিভ ভাবে ঘাড় নাড়লো শংকর। আবার জুতার শব্দ উঠলো মেইনের। ঠক্ ঠক্ ঠক্।

শংকর মেসিনের গভীরে ডুবে গেল পুনরায়। একদিন সে ভাবতো—যেদিন সে প্রথম মাল কাটতে পারবে—আর উজ্জ্বল হয়ে উঠতো তার চোখ সফল স্বপ্নের আবেশে। এখন সে কত অবলীলাক্রমে মাল কাটতে পারে। একটা, দুটো, পাঁচটা, রাশি রাশি। জলের মত সহজ এই মাল কাটা। বুদ্ধুর ভাষায় —পানিকা ত'রা।

এখন কয়েক ঘণ্টার জন্য গোটা মাল কাটা যন্ত্রটিই তার কর্তৃত্বাধীন। এর প্রত্যেক অংশের রহস্য তার কাছে দিনের মত না হলেও অন্ততঃ মেঘলা দিনের মত আধো উজ্জ্বল—একথা বলতেই হবে। সে ইচ্ছা করলে যন্ত্রটাকে দশবার বন্ধ করতে পারে, দশবার চালু করতে পারে। ইচ্ছা করলে ঘণ্টায় একশ মাল কাটতে পারে, ইচ্ছা করলে মাল কাটা দশটায় নামিয়ে আনিতে পারে। নিজেকে বেশ বড় মনে হয় নিজের কাছে। খুশির আনন্দ চোখে মুখে উঁকিঝুঁকি মারতে চায়।

মেইন পাঁচুর কাছে একবার এসেছিল। মালের হার সন্তোষজনক নয় বলে মতামত প্রকাশ করে বলে গেছে—কমপক্ষে দশখানা মাল বাড়াতেই হবে ঘণ্টায়। মুখের জবাবের পরিবর্তে পাঁচু চোখ পিট পিট করেই বিদায় করেছে সাহেবকে। সাহেব পাঁচুকে নিষ্কৃতি দিয়ে রিসেসিং মেসিনের পিণ্ডি চটকাতে সুরু করেছেন কিছু দূরে।

তারপর মেইনের পদধ্বনি মাঝে মাঝে ঠেক্ খেয়ে খেয়ে ক্রমশঃ লঘু হতে লঘুতর হতে হতে দূরে চলে যাচ্ছে—চোখ না তুলেও কানের আন্দাজে বুঝতে পারে পাঁচু।

শংকরের মেসিনের আওয়াজ ছেদহীন। সেদিকে চোখে পড়ে পাঁচুর। চোখ আটকে যায়। মেইনের চিন্তা চাপা পড়ে। তারপর থেকে মাঝে মাঝে তাকায় আড়চোখে আর হাসে আপন মনে। মেসিনম্যানদের অসাক্ষাতে হেল্পারদের যখন মেসিন চালাবার মওকা মেলে—তখনকার মনের কথা পাঁচু স্পষ্ট পড়তে পারে শংকরের মুখে। চালাকি তো নয়—মাং খোদ্ অর্থাৎ নিজ অভিজ্ঞতা।

—কি গো ছকরা বাবু। দু ঘণ্টার সুলতান্ হয়ে যে ফুর্তি ধরছেনি। মেসিনটার জান্ যে অর্ধেক করে ফেললে গো এরই মধ্যে।

শংকর এসব কথায় কান দেবে না এখন। এখানে দেখ্ছে তো সে—একটু মন দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করলেই সাঙাৎদের টিট্‌কারির হাত থেকে রক্ষা পাবার আর জো নেই। কিন্তু তা বলে সব ছেড়ে ছুড়ে বসে থাকলে কি জীবনেও সে কাজ শিখতে পারবে নাকি। আর কাজ শিখতে না পারলে আর যারই চলুক—তার তো আর চলবে না।

পরমুহূর্তে মালবাবুর কণ্ঠস্বর তার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে। ওর ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত দিল।

—আজও ওস্তাদের বকলমে বুঝি—

আগেকার দিন হলে এই সামান্য কথাতেই লজ্জার ভাঁজ নামতো তার নাকের দুকোল দিয়ে। আজ কিন্তু শংকর মস্তানের ভঙ্গীতে সে কথার জবাব দিতে গিয়ে—ডান হাতের মুঠি বিন্দুমাত্র শিথিল না করে—স্টিয়ারিং হুইল দাঁড় করিয়ে দিলো মধ্যপথে পাকা কারিগরের মত। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে বলল গম্ভীর হয়ে—ঐ একশই লিখে নিন ঘণ্টায়।

রঞ্জিত ফাইলের কাগজে ফিগার বসাতে বসাতে বলল—তা না হয় লিখলাম। কিন্তু শতকরা দশহারে মাল না বাড়ালে এখন থেকে চলবে না—সেকথা কিছু বলেনি ওস্তাদ।

—না—অত্যন্ত সপ্রতিভ উত্তর এককথায়। তারপর আবার ডানহাতের স্টিয়ারিং হুইলে মোচড়। আর মেসিনের থেমে থাকা ছন্-ন্-ন্-ন্ আওয়াজের পুনঃ নিষ্ক্রমণ। একঘর আওয়াজের আর্কেস্ট্রার ঐকতানে কিছুকালের জন্য তাল-কেটে-যাওয়া এক টুকরো একটা ছোট্ট তান যেন আবার নিজেকে মুক্ত করল।

রঞ্জিত কথা বাড়ানো সঙ্গত মনে করল না। কারণ এর পর পাঁচুর হিসাব। তারপর মন্টিং। তারপর ক্রমে ক্রমে লাইনের শেষ অবধি প্রত্যেক মেসিনের এক-ঘণ্টার পয়দার বেসাতিতে তার খাতা পরিপূর্ণ করে আবার সেই চেয়ার।

অন্য সকলে লাইনের কাজ সংক্ষেপ করে। আর সে চেয়ারের কাজ সংক্ষেপ করতে আজকাল উঠে পড়ে লেগেছে। যত গ্লানি যেন সব চেয়ারেই এসে জড়ো হয়েছে।

মুফৎ কাজ বাড়াও—একথাটাকে কারিগরেরা ভাল চোখে দেখে না। তারা ও কথাটার মধ্যেও যেমন অভিসন্ধি খোঁজ করে, আর যার মুখ দিয়ে ও কথাটা বেরোয়—হাজার আপন হলেও তাকে অভিসন্ধিহীন ভাবতে তাদের আটকায়। অথচ মালবাবুর ডিউটি—মালের রেকর্ড নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির হুকুম-নামা কারিগরদের জানিয়ে দেওয়া।

বাঁচা গেল ওস্তাদ লাইনে না থাকায়। ওর কাছে এই হুকুমনামা জারি করতে যাওয়া যে কতবড় অপ্রিয় ডিউটি তা সে ভাল করেই জানে। আপততঃ নিস্তার পাওয়া গেল সেই অপ্রিয় কাজটার হাত থেকে।

পাঁচুর হিসাব নেওয়ার সময় একবার মনেও হল—নাঃ থাক্ কাজ নেই। ন্তু তবু বললে ডিউটির খাতিরে—

—তেখুনি বুঝে নিয়েছি কপালে দুঃখু ঘনিয়েছে। কারখানা খোলস বদল রে লটবর যেখুনি সাজছেন তেখুনি বুঝে নিয়েছি আমি।

পাঁচুর এই উদ্ভট প্রতিক্রিয়ায় রঞ্জিত হো হো করে হেসে উঠল। বলল— ারখানা খোলস বদল করছেন। বেশ বলেছ কিন্তু!

—কেন বদল করেনি খোলস? পাঠকিলে ছেড়ে ঘোর গেরুয়া বস্ত্র ধারণ রেছেন। বহুত দিনের ফাটাফুটো, হাজামজা সব বুজিয়ে ফেলেছেন। লটবর য তো কী?

ভগবান জানেন পাঁচু মনে মনে কী চোখে দেখছে রঞ্জিতকে। পাঁচুকে সতে গিয়ে নিজের কানেই বিশ্রী জবাবদিহির মত শোনাল—আমার চাকরির উটি—সবাইকে কাজ বাড়ানোর হুকুমনামা শোনানো। তার চেয়ে একবিন্দুও শী গরজ আমার নেই।

পাঁচু বলল শুনে—মোহন সাহেবও এই সবে বলে গেল ঐ কথা। কিছু রা রিনি তাকে। আপনি বলে দুঃখের কথাটা বলে ফেলতে সাহস করলাম। বে কাজের চাপ বাড়লে, কাজ করব না এমন কথা কী বলেছি কখনও!

রিপেয়ার লাইনের কাজ হঠাৎ দুগুণ হয়ে উঠেছে—একথা অজানা নয় কারও। াত্যক্ষভাবে উৎপাদনরত বিভাগগুলিতে কাজের গতি বেড়েছে। ফলে যন্ত্রের পরও চাপ বেড়েছে। মেরামতির প্রয়োজন তাই আগের চাইতে উঠছে বেশী। াছাড়া জং ধরা আধ-ভাঙ্গা যন্ত্রগুলির একটাকেও আর আইড্‌ল্ রাখা হবে না াব্যস্ত হয়েছে—অর্থাৎ পাঁচুর ভাষায় ফাটাফুটো সব বুজিয়ে ফেলছে কোম্পানী। দটাও মেরামতি বিভাগের কাজ বাড়ার অন্যতম কারণ।

তবে ভরসা হঠাৎ এই মেরামতির ধাক্কা বৃদ্ধি নেহাৎ সাময়িক। বুদ্ধুর ভাষায় াজা আসবেন যে। রাজাকে তাক লাগিয়ে দেবে কম্পানী। তারপর আবার যকে সেই।

নন্তু মিস্ত্রীরও ঝকমারির অন্ত নেই। রাজার শুভাগমনের সকল ঝকমারি তারই উপর বর্তেছে যেন ষোল আনা। দিনও বড় বেশী বাকী নেই। যাবতীয় ফাটাফুটো জং ধরা, ঠুটো জগন্নাথ সব যন্ত্রপাতি চক্‌চকে করার কাজ তুলে দবার দায়ে সে বন্দী। তার দায়িত্বের কথাটা বুদ্ধ পাঁচু এরা তেমন করে বোঝে া। নন্তু মিস্ত্রীর একার কথা যেটুকু সেটুকু বলবার মানুষ সারা কারখানায় দু'চার-

জন। অন্য বিভাগের মিস্ত্রী যারা তাদের সঙ্গে হামেশা দেখাসাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ সীমাবদ্ধ। রিপেয়ার লাইনের প্রাথমিক কারিগরের সংখ্যাও বড় কম নয়। কিন্তু নন্দ যেখানটায় মিস্ত্রী, সেখানটায় সে বেজায় একা।

যারা গোটা ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝে. মিস্ত্রীগিরির ঝঞ্ঝাট, আর প্রাথমিক কারিগর হবার পরিশ্রম দুটোই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তেমন মানুষ নেই বললেই চলে।

মিস্ত্রিগিরির ঝঞ্ঝাট যে কী এমনিতে তা বোঝা যায় না; বোঝা যায় তখন. যখন কারিগরদের মেজাজ আর কোম্পানীর জিদ দুটো দুমুখো চলতে শুরু করে। দড়া টানার এই পাল্লার মাঝখানে মিস্ত্রীগিরি জীবনের গ্রন্থন। এমনিতে বেশ আছে। কিন্তু টানাপোড়েন যদি শুরু হল, ব্যস্ আর রক্ষে নেই। দু'দিককার টানাপোড়েনের পরস্পর বিপরীত টানে টানে জীবনান্ত অবস্থা! কে বোঝে সে কথা।

এবং এরকম পরিস্থিতি মাঝে মাঝে আসে ঠিক জোয়ারের জলের মত। এবার যেমন এসেছে রাজার শুভাগমনকে কেন্দ্র করে।

সারা বছর ঘুম মেরে এখন হাতে গোনা ক'টা দিনের মধ্যে ক'টা বছরের কাজ কি করে তোলা যায়—তাই নিয়ে যত সব অনাসৃষ্টি ইনজিনিয়ারিং চলছে সাহেবদের। যেন ইনজিনিয়ারিং-এর অঙ্ক কষলেই—দিন রাত হয়ে যেতে পারে। অমন পঞ্চাশটা পচা মেসিনকে রাতারাতি চক্‌চকে করে চালু করে দেবার কথা উঠতেই নন্দ মোহন সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করেছে দস্তুর মত।

—বছরকে মাসে করা যায় সাহেব, কিন্তু বছরকে দিনে তুমি কি করে করবে বাপু আমি জানি না।

অর্থাৎ যে কাজ করতে বছর লাগে সে কাজ কয়েকদিনে কি করে নিষ্পন্ন করা যেতে পারে।

সাহেব মুচকি মুচকি হাসে।

—কেন করা যাবে না। সবাই মিলে হাত লাগালে হতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। আমরাও হাত লাগাবো! ফোরম্যান, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ফোরম্যান, তামাম সাহেব লোক এ ক'দিনের জন্য সিম্পলি ওয়ার্কম্যান।

—তাইলে বছর ভোর নাকে তেল দিয়ে না ঘুম মেরে সময় থাকতে হাতে কালি মাখলেই পারতে সাহেব। হাঁ বাপু স্পষ্ট কথার কষ্ট নেই।

—শুধু স্পষ্ট কথায় তোমার পেট ভরবে না মিস্ত্রী। পাঁচদিনে পঞ্চাশটা মেসিন

ওয়ার্কেবল্ করে দিতে হবে বড় সাহেবের অর্ডার। কোম্পানী তোমাকে দেখছে, তুমিও কোম্পানীকে দেখবে। বিপদের দোস্তই দোস্ত।

নন্ত বল্ল—ঠিক কথা।—আর ঘাড় নাড়তে লাগল মৃহু মৃহু। ভাবগম্ভীর মুখে কিছু একটা দাওয়াই বাৎলানোর চেষ্টা করছে সে ভিতরে ভিতরে। হঠাৎ যেন মোক্ষম একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে এমনি ভাব করে সাহেবের মুখের দিকে তাকালো; বলল—আচ্ছা সাহেব।—সাহেব হাতে পেন্সিলের অবোল তাবোল আঁক কাটছিলেন অনবরত। চোখ তুলে তাকালেন।

—আমি বলছিলাম একটা অন্য লাইনের কথা।

—বেশ বল—

—ওপোরটাইম কাজ কেনে হোক না। গরীব কারিগরদেরও দু'পয়সা হোক, কাজও উঠে যাক।

স্থির দৃষ্টিতে সাহেব খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন নন্তর পানে। তারপর বললেন, —বিল্লীর গলায় ঘণ্টা লাগানোর চেয়ে ফাঁকিবাজির দিকে একটু কড়া নজর দাও, বেয়াড়াদের কড়া হাতে টাইট দাও—অর্ধেক ভাবনা দূর হবে।

গা জ্বলে যায় নন্তর। কি কথার কী উত্তর। আর উচ্চবাচ্য না করে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। আর একা মনে হয় নিজেকে। কোম্পানীর জিদ টলাতে পারে এমন সাধ্য তার নেই। এবং লাইনের লোকেদের মেজাজের খবর তার চেয়ে সাহেব বেশী জানে না।

এ পরিস্থিতিতে নিজেকে খানিকটা হালকা করার প্রয়োজনীয়তা ওঠে কিনা। অন্ততঃ মেজাজটা বাঁচানোর খাতিরে।

কিন্তু ভরসা করে হালকা করবে কার কাছে? যত সব পাঁড়মাতাল মানুষ নিয়ে তার কারবার।

মালবাবুকে সামনে পেয়ে ডাকলো নন্ত। বললে—বলবো বলবো ভাবি কিন্তু ফুরসৎ পাইনে—এই পর্যন্ত বলে কেমন লজ্জা লজ্জা করতে লাগলো নন্তর। কিছুটা থেমে একটু আমতা আমতা করলো—এই ছুটো দুঃখের কথা আর কি।

পাঁচুর দুঃখ নিবেদনে রঞ্জিত বিচলিত হয় না। কারণ দিনে দু'চারবার সে আপনার লোক হিসাবে দুঃখ নিবেদনে অভ্যস্ত। কিন্তু নন্ত মিস্ত্রীর ব্যাপারটা নেহাৎ নতুন। তাই একটু উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল রঞ্জিত।

নন্ত কাছে এল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুঃখ নিবেদনের পরিবর্তে জিজ্ঞাসা করল—রাজা তাহলে আসছেন মালবাবু?

রঞ্জিত বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকালো। একটু ভেবে বুঝে নিতে কথার মানে। তারপর বলল—তা আসছেন—

—ভূত আর রাজা এক জাতের তা হলে।

রঞ্জিত কি বলব ঠিক ভেবে পেল না। শুধু প্রচণ্ড ঔৎসুক্য সহকারে নন্তু মুখের পানে তাকিয়ে রইলো। নন্তু বোধ হয় তাকানোর অর্থ হৃদয়ঙ্গ করলো। তাই ব্যাখ্যাসূচক ভাষায় জানালো—ভূতও আসে ঘাড় মটকাতে আর রাজাও।

—ও, তাই বুঝি।

—তাই নয়! এই যে আমাদের পিণ্ডি চটকাচ্ছে।

ঠিক কি বলতে চায় নন্তু, বোঝা দুষ্কর হয়ে ওঠে রঞ্জিতের পক্ষে। আবা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো নন্তু—কিন্তু বাধা পড়লো। ওস্তাদের উদয়।

—এই যে বড় মিস্ত্রী, মালবাবু, সব আচো তা'লে। ঠাণ্ডারামকে দেকেচো।

নন্তু মিস্ত্রী পাশ ঘুরে দাঁড়ালো।

—হুঁ আছি।—পাক্কা মারা জবাব।—তা কী করতে হবে বল।

—ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডারামকে দেকেচো—

—না কোন ঠাণ্ডারাম গরমরামকে দেকিনি।—ওস্তাদের উদয় এসময়ে যে অমনঃপূত তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

ওস্তাদ আর দাঁড়ালো না। ঘুরে নিজের মেসিনের পানে পা বাড়াতেই তার পিছনে নন্তু মিস্ত্রী এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল ঠিক ছেলে ছোক্‌রার মত। মুখ বিকৃত করে, শরীর খিচিয়ে, বাঁ হাতের তালুর উপর ডান হাতের কনুই রেখে হাত খাড়া করে বক দেখালো। যেন কোন সার্কাস পার্টির রিংমাস্টার।—ইঃ দিল্লীর চাঁদ আমার। বাতের বেলা লম্বা চওড়া, কাজের বেলা অষ্টরম্ভা, যত সব ইয়ে সময় ইয়ে। গা জ্বলে যায়।

পেছনে বলে ওস্তাদ দেখতে পেল না। কিন্তু অল্পদূরে শংকর মেসিন থেকে বড় মিস্ত্রীর ভঙ্গী দেখে হাসি চাপতে গিয়ে কিক্ কিক্ করে শব্দ করতে লাগলো।

রঞ্জিতের কাছে বড় মিস্ত্রীর মনোভাব পরিষ্কার হল এতক্ষণে।

—হেচকি তুলছ কেনে ছুকরাবাবু।

-- হেচকিতোলা ফলে বেড়ে উঠল। চারপাশের দুচারজন যারা দেখেছিল হাসিতে ফেটে পড়ে বোকা বানিয়ে দিল ওস্তাদকে। ওস্তাদ সমঝে গেল

কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটেছে যা সে ঠিক ধরতে পারেনি বুঝতে পারল। ফলে বুদ্ধিমানের মত চেপে গেল।

শংকরের মন খারাপ হয়ে গেল। কারণ দু'ঘণ্টার সুলতানি খতম এবার। বড় স্ক্রুর কিস্তির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এর পরই নতুন কিস্তির মাল কাটার পালা। মাঝখানের এই সময়টা মেসিন তার হাতে থাকলে সে নতুন মালের টুল লাগানোর সুযোগ নিতে পারতো। তারপর কোন রকমে সেট করে নতুন মালকাটা শুরু করে ফেলতে পারলে গজগজ করলেও ওস্তাদের তো আর কিছু করার ছিল না।

স্বাধীন ভাবে টুল লাগানোর সফলতা—সে যে এক বিরাট জিনিস। তখন সে নিজের মনের কাছে প্রত্যয় করতে পারে—এই যে বিরাটকায় যন্ত্রটা, সত্যিকারের এটা তার হাতের পুতুল। অধীর উত্তেজনায় সে দাঁত কামড়ায়। কবে, কতদিন, আর কতকাল—এই সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হবে তাকে।

কিন্তু যদি না পারে, যদি ইতর বিশেষ হয়ে টুল বেমক্কা ভেঙ্গে যায়, এই সব নানা মনগড়া আশঙ্কায়—আগে আগে যে সব সুযোগ সে গ্রহণ করেনি—সেজন্য এখন হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে।

এখন দু'খানা হাত আর আগেকার সেই দু'খানা হাত নয়। আজকার এই দু'খানা হাতের টেম্পার আর আগেকার সেই দু'খানা হাত অনেক তফাৎ। যন্ত্রপাতি নেড়ে নেড়ে এর আত্মপ্রত্যয়ের শান ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্ছে আর সে বুঝতে পারছে—আগেকার বোকা বোকা আশঙ্কাগুলি কত উদ্ভট।

টুলের ইস্পাত বিশেষভাবে টেম্পার দেওয়া ইস্পাত। ঈষৎ ইতর বিশেষে চিড় খেয়ে যাওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়। স্বাধীন ভাবে অনভ্যস্ত হাতে এধার ওধার হবার সম্ভাবনাও যে একেবারে উড়িয়ে দেবার—তা নয়। কিন্তু সেই চূড়ান্ত খারাপ সম্ভাবনার কথাটাকেই যদি একমাত্র পরিণতি হিসাবে সে হিসাব করে, তবে কী তার কোন মানে হয়। তাছাড়া কারখানার অন্ধিসন্ধি সম্পর্কে তার ধ্যানধারণাও যে একই স্থানে বসে নেই, সেটাও তো হিসাব করতে হবে। কোন একটা কিছু করে, বেকায়দা অবস্থায় যদি পড়েই সে অবস্থাকে সামাল দিতে পারার ক্ষমতা কি এতদিনেও সে অর্জন করে নি মানতে হবে! টেম্পার দেওয়া হাত দু'খানা নিশ্‌পিশ্‌ করে। হঠাৎ মেইন্‌ সাহেবের কথাটা মনে পড়ে যায়।

—ওস্তাদ মোহন সাহেব তলব করেছে তোমাকে।

ওস্তাদ মোহন সাহেবের সঙ্গে ভেট করতে গেলে আবার খানিকটা অবকাশ, মনে মনে সেই চিন্তা শংকরের।

—কেনে? মাল কাটা বাড়াতে হবে, এই তো!—প্ল্যানটা বুঝি ফেঁসে যায় শংকর ভাবলো।

—চা না খেয়ে লড়চিনি, হুঁ-অ-অ।—বসে নিল কেনেস্তারার বাক্সের উপর।

পুরানো কিস্তির কাজ যে বেশী আর বাকী নেই সে কথা যেচে বলল না শংকর।

চা খেয়ে ধীরে সুস্থে মেইন সাহেবের সঙ্গে ভেট করতে গেল বুদ্ধু। কিছুক্ষণ আগে নন্তু মিস্ত্রীর সঙ্গে একটু বাদানুবাদের সূত্র ধরে বেশ খাট্টা হয়ে ছিল সাহেবের মেজাজ। তাই অশোভন এক কিস্তি হয়ে গেল বুদ্ধুর সঙ্গে।

পনেরোদিনে পঞ্চাশখানা মেসিন সারাই বুক দিয়ে পরিশ্রম করলেও সম্ভব কিনা সাহেবের নিজেরই সন্দেহ আছে। কিন্তু প্রাচীন একটা সুপ্ত বিরোধ নিশপিশ করছিল এমন করে যে মেজাজের রাশ ঠিক থাকল না।

যতই চিন্তা করেন, বড়বাবু জগমোহন থাকতে ডেনকিন সাহেবকে কন্‌ট্রাক্ট কাজের প্রভাবমুক্ত করা কত কঠিন—ততই একটা নিষ্ফলা জিদ তাঁকে অন্ধ করে ফেলে। আর মাঝে মাঝে তখন আবোল তাবোল ব্যবহার করে বসেন।

বেশী আয়ের লোভে কারিগরেরা বেশী কাজ করে—উপর থেকে এর চেয়ে ধরুতাই যুক্তি হয় না—একথা ঠিক। বড সাহেব এবং বড সাহেব মারফৎ আরও উচ্চতর কর্তৃপক্ষ ওখানেই তো মাৎ হয়ে আছেন। কিন্তু হাতে কলমে কাজের মধ্যে যারা নামে, তারাই হৃদয়ঙ্গম করে, স্বল্প সময়ের গণ্ডিতে এই নিয়ম কার্যকরী হলেও দীর্ঘ সময়ের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কি নিদারুণ ব্যর্থ। আয় বাড়ানোর ইচ্ছা অসীম হতে পারে, কিন্তু কর্মক্ষমতা তো আর অসীম নয়। তার উপর নড়বড়ে চাকরির ভিত্ সেই সসীম কর্মক্ষমতাকে যে আরও পঙ্গু করে—এ তাঁর অভিজ্ঞতা।

অথচ একথা প্রমাণ করতে যে তিনি বারংবার কী পরিমাণ ব্যর্থ হচ্ছেন তা তিনিই জানেন। সর্বাপেক্ষা অসঙ্গতি ও বিশ্রী ব্যাপার হল—এক কর্তৃপক্ষ কাজ করাবে কারিগরদের, অন্য কর্তৃপক্ষই প্রকৃতপক্ষে তাদের চাকরির মালিক। এ ব্যবস্থা মেইন সাহেবদের পক্ষে কারিগরদের নিয়ন্ত্রণের কাজ অসম্ভব করে তোলে। অথচ সময় মত কাজ তুলে দিতে না পারলে দায়িত্ব তাঁদের।

রাশ টেনে ব্যবহার না করলে কারিগর জাতকে আখেরে বাগ্ মানানো যায়

না—এ তাঁর প্রাচীন অভিজ্ঞতা। তবুও মেজাজ হারিয়ে বসলেন বুদ্ধুর সঙ্গে ব্যবহারে।

বুদ্ধু প্রবেশ করতেই মনে হল যেন শুধুমাত্র বুদ্ধু ওস্তাদই সে নয়। কারখানার প্রচলিত একধরনের অমনঃপূত উৎপাদন পদ্ধতির সে প্রতিভূ। এবং এরই কাছে মেইন পরাজয় স্বীকার করে আসছেন বারংবার। মানুষটা বুদ্ধু কিন্তু ক্ষতটা প্রাচীন।

মিছিমিছি মেজাজ হারিয়ে অবশ্য কোন লাভ হলো না, উল্টে মুশকিলেই পড়তে হলো খানিকটা। বিশেষ বুদ্ধুর সঙ্গে ব্যবহার আর জলে চপেটাঘাত প্রায় সমান কথা। যেমন ওজনের চড় তেমনি ওজনের ব্যথা ফেরৎ।

কিন্তু এরকম আচম্বিত কটু সম্ভাষণে বুদ্ধুর মত মানুষও প্রথম থতমত খেল। পরমুহূর্তেই বন্মের মত দপ্ করে চোখদুটো জ্বলে উঠেই সহসা নিভে গেল। থথর করে কাঁপতে লাগল ঠোঁট চাপা ক্রোধে। এরকম সহসা ঘটে না। অদ্ভুত আত্মসংবরণ বুদ্ধুর পক্ষে। তবে রাগটা অন্য ধরনে প্রকাশ পেল তার কথায়।

—বেশ কতা। হামার সার্টিফিটিকি ছাড ইঁ-অ-অ। হামি চলে যাই। তারপর কিঞ্চিৎ থেমে পুনরায় বলল—কারিগর আদমীকে আঁখ দিখাবে না সা'ব, ইঁ-অ-অ।

সাহেবের চোখমুখ অপমানে লাল হয়ে উঠলো। ফলে সম্বিৎ ফিরে পেলেন তিনি। কিন্তু বুদ্ধু তখন চলে গেছে।

বুদ্ধুর সঙ্গে সাহেবের একহাত হয়ে গেছে শুনে নন্ত মিস্ত্রি এসেমব্লী টেবিল ছেড়ে বুদ্ধুর সামনে এল। খুব বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে নেড়ে বুদ্ধু-মেইন সাক্ষাৎকারের ফিরিস্তি শুনতে শুনতে মনখারাপ ভাবটা যেন বেশ কেটে যেতে লাগল। তারপর একসময় বেশ চাঙ্গা বোধ করে আপনমনে বুদ্ধুর কাছে নন্ত-মেইন উষ্ণ বাদানুবাদের বিবরণ পেশ করতে বসল নিবিষ্টচিত্তে। বিবরণ শেষে মনে হলো, একলা ভাবের ভারটা যেন লাঘব হয়েছে।

—সাহেবের নির্ঘাৎ মাতা খারাপ হয়েছে, জান্‌লি।

—মাতা খারাব না ব্যাঙ্। হারামী আছে। হামি ভি বলে দিয়েছে আচ্ছাসে। ইঁ-অ-অ। কারিগর আদমীর হাত আছে তো, ফিন্ কামের ভাওনা! হামার সার্টিফিটিকি ছাড় সা'ব—হামি চলে যাই।

—তোর ঐ বাপু বাঁধা এক নাইনের কথা। কোন মানে আছে নাকি কতার—হ্যাঁ।

—হামার কতার ফিন্ মানে থাকবে কেনে,—যত মানে কতা সব বড মিস্ত্রীর পাকেটে। ইঁ-অ-অ—

—তুই পয়লা মাতাটা একটু ঠাণ্ডা কর্ তো।

—ফিন্ রাকো তোমার মাতা ঠাণ্ডা। মোহন সাবকে হামি হতি না চিট্ করবে, তো ফিন্ বুদ্ধ ওস্তাদ নই।—বড় সা'বের পাশ চলো, কি কতার কি মানে বলবে সিকেনে।

বাহু ধরে আকর্ষণ করতে লাগল বুদ্ধ, বড় মিস্ত্রীকে।

—উঃ ছাড়্ বাবা ছাড়্। সবেতেই তোর কী যে চড়মাতাল স্বভাব বাপু বুঝি না।

নাছোড় বুদ্ধু অনিচ্ছুক বড় মিস্ত্রীকে প্রায় বগলদাবা করে চলল ঝোঁকের মাথায়। যেতে যেতে হাঁক দিয়ে বলল শংকরকে—ছুকরা বাবু, ফিন্ ঘুরে আসতে টাইম লিবে। ছুটির টাইম ভি হোতে পারে।

শংকরের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। চকিতে মনের মধ্যে খেলে গেল তার করণীয় কার্যক্রমের ছক্। ওরা বড়সাহেবের কামরার পানে অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গেই মেসিন থেমে গেল শংকরের।

চারিদিকে তাকালো। পাঁচু কি লক্ষ্য করছে তাকে? করুক। না না ওসব আর পরোয়া নয়। বড় টাইগার স্ক্রুর বডি কাটার কাজ এখনও কিঞ্চিৎ বাকী। থাক্। টুল খুলে ফেললো শংকর। মেসিন খালি। আবার চারিদিক সন্ধানী দৃষ্টিপাত। হাজার হোক এক্তিয়ারের বাইরের কাজ তো এসব। সাহেব সুবো কেউ আসছে নাকি। বহুদূর পর্যন্ত এক সরলরেখায় প্রসারিত লাইনের শেষ প্রান্ত অবধি দৃষ্টিপাত করল। নাঃ কেউ নেই। নতুন মালের টুলের ডিজাইনখানা টেনে বার করলো গা-বাক্স থেকে। ছোট্ট 'বি ইউ ডি ইউ' সই করা স্লিপ কাগজের একটা বার করে সঙ্গে লট্‌কে দিল।

তারপর চল্‌তি নিয়ম অনুসারে স্টোর থেকে নতুন টুল পৌঁছতে পৌঁছতে আর কয়েক মিনিটের মামলা। নতুন টুল মেসিনে লাগাতে গিয়ে বুকের ওঠানামা মনে হয় দ্রুত লয়ে চলছে। হাতে বাঁধা টাইম। তার মধ্যে সবটা সমাধা করতে পারবে তো! হাত দু'খানা ঈষৎ কাঁপছে। মাথার মধ্যে মনে হচ্ছে ঝিম্ ঝিম্ ভাব।

একটা অতল খাদের সংকীর্ণ কিনার ঘেঁষে ঘেঁষে চল্‌তে চল্‌তে খাদের তলদেশে হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে প্রথমেই বোঁ করে মাথা ঘুরে যাবার পর টাল্ সামলে যেমন ঝিম্ ঝিম্ ভাব পেয়ে বসে তেমনি।

একবার মনে হল সবাই দেখছে তাকে। আবার মনে হল দেখুক। ঠিক্ ঠিক জায়গায় ঠিক ঠিক নাট বল্ট্‌গুলি লাগাতে যেন যুগ কেটে যাচ্ছে। ঘেমে নেয়ে উঠল সে। চোখে দেখে শেখা সুতোর মাপ রপ্ত করতে গিয়ে মাঝে মাঝে মনে হয় কিছুই যেন হচ্ছে না। সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকে বারংবার যেমন নতুন চোরের মনে হয় মাল বার করা শেষ পর্যন্ত বুঝি হয়ে উঠল না গৃহস্থ সজাগ হবার আগে।

নিজেকে জোর করে টেনে নিয়ে পিতলের একটা রড ঢোকালো মেসিনের মধ্যে। তারপর চালু করল মেসিন। ভু-উ-স্ করে গর্জন করে উঠল সেল্‌ফ স্টার্টার। দৃষ্টিগোচর বেল্টের অংশ ঘূর্ণনবেগে স্পষ্টতা থেকে অস্পষ্টতার রাজ্যে উধাও হতে চলল। কালো পাথর বর্ণের চামড়ার বেল্টের দেহ এখন যেন কাঁচের মত স্বচ্ছ। কোন কিছুকে অন্তরাল করে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার অপহরণ করেছে ঘূর্ণনবেগে। স্টিয়ারিং হুইলে হাত উঠলো। নতুন মালের প্রথম বডি নামবে এবার। কিন্তু ডিজাইনের মাপে নামবে তো। যদি নামে। যদি না নামে। একটা ভয়মিশ্রিত আনন্দ, একটা আনন্দমিশ্রিত যন্ত্রণা কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে এই মুহূর্তে। দাঁতে দাঁত চাপলো।

সৃষ্টি আসন্ন। শংকরের সমগ্র সত্তা সংহত কিন্তু অধীর।

প্রথম বডি নামল। উৎকট আত্মতৃপ্তিতে চীৎকার করবে নাকি সে। মেসিনের খোল থেকে তুললো নবজাতককে কম্পিত হস্তে। তাকাতে ভয় করছে। মাপ ঠিক আছে তো। নতুন মালের ডিজাইনটা খুলল আবার। মাপ মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করল। হায় ডায়মেটার কমপক্ষে সিকি সুতোর তফাৎ! বা হাতে বডিটা ছুড়ে ফেলে দিল মেজের উপর। ডান হাতে ঘাম মুছলো কপালের।

কাঁধ দুটো ঝুলে পড়লো। চিবুক ঠেকলো বুকে। বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। সে কি ভেঙ্গে পড়বে! টান হয়ে দাঁড়াল। আগের চেয়ে আখেরের কথা অনেক ভাল বুঝতে পারে সে। সে বোঝে পেছোনোর পথ এ অবস্থায় খাদে পড়বার পথ। চোরের যেমন কাশির দমক বুকের মধ্যে চাপা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না—তারও তেমনি ভেঙ্গে পড়ার পথ বর্তমান পরিস্থিতিতে অবরুদ্ধ।

আবার সেই পুরাতন একঘেয়ে প্রতিক্রিয়া। টুল বেঁধে রাখা বল্ট্‌গুলো অত্যন্ত সাবধানে ঈষৎ আল্‌গা করা একটু একটু করে। তারপর নাটগুলো এক বিন্দুরও ভগ্নাংশ পরিমাণ ঠেলে দেওয়া অত্যন্ত সূক্ষ্মহাতে। সর্বশেষ টুলটার

পুরানো অবস্থানকে এমনভাবে স্থানচ্যুত করা—যাতে বডির ডায়ামেটারের কাটের তফাৎটা ঘুচে যায়।

টুলের এক সূচ্যগ্র অবস্থান পরিবর্তন যেখানে হয়ত এক সুতো ডায়ামেটারের ইতরবিশেষ ঘটায়, সেখানে এই পরিস্থিতিতে পাকা পাকা কারিগরদেরও মাথা খারাপ হয়ে যায়। এক ঘণ্টা কখনও একদিনও কেটে যায় পুনঃ-সংযোজনের কাজে।

এ যেন বলির পাঁঠা। প্রথম কোপে নামল তো নামল। নতুবা একবার যদি আটকে গেল খাঁড়া, তবে খাঁড়াতীর দুর্ভোগ যে কতদূর গড়াবে কে জানে।

পুনঃসংযোজনের কাজ সে দেখেছে। এবং সে হাঙ্গামার ইতিকথাও এখন স্মরণে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ও কাজের সময়সীমার কথাও।

ছুটির ঘণ্টা বেজে যাবার পূর্বে এই পুনঃসংযোজনের কাজ সমাধা না করতে পারলে, বুদ্ধুর হাতে লাঞ্ছনার আশঙ্কা, প্রকৃত লাঞ্ছনা অপেক্ষা তাকে পীড়ন করতে থাকে অধিক। গোদা পায়ের লাথির চেয়ে লাথির ভয়ই প্রবল।

ধৈর্যের পরীক্ষা দেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। কিন্তু কিছুতেই যেন আর এগুতে চায় না পুনঃসংযোজনের কাজ। প্রত্যেকটা স্তর নিজেকে ভেবে ভেবে সৃষ্টি করে নিতে হয়। মালকাটার কাজ তার ভাল লাগে। কিন্তু যা ভাল লাগে তাকে আয়ত্ত করার সহজসাধ্য পথ কি কিছু নেই! এত বাঁকাচুর করা পথ, এত অন্ধগলি, এত অকারণ মূল্য দেওয়া এমন বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে মাঝে মাঝে!

দুনিয়ার কাছে একাজ নেহাৎই পুরানো। অথচ সেই বস্তা পচা পুরানোকেই স্তরে স্তরে নতুন করে আবিষ্কার করে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়—এজন্য ক্রোধ উদ্দীপিত হয় তার। রক্তে সঞ্চারিত হয় বিক্ষোভ।

টুল পুনরায় লাগানোর দ্বিতীয় কিস্তির কাজ সমাধা হল মনে হচ্ছে এতক্ষণে। একটি ছোট্ট জিনিসের প্রতি বহুক্ষণ একভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখতে রাখতে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে চোখে অন্ধকার দেখছে সে। আঃ এতক্ষণে ঘাড় উঁচু হলো। বাঁচলো।

উঠে দাঁড়ালো শংকর। ডান হাতে স্টিয়ারিং হুইল। আবার সেল্‌ফ-স্টার্টারের গর্জন। আবার মেসিন চালু।

সমস্ত মনোযোগ সংহত করে আবার উন্মুখ প্রতীক্ষা। কে ডাকলো শংকরকে। আঁতকে উঠলো শংকর ভূত দেখার মত। সঙ্গে সঙ্গে মেসিনের মুঠি আর

মনোযোগ শিথিল এবং মেসিন থেকে ওঠে তালভঙ্গের আর্তনাদ। ও আর্তনাদ শংকরের চেনা।

ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। টেম্পার দেওয়া ইস্পাত ভাঙ্গার সময়ও টেম্পার দেওয়া ধ্বনি তোলে। ও ধ্বনির জাতই আলাদা। শংকরের মত আধো মেসিনম্যানদেরও আওয়াজ চিনে নিতে ভুল হয় না।

মরার বাড়া গাল নেই। টুলভাঙ্গার চেয়ে চরম বিপদ নেই। ভাঙ্গা টুলে না হবে কাজ, না যাবে রদ্দি বলে ফেরৎ পাঠানো।

যে কারণে তার মনোযোগ উৎক্ষিপ্ত হয়ে এই অবস্থা, মনে হয় এই মুহূর্তে সে একটা চড়, হাঁ। চড় কষিয়ে দিতে পারে—হোক তার যতই স্বল্প সামর্থ্য।

বিদ্যুতের মত ঘুরে দাঁড়ায়। মালবাবু। ঘণ্টা কাবার হয়েছে। মালের হিসাব চাই তার।

রাগ থেমে গেল। চোর সেজে কাজ শেখা ছাড়া আর কি কোন—মানে—পথ নেই কিছু।

রঞ্জিত ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো।

—ভাল কথা নয় শংকর। ওস্তাদের অসাক্ষাতে চুরি করে কাজ শেখা খুব খারাপ কাজ।

চাটু থেকে আগুনে পড়লো নাকি শংকর। কিন্তু তা তো পড়ার কথা নয়।

—মানে—না হয় আর না করবো।

রঞ্জিত হাসলো। কিন্তু মনে হলো শংকরের হাত চেপে ধরে। জড়িয়ে ধরে ওকে।

—অত ভাবনা কিসের। আমি তো আছি।

"ভাবনা কী। আমি তো আছি।" এ ধরণের কথায় বহুদিনের পশ্চাতে ফেলে আসা একটা ঝাপসা স্মৃতিকে যেন নাড়া দিয়ে তোলে।

রঞ্জিত একটা সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে বলে আবার—যাও রদ্দি বলে স্টোরে ফেরৎ দিয়ে এস। আর পুরানো টুল চড়িয়ে পুরানো মালই কাট আপাততঃ। বুদ্ধু ওস্তাদ কিছুতেই হদিস পাবে না। তোমার টুলভাঙ্গার ব্যাপারে তো আমিই দায়ী।

—মানে—কিচ্ছু জানতে পারবে না ওস্তাদ, নয়?

এরকম অযাচিত স্বর্গ হাতে পেয়ে উদ্দীপনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে শংকর। অল্প সময়ের মধ্যে ভাঙ্গা টুল ফেরৎ দিয়ে পুরানো মালের টুল দেয় চড়িয়ে।

রঞ্জিত পাহারার মত দাঁড়িয়ে থাকে একনাগাড়ে। পুরানো মালের টুল সেট হয়ে যেতে বলে—বক্রী বড় টাইগার স্ক্রুগুলো কেটে ফেল এইবার।

শংকর এতদিনে রঞ্জিতের ইচ্ছায় নিজেকে ছড়িয়ে ভাসিয়ে দিতে পারে। একটু ভালবাসার ছোঁয়ায় এখনও কৃতজ্ঞতায় ছল ছল করে ওঠে চোখ।

—অত ভয় পাও কেন ওস্তাদকে। ওস্তাদ তো বাঘ ভালুক নয়।

—নাঃ মানে, ভয় ঠিক নয়, মানে ইয়ে।

॥ এগারো ॥

এরপরও চাকরিস্থল সম্পর্কে মনস্থির করা যে কত মর্মান্তিক তা যাকে করতে হয় সেই জানে। কারখানার সেই পরিবেশে, বুদ্ধু, জগমোহন, দীপেশ সর্বোপরি শংকর এঁদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার চিন্তা করতে গিয়ে বুঝল রঞ্জিত—চাকরি নিছক চাকরিই নয়।

মন মুচড়ে ওঠে। তা ওঠুক। তবু একটা বেদনার্ত মুক্তির আস্বাদে অন্তর তো পরিপূর্ণ হয়।

পাকা পঞ্চাশ লাইনের দীর্ঘ একখানা কবিতা লিখে ফেললো রঞ্জিত রাত দুটো অবধি জেগে। লিখতে লিখতে মনে হল এমন ডুবে গিয়ে কবিতা লেখার তাগিদ যেন কতকাল তার রক্তে সঞ্চালিত হয় না।

পরদিন খুব সকালে উঠে ঠাণ্ডা মেজাজে পড়ল কবিতাখানা বারংবার। নাঃ খুব অসংযত উচ্ছ্বাস বলে তো মনে হচ্ছে না।

রথীন রক্ষিত কবিতা পাঠাতে বলেছিলো 'চাবুকের' জন্য। কি খেয়াল হতে কবিতাসহ নিজেই উপস্থিত হল তার দপ্তরে। রথীন তারিফ করল কবিতার। তারপর স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করে বসলো।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অবলীলাক্রমে পরিক্রমা করে ফিরতে লাগল। কাগজ থেকে কংগ্রেস, কংগ্রেস থেকে দেশ, দেশ থেকে রাজনীতি, রাজনীতি থেকে খেলার ময়দান, সেখান থেকে স্টুডিও, হলিউড, আমেরিকা, আণবিক যুদ্ধ—বিশ্বের কোন সমস্যাই বিশেষ বাদ গেল না। এরই মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের চাটনির পাঞ্চ হাজির করে আলোচনার কাঠ কাঠ ভাবকে সরস করে তুললে।

নিয়মিত কাগজ বার করার পক্ষে যে ছাপাখানার সংকট চলছে ধারের

খরিদ্দারদের পক্ষে সেকথাও একফাঁকে জানিয়ে দিতে বিস্মৃত হলো না। কারণ ছাপাখানাগুলি ইদানীং ভোটার তালিকা ছাপার দাঁও নিয়েই মহাব্যস্ত।

দেশের রাজনীতির হালফিল হালচাল সম্পর্কে 'চাবুক' যে বাজারের আর দশটা সংবাদপত্রের অপেক্ষা কম ওয়াকিবহাল নয়—বরং কোন কোন বিষয়ে অধিক ওয়াকিবহাল—সেকথাও এক সুযোগে তারস্বরে প্রমাণ করতেও প্রবৃত্ত হলো।

বলল—রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বেসরকারীভাবে প্রার্থী মনোনয়নের হিড়িক, কে কোথায় দাঁড়াবে তা নিয়ে দশ রকম জনরব, বামপন্থী দলগুলির মধ্যে বিশেষ করে ডেটিনিউদের পক্ষ থেকে প্রার্থী মনোনয়নের ঝোঁক, এবং সর্বশেষ দ্রুততালে পাইকারী হারে ভোটার তালিকা ছাপার কাজ, এসব একথাই প্রমাণ করে যে চাবুকের ফোরকাস্ট নির্ঘাৎ, সাধারণ নির্বাচন আর কথার কথা নয়।

রঞ্জিত বক্তৃতা শুনতে শুনতে ঘেমে উঠল। বলল—বেশ তো, সাধারণ নির্বাচন তো আর কেউ আটকাতে যাচ্ছে না।

আসলে এ সকল আলোচনা অপেক্ষা কোন্ ফাঁকে তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অর্থাৎ কবিতা ছাপার প্রসঙ্গে ফিরে যেতে পারে—সেটাই ছিল তার মুখ্য চিন্তার বিষয়।

ইজি-চেয়ারে শোয়া অবস্থার থেকে হঠাৎ সোজা হয়ে বসে নিল রথীন। —ভাল কথা, বঙ্কিম সম্পর্কে তোমার ইণ্টারেস্ট কি রকম।

—গভীর—গম্ভীরভাবে জবাব দিল রঞ্জিত।

—তখন একটা গভীর কথা শোনাই। এই প্রার্থী মনোনয়নের সূত্রে তার নামও শোনা যাচ্ছে।

—হতে পারে, তবে তার বাড়ীর চিঠিপত্রে তেমন কোন আভাস নেই।

—দেখ, বঙ্কিম আমার বন্ধুলোক। ব্যক্তিগত ইণ্টারেস্টের দিক থেকে আমিও বিশেষ যত্নসহকারে খোঁজ নিইনি এমন নয়।

—সত্যি হলে পুলকিত বোধ করবো—রঞ্জিতের এই উত্তরে রথীনের সংবাদের প্রতি আস্থা স্থাপনের এত দৃঢ়তা না থাকলেও অন্তরে পুলকিত না হয়ে পারল না। কারণ সংবাদ সত্য হলে—তার কবিতা ছাপার চাইতে রথীনের দপ্তরে এসে এ সংবাদ সংগ্রহ কম লাভের কথা নয়।

রথীন আরও জানাল—আর জানই তো যে সব ডেটিনিউ নমিনেশান পেপার ফাইল করবেন—গভর্ণমেণ্ট তাদের প্যারোলে মুক্তিও দিতে পারেন শেষ পর্যন্ত।

—অতটা কপালে সইলে হয়।

শুনে রঞ্জিত মৃদুমধুর হাসি হাসল। রথীন আবার বলল উদাত্তভাবে —বন্দীমুক্তিতে রাজনীতিকদের পক্ষে—সর্বাপেক্ষা সঙ্গত কাজ হল রাজনৈতিক লাভালাভের খতিয়ান হিসাব করা। কিন্তু মানুষটিকে আমাদের মধ্যে ফিরে পাওয়ায়—আমাদের প্রিয়জনদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সঙ্গত কাজ কি বলতে পার—কবি রঞ্জিত?

—পারি।—ঠিক এতটা বোধ হয় আশা করেনি রক্ষিত। তাই চুপ করে রইল আরও কিছু শোনার আশায়।

—একাসনে তার সঙ্গে বসে পুরো একটা দিন নিরপেক্ষ মানবতাবাদ সম্পর্কে একটা নিরেট আলোচনা চালান এবং শুনে শুনে কমপক্ষে একশ বিড়ি ধ্বংস করা!

রঞ্জিতের বিচিত্র জবাবের লক্ষ্যটা বুঝেও তা এড়িয়ে যাবার জন্য উচ্চস্বরে হেসে উঠল রক্ষিত। রঞ্জিতও হাসল। হাসির বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হতে রথীন বিনীত ভাবে বলল,—একনাগাড়ে বক্তৃতাটা বেশী হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে, এবং সেজন্য তুমি নার্ভাস ফিল কচ্ছ এটাও বোঝা যাচ্ছে।

রঞ্জিতের পক্ষে না হোক বঙ্কিমের পরিবারের পক্ষে সংবাদের গুরুত্ব বিরাট, সন্দেহ নেই। কিন্তু 'চাবুক' কাগজের যে হাবভাব, তাতে তার ফোরকাস্টের নির্ভরযোগ্যতা অনুমান করা তার পক্ষে সত্যই দুঃসাধ্য। তা হোক তবু ভাবতে ভাল লাগে বঙ্কিম তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। আর দেখবে সীতা ও রঞ্জিতকে নতুন দৃষ্টিতে। বঙ্কিম নিশ্চয়ই খুশী হবে। সব চিন্তার মধ্যেই সীতার সঙ্গে নতুন সম্পর্কের একটা সুর গুনগুনিয়ে ফেরে আজকাল ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিকের মত।

রথীন আবার বলল—ছোট কাগজ বলে, বিশ্বাসটা ছোট করলে, নিশ্চিত জেনো, আর দশজনের মত তোমাকেও ঠকতে হতে পারে। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। আগামী একপক্ষকাল পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে যাও রঞ্জিত, প্রমাণ পাবে।

যেটুকু বা বিশ্বাস চাবুকের ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে জন্মাতে শুরু করেছিল, রথীন রক্ষিতের বারংবার আত্মপ্রচারের মহিমায় তাও যেন জ'লো হয়ে যায় এবার।

পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে এসে রঞ্জিত বলল—বেশ তো এইবার আমার কবিতার সম্পর্কে কিছু ভবিষ্যদ্‌বাণী করুন।

—কবিতা ছাপানো সম্পর্কে কবি রঞ্জিতের কি ছিঁচকাঁদুনে স্বভাব আছে নাকি।

—কথঞ্চিৎ।

—হুঁ—বলে কিছুক্ষণ থামলে রথীন। নতুন বিড়িতে অগ্নিসংযোগ করল। গায়ের জামাটা খুলে চেয়ারের হাতলের উপর রাখল।

—অবশ্য কবিতা তোমার তারিফ করার মতই।

বিড়িতে দম নিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে পুনরায় মুরুব্বিয়ানার স্বরে শুরু করল—জানলে, খাঁটী ঘি আর সিরিয়াস কবিতা, এদুটোই ক্রমে বাজারে অচল হয়ে উঠছে। হাসির কিছু কবিতা লেখ ব্রাদার, হাসির কিছু কবিতা লেখ। দেশ থেকে ক্রমে হাসির কবিতা যে উধাও হতে চলেছে লক্ষ্য করছো? কবিতা লেখ। এমন কবিতা, যা দুদণ্ড মানুষকে এই ভ্রূ কোঁচকানোর হাত থেকে রেহাই দিতে পারে।—শেষের লাইন ক'টা যেন মাইকের সামনে দণ্ডায়মান বক্তার উদাত্ত আহ্বান।

ফিক্ করে হেসে ফেলল রঞ্জিত। তারপর মুখে ছদ্মগাম্ভীর্য এনে বলল—তামাশা আর কবিতা আমার মতে দুটো পরস্পর-বিরোধী তত্ত্ব। তেল আর জলের মত একদম মিশ খায় না।

—কিন্তু সৃষ্টির সিদ্ধি যে বিরোধের সমন্বয় সাধনে—এতো ব্রাদার আদ্যিকালের থিসিস্। আচ্ছা—আদ্যিকাল ছেড়ে আধুনিক কালেই এস—এই যে সুকুমার রায়, কবিতা লিখতেন এবং হাসির কবিতা লিখতেন, মান?

—তা না হয় মানা গেল। কিন্তু তবুও এ যাত্রা কবিতা আমার সিরিয়াস। এবং তার ভবিতব্য এত জোরার পারও আপনার মুখ দিয়ে বার করা যাচ্ছে না—এটাও তো মনে রাখবার মত কথা।

হাসলো রথীন রঞ্জিতের কথার ভঙ্গীতে। তারপর বলল—আমার কথায় যদি মনে হয়ে থাকে যে আমার মতামত সিরিয়াস কবিতার বিরুদ্ধে তবে সত্যি দুঃখের কথা। তবে আসল কথা কি জান—কবিতা প্রকাশের ব্যাপারে খানিকটা বিজ্‌নেস সিক্রেটের প্রিন্সিপল্ জড়িত নেই একথা বলা যায় না। কিন্তু তোমাকে, হাঁ তোমাকে বলা যেতে পারে; বলতে গেলে তুমি আমাদেরই সার্কেলের লোক।

এ পর্যন্ত বলে গলার স্বর নামিয়ে এনে পুনরায় বলতে শুরু করল, যেন অত্যন্ত একান্ত ও গোপন কথা।

—কবিতা প্রকাশের ব্যাপারে—কবিতার গুণ হিসাব করার চাইতে স্পেস্ পূরণ করার প্রয়োজনের হিসাবটাই আসে আগে। অর্থাৎ কোন প্রবন্ধের শেষে

কতটা স্পেস্ থেকে যাবে, আর কবিতার আয়তন সেই স্পেসটুকুর সঙ্গে কতট সঙ্গতিপূর্ণ এটাই হোল মাপকাঠি।

এহেন বিজ্নেস্ সিক্রেটের হিস্টরি শুনে হিস্টিরিয়া হবার কথা। কিন্তু তরু কবিতাকার শুধু মাত্র চোখ কপালে তুলেই নিরস্ত হলেন এবারের মত। ক বাড়ানোর উৎসাহ পেলেন না বেশী। ফলে তর্ক জমল না বেশীক্ষণ, তর্কাতর্কি অভাবে।

কবিতার ব্যাপারেই প্রধানতঃ রথীনের দপ্তরে আসা। কিন্তু ফেরার সম কবিতার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বঙ্কিম সংবাদ শীর্ষক চাবুকের ভবিষ্যদ্বাণী তার মাথার মধ্যে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ালো সমানে।

দুর্বলদেহে এ ধরনের অপ্রত্যাশিত সংবাদ শক্ সৃষ্টি করতে পারে সে কথা ন ভেবে চিন্তেই রঞ্জিত প্রথমেই বঙ্কিম সংবাদ জ্ঞাপন করলো মণিমাকে তার রোগ শয্যায়। চোখ অপারেশনের অব্যবহিত পর মণিমার চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সেই অবস্থাতেই তিনি খবর শুনে শয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন। তারপর রঞ্জিতে সর্বাঙ্গে হাত বোলাতে লাগলেন। যেন চোখের আলোর অভাব স্পর্শের আলো দিয়ে পূর্ণ করবার এক করুণ প্রচেষ্টা।

প্রথমে ধীরে ধীরে বললেন মণিমা—ততদিনে আমার এ পোড়া চোখ দুটোর আবার আলো ফিরে আসবে—নয়?

পরমুহূর্তে সংযমের বাঁধ হঠাৎ অবাকভাবে ভেঙ্গে পড়ল তাঁর। শিশুর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন—দুচোখ ভরে তোমাদের সবাইকে দেখতে পাব তো আবার?—কণ্ঠে অবিশ্বাস্য আর্তি।

রঞ্জিত সহসা বিমূঢ় বোধ করল। রোগ মনকে এত অসহায় আর ঠুনকো করে তুলতে পারে—এ তার ধারণাতীত। চোখ মুখের পাণ্ডুর শীর্ণতা অপেক্ষা মণিমার অন্তরের অসহায়তা যে ঢের বেশী নিষ্করুণ একথা তাঁকে এই মুহূর্তে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হত।

বিমূঢ় ভাব সম্বরণ করে রঞ্জিত বলল—আপনি কী ভাবেন, আপনার চোখের আলো কেড়ে নেওয়ার জন্য চারিদিকে ষড়যন্ত্র চলছে।

মণিমা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর আবার শুয়ে পড়ে ধরা গলায় বললেন—আমার ক'দিন ধরে কেবলই মনে হচ্ছে কী জান? আমি বোধহয় বেশীদিন আর বাঁচব না।—এবার গলার স্বরে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সংযমের আভাস।

রঞ্জিত সান্ত্বনা দেবার প্রচেষ্টায় বলল—অসুস্থ শরীর আজগুবী চিন্তার কারখানা—এ'তে ভয় পাবার কি আছে বলুন তো।

—যাই বল, ঠিক এরকম মৃত্যুভয় আগে তো কোনদিন আমি অনুভব করিনি।

এর কী জবাব দেবে রঞ্জিত। সত্যি বলতে কি, এমন করে মণিমাকে ভেঙ্গে পড়তে বাহ্যতঃ কোনদিন সে দেখেনি। পদ্মার সর্বনাশা অন্তঃপ্রবাহ মাটির অন্তরে নিরন্তর যে ক্ষয় ঘটায়, বাহ্যিকভাবে ধ্বসে পড়ার অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তেও তা তো ধরা পড়ে না। মণিমার জীবনকথা তার কাছে বহুলাংশে অজ্ঞাত, খানিকটা রহস্যকরও। কে জানে মণিমার এই নিঃসঙ্গ জীবনের বাহ্যবৈরাগ্যের অতলেও তেমনি অগণ্য অন্তঃপ্রবাহের ইতিবৃত্ত আছে কিনা।

মণিমা খানিকক্ষণ একভাবে ছিলেন। রঞ্জিতের কথা তাঁর কানে প্রবেশ করল কিনা বোঝা গেল না। বুকের মধ্য থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উন্মুক্ত করে বললেন পুনরায়—বাঁচা যদি শেষ পর্যন্ত নাই হয়—তুমি যাই না কেন ভাবো—আজ আর আমার বলতে দ্বিধা করলে চলবে না। সীতার জন্য আমি তোমার উপরই নির্ভর করে যাবো রঞ্জিত।—কণ্ঠ উচ্ছ্বাসহীন, কিন্তু বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে উচ্ছ্বাস হেমন্ত শিশিরের মত টলমল করছে।

—কীসব বলছেন আপনি বলুন তো।—রঞ্জিত নিশ্চল হয়ে উঠলো। মণিমা হাতড়ে হাতের উপর হাত রাখলেন রঞ্জিতের, বললেন—আমার এটুকু বোঝার বুদ্ধি হয়েছে রঞ্জিত যে, তোমার চেয়ে অকৃত্রিম আত্মীয় তার বড় বেশী নেই।—হাত চেপে ধরলেন মণিমা রঞ্জিতের। তার হাতের উপর মণিমার আঙ্গুলগুলির উচ্ছ্বসিত অস্থিরতা যে ক্রন্দনের প্রতিভাস তা শুধু অনুভূতি দিয়েই বোঝা যায়।

মৃত্যুচিন্তার সঙ্গে সীতার দায়িত্বের চিন্তা মণিমার রক্তে যেন অদ্ভুতভাবে জড়িত। অথচ উভয়ের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক কতটুকু! সীতার প্রতি মণিমার এই আত্যন্তিক আবেগপ্রবণতার দরুনই উভয়ের প্রকৃত সম্পর্ক নির্ণয়ের একটা রহস্য জিজ্ঞাসাকে তার মনকে বরাবর তোলপাড় করে এবং সে বরাবর তা চাপা দিয়েও আসে নেহাৎ অশোভন মনে করে।

তবে কি রোগশয্যার মানসিক দুর্বলতাজনিত উচ্ছ্বাসের মুহূর্তে সেই রহস্য ভেদের চূড়ান্ত পর্যায় উপস্থিত? কিন্তু এ তো তার আভীপ্সিত নয়? এ'তে যে মনের তলায় পড়ে থাকে পরস্বাপহরণের গ্লানি। এরপর সুস্থ চিত্তে মণিমা একদিন

তার দুর্বলচিত্ততার কথা স্মরণ করে হয়ত নিজেই সংকুচিত বোধ করবেন। অথচ এই অবস্থা থেকে তাকে নিরস্তই বা সে করবে কী করে?

রঞ্জিত উসখুস করতে থাকে। মণিমা তাঁর হাত রঞ্জিতের হাতের উপর থেকে না সরিয়েই বলেন—আমার সম্বল নিতান্ত সামান্য! ইস্কুলের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড। আমার অবর্তমানে সীতাই সেটা পাবে। একথা সীতাও জানে না। তাছাড়া হিন্দু ফ্যামিলি ফাণ্ডে কিছু রেখেছিলাম এককালে সেটার নমিনিও ওই মেয়েটা। তোমার জানার কথা নয় অবশ্য—সীতা আমার জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছে বাবা। এখন বঙ্কিমদের সংসারের তো ঐ অবস্থা। বঙ্কিম তো কোনদিন সংসারের পানে তেমন করে ফিরে চাইলো না—

রঞ্জিত বুঝতে পারে অথচ পারে না—এ কোন্ ইঙ্গিত করছেন মণিমা। কিন্তু একথা বুঝতে পারে বঙ্কিম প্রসঙ্গ উত্থাপন করা এ অবস্থায় তার পক্ষে ঠিক হয় নি। পরিস্থিতি এখন খানিকটা তার হাতের বাইরে। অথচ দুর্বল মনের প্রলাপ বলেই কি এসব কথা উড়িয়ে দেওয়া যায়। তবুও বলল তাঁকে নিরস্ত করার প্রয়োজনে—মিছিমিছি আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন মণিমা। দুর্বল শরীর এতে আরও দুর্বল হয়—একথা কী আপনাকেও আমায় বোঝাতে হবে শেষ পর্যন্ত।

এবার মণিমার কণ্ঠ দুর্বল কিন্তু আরও সংহত আরও ধীর,—উত্তেজিত আমি বিন্দুমাত্র হইনি রঞ্জিত। বঙ্কিম থাকলেও তাকে আজ এসব কথাই বলতাম। আচ্ছা তুমিও তো বঙ্কিমের দলের লোক, তবু সীতার জন্য তোমার উপর এত নির্ভরতা কেন আসে বল তো।

রঞ্জিত বেশ উন্মনা বোধ করছিল। বঙ্কিমের সঙ্গে তার যে কত তফাৎ তা সে জানে। তাই বঙ্কিমের সঙ্গে তাকে সমাসানে বসানোর এই অজ্ঞান প্রচেষ্টার প্রতি সে কৃপা ছাড়া আর কি করতে পারে।

অজয় বসাক সহ সীতার প্রবেশ পরিস্থিতিকে অনেক হাল্কা করে দেওয়ায় রঞ্জিত বাঁচলো এযাত্রা। মণিমাকে নিরস্ত করার সমস্যার এরকম ভাল সমাধান সে নিজে হাজার চেষ্টা করলেও বার করতে পারত না।

সীতার সঙ্গে চোখাচোখি হল, কিন্তু বাক্যবিনিময় হল না। অজয়কে তার ভাল লাগে না। এই অকারণ ভাল না লাগার কোন মানে হয় না সে বোঝে। তবুও। অতএব মৃদু হাসি ও নমস্কার বিনিময়ান্তে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে উঠে পড়ল। সীতার মুখে আবাহন বা বিদায় সম্ভাষণ কিছুই উচ্চারিত

হল না—সেদিকে তার লক্ষ্য সামান্যই। কারণ মণিমা এইমাত্র যে ধাঁধা সৃষ্টি করলেন, সেটা পীড়ন করতে লাগলো তাকে অনুক্ষণ। ক্ষণিক বিদ্যুৎ চমকের আলোয় পথ দেখে পথ হারিয়ে যাওয়ার মত একটা তীব্র অন্ধকার যেন্ গ্রাস করল তাকে।

॥ বারো ॥

বঙ্কিমের মুক্তির উটকো সংবাদ তার চিঠিতে প্রতিষ্ঠিত হলো। ভবভূতির বাতের অসুখ অর্ধেক উপশম হয়ে গেল এক রাত্তিরে। প্রচণ্ড উৎসাহিত হয়ে জানালেন স্ত্রীকে—অনেককাল রাণীকে দেখতে যেতে পারিনি। আজ যাব।

স্ত্রী বললেন চোখ কপালে তুলে—একা?

ভবভূতিবাবু আনত দৃষ্টিপাতের অভ্যাস ভেঙ্গে সোজা মর্মভেদী দৃষ্টি হানলেন। বললেন—দেখ, নদী মরে গেলেও রেখা থাকে।

হেসে ফেললেন ভবভূতির স্ত্রী। মনে পড়ল বঙ্কিম কোলে আসার আগে কি ধরনের ঝাঁঝ নিয়ে কথা বলতেন। এরকম অবস্থায় হয়ত বলতেন—রাণীর নামে দেখছি আড়ষ্ট অঙ্গ সোজা হয়ে উঠছে। কিন্তু এখন বললেন—কিন্তু যেতে পারবে তো—তুমি?

যত দিন গেছে ওভাবে কথা বলার প্রবৃত্তি কেন যেন তিনি ক্রমে ক্রমে হারিয়ে ফেলেছেন।

যত দিন গেছে তত যেন বুঝেছেন, ভবিতব্যের হাতে প্রকৃতপক্ষে মার খেয়েও তিনি জিতে গেছেন; আর ক্রমে কেমন শান্ত হয়ে গেছেন। অন্তরের ঝড়কে ঔদাসিন্যের সাধনা দিয়ে তিনি ধারণ করে আছেন সারা জীবন। তারপর সীতা এলো। ওরা বড় হলো। বঙ্কিম পাস করলো, কত দুর্ভোগ এলো, গেলো—যাক সে সব।

এখন কিন্তু রাণীর প্রতি বিদ্বেষের বদলে এক অদ্ভুত সহানুভূতি পোষণ করেন সীতার মা। রাণীর আর কোন দোষ নেই। শুধু তেজ। মেয়ে মানুষের কি

অত তেজ সহ্য হয়। নিজের তেজে নিজেই জলছে সারা জীবন। সত্যিই তো রাণী নারী যেখানটায়—সেখানটায় কী পেয়েছে বেচারী।

বললেন—আমারও একবার দেখে আসা উচিত। আজ তুমিই যাও। আমি আর একদিন যাব সীতাকে সঙ্গে করে। কিন্তু সাবধানে যেও। লাঠিটা নিও সঙ্গে।

রাণী দিদিমণি ইতিমধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গিয়েছেন। ডাক্তারদের মতে রোগীর অপ্রত্যাশিত উন্নতিই এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পাবার কারণ। কারণ যাই হোক উনি বাড়ী ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এবং সেকথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে ফেললেন প্রথমদিনই রঞ্জিতের সামনে। —হাসপাতালের পাতালপুরীতে যেন কাউকে না যেতে হয়।

এরকম উক্তির মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অবহেলা করার কুসংস্কারের গন্ধ পেলো রঞ্জিত। তাই স্থির থাকতে পারলো না। লঘু পরিহাসচ্ছলে হলেও এর একটা জবাব দেওয়া কর্তব্য বিবেচনা করে বলল—এইজন্যই বোধহয় মণিমা, ইংরেজ কবির ব্লো ব্লো দাই উইণ্টার উইণ্ড; আর বিদ্যাসাগর মশায়ের খেদোক্তি যার নিগলিতার্থ হল—নিন্দেই উপকার পাবার নিশানা। আর সেসব কথা বাদ দিলেও—অন্ধ কুসংস্কারের ভূত যে আমাদের রক্তে।

মণিমা একথার মধ্যস্থ শ্লেষ বুঝতে পেরে একটু হাসেন। এদের জানার কথা নয়—কিন্তু ভগবান জানেন অন্ধকার কুসংস্কারের ভূত কতটা তাঁর রক্তে। তিনি যে কালের মানুষ—সে কালে খ্রীষ্টানী কার্যকলাপের দায়েই যে তাঁকে অভিযুক্ত হতে হ'তো।

কারণ নারীশিক্ষায় তিনি বিশ্বাস করতেন। নারীর স্বাধীন সত্তার স্বপ্নে তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন। আর সে বিশ্বাসমত চলতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। আঘাত পেয়েছেন অনেক, নিজের সীমাবদ্ধতার কথাও তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু প্রচলিত কুসংস্কার বলে যা বুঝেছেন—তার বিরুদ্ধে মাথা জাগিয়ে যতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছেন—সেটুকু পুঁজিও কী নেহাৎ অবহেলার।

রঞ্জিতের এইরূপ অভিযোগের জবাবদিহি করতে সত্যিই তার রুচিতে আটকায় আজ। তবু জবাব দিতে হয়। কিন্তু বিরক্তি এড়াতে পারেন না জবাবে।

—তোমরা একালের ছেলে। তোমাদের নিশ্চয়ই অধিকার আছে সেকালের মেয়েদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করবার। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানকে মানি বলে হাসপাতালের অব্যবস্থাকে ব্যবস্থা বলে সার্টিফিকেট দিলে—চিকিৎসা শাস্ত্রের

তো কোন কল্যাণ হবে না রঞ্জিত। ভাল বলতে ষোল আনাই ভাল, আর মন্দ বলতে ষোল আনাই মন্দ—একটু চিন্তা করলে দেখবে এ ধারণার মধ্যে খুঁতই ষোল আনা। তাছাড়া হাসপাতাল বা অন্য যে ব্যবস্থাই হোক, ঘরোয়া ব্যবস্থার গণ্ডি ছেড়ে বাইরে পা দিলেই এ বয়সে মন দমে যায়।

দিনরাত বর্তমানের আলো থেকে বঞ্চিত থাকতে হয় বলে মগজে কেবল অতীত এসে ভিড় করে। চোখের ব্যাণ্ডেজ নেই কিন্তু নতুন চশমা না হওয়া পর্যন্ত হয়ত এই ভাবেই চলবে। যতক্ষণ একা থাকেন বিশ্রী একা লাগে। মনে হয় যেন অন্ধকারের এক মহাসমুদ্রের মাঝে তিনি একলা হাবুডুবু খাচ্ছেন। কেউ নেই কোথাও। তখন সুদূর অতীত এসে তাঁকে উদ্ধার করে এই অন্ধকার মহাসমুদ্রের তরঙ্গাঘাত থেকে। মৃত দিনগুলি জীবন্ত হযে তাঁর চারপাশে নাচে।

বলতে গেলে ভবভূতিকে বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি নিজ হাতে করে। সেই সব ছবিগুলি তাঁর মনের পৃষ্ঠায় অবিকৃত রেখায় মুদ্রিত।

হাঁ, গৌরীদানের স্বামীকে বড় হয়ে মনে না ধরা হয়ত কারো অপরাধ নয়। অস্বীকার করাটাই অপরাধ। সে অপরাধ করার মত দুঃসাহসিকতা তাঁর ছিল। কারণ মনের সঙ্গে কাজের জোড়াতালি দিয়ে চলার চেষ্টাকে তিনি তখনও ঘৃণা করতেন আর আজও।

হাঁ, তখনকার দিনে ওটা দুঃসাহসিকতা বৈকী। শুধু কী তখনকার দিনে—একালেই বা ক'টা মেয়ের বুকের পাটায় ওরকম পরিস্থিতিতে সে শক্তি থাকে।

পুরুষেরা ঠিক বোঝে কিনা দিদিমণি বলতে পারেন না। কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা নারীদের পক্ষে ঝড়ো কাকের রাগী-জীবন গ্রহণ করা যে কী বিপৎসংকুল একমাত্র তারাই তা জানে হাড়ে হাড়ে।

সেদিন ভবভূতির সহানুভূতি আর আশ্রয়ের মূল্য তাই দিদিমণির কাছে অপরিমেয়। এ আশ্রয় ছিল বলেই উচ্চশিক্ষালাভ হয়েছিল তাঁর পক্ষে সহজ।

শুধু কৃতজ্ঞতার গণ্ডিতেই যদি আবদ্ধ থাকতে পারতেন ভালই হতো। কিন্তু ভবভূতিকেই তিনি ভালবেসেছিলেন। তবু সেই ভবভূতিকেই নিজ হাতেই বিয়ে দিয়েছিলেন দিদিমণি।

সেদিন যা ভেবেই তা করে থাকুন—আজ তিনি উপলব্ধি করতে পারেন।

তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে—অমনঃপূত পুরাতনকে ভেঙ্গে ফেলবার বুকের পাটা থাকলেও, নতুন করে জীবন শুরু করার সাহসের তাঁর অভাব ছিল।

একালে মেয়েরা অনেক এগিয়েছে। এ'তো এই দুচোখ ভরে তিনি দেখেছেন, দেখেছেন আর বুক ভরে গেছে তৃপ্তিতে।

তিনি যেখানে থেমে গিয়েছেন, আরও অগ্রসর হতে বুক কেঁপেছে তাঁর, আস্থার অভাব বোধ করেছেন, পরবর্তী কালে দেখেছেন তিনি, দ্বিধাহীন চিত্তে, অকম্পিত বক্ষে, আরও আরও সম্মুখে বহুদূর অগ্রসর হচ্ছে মেয়েরা।

টাউন স্কুলের তরুণী শিক্ষয়িত্রী ঝর্ণা রায় নতুন করে জীবন শুরু করে—সুখী—হাঁ সুখীই হয়েছে। নিজ চোখে সুখী হতে সার্থক হতে দেখেছেন তাঁরই দু একজন ছাত্রীকে। আরও কিছুদিন যদি বাঁচেন দেখবেন, আরও দেখবেন—দোমড়ানো বাঙ্গালী মেয়েগুলো—ধীরে ধীরে কেমন ঋজু হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

শুধু পুরানো জীর্ণ ঘরগুলো ভেঙ্গে ফেলেই থেমে থাকছে না তারা, নতুন ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে, ঘর তুলে, সে ঘরে বাস করে তবে তারা ছাড়ছে। কিন্তু তবু, সে কয়জন?

সীতার মাকে বিয়ে দিয়ে আনার ঘটনা মনে পড়ে। ভবভূতির এ বিয়েতে ছিল প্রচণ্ড আপত্তি। কিন্তু সে আপত্তি তিনি টিকতে দেননি।

ভবভূতি অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কিন্তু রাণী তুমি?

জবাবে রাণী বলেছিলেন দৃঢ় কণ্ঠে। দৃঢ়তার তলায় কী ছিল ভবভূতি অবশ্য তা দেখতে পাননি। রাণী বলেছিলেন—তুমি কি ভাবো রাণীর সমস্যা শুধু বিয়ে করার সমস্যা? যেন আত্মপ্রতিষ্ঠাকে ধামাচাপা দিয়ে কোনরকমে স্বয়ংবর হতে পারলেই নারীসমস্যার সুরাহা হয়ে গেলো।

ক্রোধ চাপতে গিয়ে শ্লেষে পরিণত হয়েছিল ভবভূতির—হাঁ তোমার তো আবার নারীমুক্তির সমস্যা আছে। Emancipation of woman from the fatal grasp of man.

রাণী মনে মনে ভেবেছিলেন রাগ না লক্ষ্মী। প্রকাশ্যে বলেছিলেন—হাঁ তা আছে বৈকি। অমি সংসার ভেঙ্গে বেরিয়েছি—শুধু একটা পাল্টা সংসারাশ্রমে প্রবেশ করার জন্যই নয়। কিন্তু তোমাকে তো সংসার করতে হবে।

শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল। ভবভূতি বরের সাজ চড়িয়েছিলেন তাঁর অঙ্গে। কিন্তু সেই থেকে যে চোখ নামিয়ে আলাপ শুরু হল বেচারীর—সে চোখ আর উঠলো না। অপরাধ যদি করে থাকে—করেছিলেন রাণী অথচ অবাক এই যে কেমন একটা অপরাধীর মনোভাব যেন পেয়ে বসলো ভবভূতিকে। পরবর্তী কালে কতবার রাণী চিন্তা করেছেন আর কিঞ্চিৎ হেসেছেন মনে মনে।

এতই যদি অপরাধী মনে করেছিল নিজেকে—অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ভবভূতি সেদিন তাঁকে জীবনের সঙ্গে জড়াতে চাইলেই তো পারতো। কিন্তু তিনি তাহলে কী করতেন!

যা ঘটেনি, তা ঘটলে কী হ'ত—এ কষ্টসাধ্য কল্পনার কখনও কূলকিনারা পান নাই।

একালে সর্বস্ব পণ রাখা প্রেম দেখেছেন ঝর্ণা রায়ের স্বামীর বেলা। অসামাজিক প্রেমকে সামাজিকতায় প্রতিষ্ঠা করার সে দৃঢ়তা যদি ভবভূতির থাকতো—রাণীর অভাব কিছুতেই কি বাণী দিয়ে পূর্ণ হতে পারতো? আজ যেন একটা উপলব্ধি ভয়ে ভয়ে আলতো করে তাঁকে এসে ছুঁতে চায়ঃ তাঁদের কালের পুরুষের প্রেমের গভীরে কি তাহলে চাপা থাকতো জীর্ণ সংস্কারের প্রতি ভয়ের একটা অন্তঃপ্রবাহ—যা উপর থেকে ধরা পড়তো না। পরক্ষণেই এ চিন্তার লাগাম টানেন। কারণ শুধু ভবভূতিকে দিয়ে সেকালের সমস্ত পুরুষজাতের উপর অভিযোগটা চাপানো চলে কিনা—আজ আর তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ নন।

নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই এখন কর্কশ লাগে। কিন্তু একদিন ছিল যখন তা লাগত না। তখন গান গাইতে ইচ্ছে করত। কিন্তু গান করতে পারতেন না—তাই কবিতা আবৃত্তি করে নিজের প্রতি নিজের ভালবাসার গভীরে নিমজ্জিত হতেন। মনে মনে এই মুহূর্তে তিনি সেই আত্মমুগ্ধ তরুণী মেয়েটি—যার চটির চটু চটু আওয়াজ শুনে সেকালে বুড়োরা নাক সিটকাতো। রোয়াকের উপর বসে তেল মাখতে মাখতে বলতো ম্যাস্টারনী যাচ্ছেরে। কেউ বলতেন—সেই খিষ্টানী মেয়েটা।

তারপর টাউন স্কুল। টাউন স্কুল আর তিনি। উদ্দাম কর্মযোগের নিরলস সাধনা—কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে।

ভবভূতির প্রথম সন্তান বঙ্কিমের বয়স তখন প্রায় পাঁচ বছর। সীতার জন্ম হলো। সীতাকে দেখতে গিয়ে—হঠাৎ কেমন একটা আর্তি অনুভব করেছিলেন আজো মনে আছে। ভবভূতিকে বলে ফেললেন—মেয়েটাকে আমায় দিয়ে দাও, আমি মানুষ করি।

ভবভূতি হাসলেন, বললেন—মেয়ের মালিক কি আমি? বৌ শুনে বললো—তাতো বলবেই, ও যে তোমার মত দেখতে হয়েছে রাণীদি। তারপর কিঞ্চিৎ হেসে ফেলে বললো—নিঃশর্ত হয়ে দেবো কিন্তু। রাজী আছো তো?

রাণীর ঝোঁক অব্যাহত তখন, বললেন—একটা স্কুলকে মানুষ করছি, আর

একটা সামান্য মেয়েকে মানুষ করে তুলতে ভয় পাবো—সে বান্দা রাণী নয় বৌ হোক লেখাপড়া।

জেদী লোক দিদিমণি। সত্যি সত্যি লেখাপড়া করে ছাড়লেন। আ আড়াই বছর বয়স থেকেই নিজের বাসায় নিয়ে তুললেন মেয়েকে। মেয়ে নামকরণ করলেন সীতা। ভবভূতিকে বললেন—কি নাম রাখার ছিরি সব ছেলের নাম বঙ্কিম থেকে 'বাঁকা' আর কচি মেয়ের নাম যখন বুড়ী হতে পেরেছে—'ভাঙ্গা' হতে কতক্ষণ। ঐ কপাল নিয়েই তো এদেশের মেয়েগুলো জন্মায় ছেলের নাম আমার এক্তিয়ারের মধ্যে নেই। মেয়ে আমার, আমি ওর নতুন নামকরণ করলাম সীতা।

সেই নামই চলছে।

শুনে ভবভূতি বলেছিলেন—যাক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

—কেন?

—তোমার মনে পড়বে হয়তো, বিয়ের পর একদিন তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, এরপর আমাদের সাধারণ সম্পর্কটাও কি অসহজ হতে দেবে তুমি? তুমি বলেছিলে—তাইতো হয়। সেই থেকে ভয়ে ভয়ে ছিলাম। আজ হাঁফ ছাড়লাম।

রাণী সেকথা যেন শোনেনই নাই এরূপভাবে অন্যদিকে চেয়েছিলেন।

দুপুরে তাঁর স্কুল। আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। তবুও মেয়েকে দেখবার জন্য একজন ঝি রাখলেন। টিউশানি ছাড়লেন সকাল বিকাল। সেক্রেটারি আর কমিটি মেম্বারদের বাড়ী যাতায়াত সংক্ষিপ্ত করলেন। ইস্কুল মানুষ করার অনেক অঙ্গ বাদ দিয়েও সীতাকে মানুষ করার সে কী উদগ্র নেশা কিছুদিন!

মা না হবার আর্তি তিনি বোঝেন। আবার সীতার মা হয়ে সন্তানের জননী হবার পূর্ণ অনুভূতিও তাঁর হয়েছে বলে তাঁর একান্ত বিশ্বাস। এই উদ্দামতা সীতার সাত বছর বয়সের পূর্বে ক্ষান্ত হয়নি। সহসা একদিন তাঁর চৈতন্য হল। একী করছেন তিনি! যতই তিনি ভালবাসুন সীতাকে—ওর মায়ের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কি সত্যই তাঁর আছে! আর সীতার জননীকে সন্তানের নিকট পর করে দেবার এই অমানুষিক প্রয়াস শুধু হাস্যকরই নয়, অনধিকার চর্চা।

দিদিমণি এক স্বতন্ত্র ধাতুতে তৈরী মানুষ। চিন্তা মাত্র কাজ। সীতাকে বোঝাতে শুরু করলেন। তার পিতামাতাকে নোটিস দিলেন। লেখাপড়া

করা দলিল ফেললেন ছিঁড়ে কুটি কুটি করে। সীতাও কি যেতে চায়? কী কান্না মেয়েটার! কিন্তু তখন রাণীর মনের গতি বিপরীত দিকে উদ্দাম। সীতাকে ভবভূতির বাড়ীর বাসিন্দা না করে দিয়ে আসা পর্যন্ত কি তাঁর মুক্তি আছে!

এবার স্কুলের প্রতি মনোযোগ সংহত করতে গিয়ে বুঝলেন—কিছু পরিবর্তন হয়েছে যেন তাঁর। মনের আরও খানিকটা খোয়া গেছে সীতার খাতে।

বাড়ীতে প্রথম প্রথম মনে হতো—সীতাকে যেন বনবাসে রেখে এসেছেন। ভীষণ একা লাগত নিজেকে। সীতাকে তিনি গর্ভে ধারণ করেন নি—তাই এসব বিশ্বাস করবে কে। কাউকে বলে মনের নিরুদ্ধ বাষ্পকে মুক্ত করে হাল্কা করবেন—তাও পারেননি সেদিন। আজও কি পেরেছেন!

তা যদি পারতেন—সীতা তার মায়ের কোলে ফিরে যাবার একযুগ পর—আজও কেন গোপন উৎকণ্ঠার শাস্তি ভোগ করেন তিনি? এখন সীতা সম্পূর্ণ ও বাড়ীর মেয়ে। তিনি শুধু মণিমা তার। শুধুই মণিমা।

তবু সীতার ভবিষ্যৎ, তার সুখ, তার মানুষ হয়ে দাঁড়ানোর স্বপ্নের মধ্যে কেন এত আত্মতৃপ্তির আবেশ খুঁজে পান সীতার মণিমা!

জীবনের ধর্ম সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকার সাধনা। বর্তমানের আত্মা উত্তরকালের আত্মায় রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যে হয়ত সার্থকতা সন্ধান করে। মানুষ নবজন্ম লাভ করে আত্মজের মধ্যে। তাই ঘোর কৃপণও সারা জীবনের সঞ্চয় উজাড় করে মহীয়ান হয়ে উঠতে চায়।

জীবনধর্মের সেই রহস্যে মণিমাও ত্যাগ করতে চান। সার্থক হয়ে উঠতে চান। তাঁর সারা জীবনের পুঁজি সীতাকে ডালি দিয়ে যেতে চান—গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে। মণিমার কোন আত্মজ নেই—যার ধমনীর মধ্যে কান পেতে শুনবেন নিজ রক্তের স্পন্দন।

জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে তবু সেই মণিমা জীবনধারার উত্তাল প্রবাহ অনুভব করেন অন্তরে। জৈব সূত্রে সীতা তাঁর আত্মজা বলে গণ্য হতে পারে না। কিন্তু অন্তর সূত্র! সে কি কিছুই নয়? সম্ভবতঃ এ সংশয় এখনও অমীমাংসিত তাঁর মনে। তাই ত্যাগ, কুণ্ঠা আর গোপনতার চাদর ঢাকা।

এই অবস্থায় তবু মাঝে মাঝে রঞ্জিত আসে, আসে ডাক্তার—ঝি কাজ করে যায়। ওদের সঙ্গে কথাবার্তায় মাঝে মাঝে তবু দুদণ্ড অতীতের গহ্বর থেকে মুক্তি পান। তখন আবার বর্তমানে ফিরে আসার আর্তিতে আকুল হয়ে ওঠেন। কবে আবার তাঁর চোখেরা পাবে মুক্তি, হয়ে উঠবে জ্যোতিষ্মান, আর

পাবেন এই অতীতের সঙ্গে ঘর করার হাত থেকে পরিত্রাণ। হাজার হোক এসব অতীত নিয়ে ঘর মৃতের সঙ্গে ঘর করা ছাড়া আর কি। স্মৃতিতে মাধুর্য আছে সন্দেহ নেই—কিন্তু বেদনার বিষও তাতে কম নেই। সেটা বোঝা যায় তার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার সময়।

ভবভূতি এলেন সেদিন। জানালেন বঙ্কিম শীঘ্রই মুক্তি পেতে পারে লিখেছে। তারপর খুঁটিনাটি তার চিঠির ছত্রগুলো পড়ে শোনালেন।

বঙ্কিমের জন্যও মণিমার উৎকণ্ঠার সীমা নেই। আজকালকার ছেলেদের এই ইচ্ছা-বৈরাগ্য—ইচ্ছা-বৈরাগ্যই বলেন তিনি—যেন একটা রোগে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাঁর মন আচ্ছন্ন করে থাকে সীতা।

ঘুরে ফিরে ভবভূতি বাবুর আলাপও যেমন সব প্রসঙ্গ থেকে বঙ্কিম প্রসঙ্গে এসে উপস্থিত হচ্ছে—মণিমারও তেমনি। তাঁরও যেন পাল্লা দিয়ে সব প্রসঙ্গই সীতা প্রসঙ্গে এসে পরিণতি লাভ করছে।

মণিমা কথাপ্রসঙ্গে—ঠিক ইচ্ছা করে বলা যায় না—নিজের আকাঙ্ক্ষার একটা আভাস দিয়ে ফেললেন। বললেন—আচ্ছা সীতার সঙ্গে তোমাদের মাস্টারের বিয়ে দিলে কেমন হয় বল তো!

ভবভূতি চমকে উঠে বললেন—বিয়ে? সীতার সঙ্গে মাস্টারের। হতে পারে নাকি?—তাহলে—হবে। হঠাৎ দৃষ্টি জানালার দিকে পড়ায় প্রসাঙ্গান্তর উত্থাপন করে বসলেন—তোমার সে বাতিকটা গেছে—সেই আমার জন্য খবরের কাগজ সাজানো সন্ধ্যাবেলায়?

—বাজে কথা রাখ—উদ্ধত হয়ে উঠলেন মণিমা।

ভবভূতি সংকুচিত হয়ে গেলেন—ওঃ-হাঁ বিয়ে। মাস্টারের সঙ্গে সীতার। বেশ তা তোমার নারীমুক্তির কী হবে?

বৃদ্ধ ভবভূতি যৌবনের জমা করে রাখা তূণ তুলেছেন—বহুদিন পরে। ভালও লাগে খারাপও লাগে রাণীর। বঙ্কিমের মুক্তি পাবার সংবাদে পিতৃহৃদয়ের আনন্দ সঞ্চারের লক্ষণ ভবভূতির—তা বোঝেন মণিমা।

কিন্তু একথার উত্তরে অনেক কথা বলা যায়, আর তা বলতে গেলে সেটা হয়ে ওঠে একটা প্রকাণ্ড ঝগড়ার আকার।

কিছু বললেন না রাণী। ভবভূতি ভরসা পেয়ে কণ্ঠের পর্দা চড়িয়ে গজগজ করতে করতে বললেন—কেন, Emancipation of woman, মুক্তি, নারীমুক্তি। ও মেয়েটার নারীমুক্তির কী হবে তাহলে?

এবার সত্যিই জ্বলে গেলেন রাণী। চোখ দুটো ভাল থাকলে—শুধু দৃষ্টিপাতেই পুড়িয়ে দিতে পারতেন ভবভূতিকে।

ভবভূতি কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন—তবে নারীমুক্তির জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত যদি তুমি হও রাণী—আমি বলব, একশোবার বলব, আত্মপীড়ন ছাড়া, দুঃখ-ভোগের বিলাস ছাড়া—ওটা অভিজাত সমাজের ধার করা কথা।

রাণী দিদিমণির জ্বলে ওঠা জল হতে শুরু করে—সহানুভূতিতে। কত যুগ পরে মানুষটার অল্প কথার বাঁধ ভেঙ্গে পড়েছে—সে হিসাব আর কেউ না জানুক রাণী তো জানেন। উনি ওঁর মুখ দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়েই বুঝতে পারছেন অক্লেশে—এ সেই ভবভূতি—যে ঋজু হয়ে দাঁড়াতো, সোজা করে চাইত, উচ্চ কণ্ঠে কথা বলতো আর দরাজ গলায় হাসতো। সেই যুবক মানুষটি।

তাঁর চোখের ক্ষীণ দৃষ্টিপাত বলতে গিয়ে ব্যথায় বুজে ওঠে, আর মনে হয় যেন সেকালের সেই তরুণী মেয়েটি তিনি।

—আমি তা অস্বীকার করি না। মেয়েরাও মানুষ, এই স্বীকৃতিই আমি জীবন ভ'র কামনা করেছি মাত্র। বৃহত্তর নারীমুক্তির ক্ষেত্রে কখনও যদি আমি প্রতিবন্ধক হয়ে উঠে থাকি—একালের হাতে না হয় উচ্ছেদই হবো।

ভবভূতি বাবু নিভে যেতে যেতে বাধা পেয়ে আবার উস্কে উঠলেন। বললেন —দুঃখভোগই যাদের তৃপ্তি দেয়, ফল লাভের চেয়ে বেদনা বিলাসকেই যারা বেশী খাতির করে, এমন কোন্ দেবতা আছে বল ত—তাদের দুঃখ দূর করবে।

—বেদনাবোধকে অত ছোট করে দেখ না, বেদনাবোধ ছাড়া, দুঃখের আঘাত ছাড়া, বড় উপলব্ধি, বড় সৃষ্টি কদাচিৎ ঘটেছে।

কথার পৃষ্ঠে এবার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না মণিমার। মনের যে বিকল তারটা এই মুহূর্তে ভবভূতি বাজিয়ে দিলেন সেটা বড় দুর্লভ তার। তাই যে নিভৃত মুহূর্তের প্রয়োজনগুলো উঠতে শুরু করেছে—ওকে সঙ্গৎ করার জন্য —সেগুলিকে তর্কের মধ্যে আদৌ সমর্পণ করার ইচ্ছে নেই তাঁর।

ভবভূতি কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন আরও। রাণী চুপ করিয়ে দিলেন নেহাৎ আচমকা তালভঙ্গের মত।

—যাক্। একপুরুষ আগের ঝগড়ার জের টেনে এই বয়সে আর কুরুক্ষেত্র করতে আমি রাজী নই। আমি টাউন স্কুলের হেড মিস্ট্রেস। আমার একটা মান-সম্মান আছে।

রাণীর সেই মূর্তির আবির্ভাব। সেই পুরুষবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক মূর্তি। ওঁর

এই ঝাঁজকে তখন ভবভূতি—'সাম্প্রদায়িক' এই নাম দিয়েই ঠাট্টা করতেন। হাসি পেল ভবভূতির! রাণী তখন বন্য মুরগীর মত চোখ গোল গোল করে পাকিয়ে বলতেন।—হাঁ। সাম্প্রদায়িক যদি বল তাই আমি। পুরুষবিদ্বেষ আমার সত্যিকারের আছে কিনা হিসাব করে কখনও দেখিনি। তবে এটুকু দেখেছি—পুরুষদের জন্য বলার লোক ঢের আছে দুনিয়ায়। আমার কথা নারীর জন্য, আমার সমস্যা নারীমুক্তির—

ভবভূতি তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বলে ফেলতেন—বর্বর পুরুষ জাতির গোলামখানা থেকে নারী মুক্তির—বেশ এক্টোর মত করে।

আর রাণীর রাগ এত তীব্র হয়ে উঠতো যে হেসে ফেলতেন নিরুপায় হয়ে।

আজ কিন্তু লজ্জিত হলেন ভবভূতি। সত্যিই তো সেদিনকার সেসব কি আর এখন শোভন। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ্‌সে গেলেন তিনি। ফিরে এলেন বর্তমানে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। বললেন রাণীকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে—তাহলে চলি, আবার আসবো।

রাণীর কানে সে সব আসছিল না। দুর্লভ বিকল তারটার তানের মূর্ছনায় তিনি অভিভূত। একে একে বিগত দিনের ব্যর্থতা আর সার্থকতা—সে সঙ্গীতের পটভূমিকায় ছায়াচিত্রের মত আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে।

চোখের আলো ফিরে পেলেই—আবার তাঁর সেই দৈনন্দিন মাস্টারি, তাঁর ছাত্রছাত্রী, আর ছককাটা একঘেয়ে দিনযাপনের গ্লানি।

ভবভূতি নারীমুক্তিকে ঠুকে এখনও কি এই কথাই বলতে চান—তিনি ব্যর্থ।

ভবভূতি কি করে বুঝবেন। তাঁর আছে স্বাবলম্বনের গৌরব। আছে দুঃখের সঙ্গে লড়াই করার অ-মামুলী নারী-সুলভ মহিমা আর আছে পর্বতপ্রমাণ বিরোধের সামনেও আপন ইচ্ছানিষ্ঠার দৃঢ়তা।

একঘেয়েমির কথা। সে আর অল্পবিস্তর কার জীবনে নেই। একঘেয়েমির মধ্যে যারা বৈচিত্র্য খুঁজে বার করতে পারলো না—সত্যিকারের ব্যর্থ তো তারাই।

নাঃ সীতার যা ইচ্ছে হোক। ওর সম্পর্কে আর কোন কথা বলতে চান না ওদের।

সহসা বিজয়িনীর ভঙ্গীতে সকল দুর্বল চিন্তার আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন রাণী দেয়াল ধরে। পা দুখানা কাঁপছে। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করছে। কিন্তু দীপ্ত সংকল্পে বোজা চাহনি বেশ উদ্ধত।

॥ তেরো ॥

অবশেষে বণিক সংস্থার বার্ষিক অধিবেশনের দিনমণি প্রভাত হলো। প্রতি বৎসরই এদিন আসে। ব্রিটিশ আমলের কোন্ সুদূর সালে এর গোড়াপত্তন —সেই তখন থেকে।

সকাল থেকেই ক্যাপ্টেন বসাক অত্যধিক ব্যস্ত। তাঁর আজ নানা কাজ। এবারকার মত গুরুত্ব নিয়ে এদিনটি ক্যাপ্টেনের জীবনে আর আসেনি।

তাঁর শেষ মুহূর্তের চেষ্টা যে ফলপ্রসূ হবে না—এ তিনি প্রায় জানতেন। কার্যতঃ বসাক লেবরেটরিজ রাজমন্ত্রীর পরিদর্শনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত শেষ পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু ক্যাপ্টেন দমেননি।

পরবর্তী কার্যক্রমও তাঁর ছকা। এবং সে তদ্বিরও চলছিল পাশাপাশি। জিতেনের হাতযশের কথা তিনি মনে রাখবেন। আর মনে রাখবেন তাঁর সেই সব প্রাচীন মিলিটারী সহকর্মীদের যাঁরা বাছা বাছা জায়গায় বাছা বাছা পদ অলংকৃত করে আছেন।

সাধারণতঃ ছোটখাট বা সামান্য ব্যাপারে তাঁদের প্রভাব তিনি কাজে লাগান না। কিন্তু এবার ব্যবহার করলেন। সর্বোপরি বঙ্গ বণিক সংস্থার অন্যতম সহ-সভাপতির পদাধিকারের প্রভাবও তিনি কাজে লাগাতে কার্পণ্য করেননি এবার। কারণ প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর দ্বিতীয় কার্যক্রমের সাফল্যকে তিনি আর ছোটখাট বা নেহাৎ সামান্য ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে চাননি।

কাজেই আজকার দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠুক তাঁর জীবনে এটা তিনি চেয়েছিলেন।

তাঁর অনেক প্রতিযোগী ঠোঁট কামড়াতে শুরু করলেন। সামান্য ব্যাপার—কিন্তু ঐ মতলব, এভাবে, এসময়, ঠিক তাদের মাথায় আসেনি।

মন্ত্রী মহোদয়ের কলকাতা সফর উপলক্ষে ক্যাপ্টেনকে দিয়ে, শিউনারায়ণ যে ভূমিকা অভিনয় করাতে চেয়েছিলেন, প্রকারান্তরে ক্যাপ্টেন তাতে মাথা গলাননি। ভিতরে ভিতরে শিউনারায়ণ চটেছিলেন তাই। তুলার বাজারের স্যাঙ্গাৎ মিঃ প্যাটেলকে বললেন—বাঙ্গালীর বাচ্চা হোলে কি হবে। মহা ফেরেব্বাজ লোকটা। ঠিক সময়ে ঠিক মতলবটা মাথায় খেলে যায়।

পুঁজিতে ক্যাপ্টেনকে বগলদাবা করা গেলেও কৌশলী বলে ভয়ও কম নয়। ভারতের মধ্যমণি কারবারী গোষ্ঠীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শিউনারায়ণ বলতে গেলে হ্যাভ্‌নট্‌স্‌দের দলে। ওদের প্রভাব-প্রতাপের সঙ্গে এঁটে ওঠা কোনদিন সম্ভব কিনা তিনি জানেন না। অপর দিকে ক্যাপ্টেনের মত ছোটখাট যারা—তাদের উপর নির্ভরশীল অথচ দস্তুরমত সুযোগসন্ধানী—তাদের দিকেও এরকম সদা-জাগ্রত পাহারা রাখাই বা কাঁহাতক সম্ভব!

রাজমন্ত্রীর উদ্‌বোধনী বক্তৃতা শুনতে গিয়েও মনে শান্তি পেলেন না তিনি। একটা হ্যাভ্‌ নট্‌সের বেদনা চিন্‌ চিন্‌ করে পীড়া দিতে লাগল সর্বক্ষণ।

দেশের ব্যবসা জগতের যাবতীয় নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট শ্রোতাদের সামনে রাজমন্ত্রী মহোদয় বক্তৃতার ছাপানো কাগজখানা গড় গড় করে পড়ে গেলেন।

তাঁর বক্তৃতার চুম্বক যা ইতিমধ্যে সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতাদের স্তম্ভে কিছুদিন যাবৎ রকমফের হয়ে আলোচিত হচ্ছিল—মূলতঃ সেইগুলিই যেন শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজিয়ে বক্তব্য হিসাবে হাজির করা হল আজ।

রিপোর্টারদের টেবিলে নোট নেবার কোন ব্যগ্রতা দেখা গেল না। কারণ প্রত্যেকেই এ বক্তৃতার ছাপানো কপি পেয়েছেন একটা করে।

উপর থেকে মনে হয়—অনেকদিন ধরে একটা নাটক মঞ্চস্থ করার মহড়া চলছিল তোলপাড় করে পর্দার অন্তরালে। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মাধ্যমে সেটাই প্রকাশ্যে মঞ্চস্থ হয়ে গেল আজ।

নাটকের মহড়ার কোন না কোন অংশের সঙ্গে যেসব মাননীয় দর্শকদের ছিল পূর্ব পরিচয়—তাদের সংখ্যা অল্প। কিন্তু এখন তাদের মুখ দেখে যে কেউ চিনে বার করতে পারে—মুখচ্ছবিতে সে কথা এমন স্বপ্রকাশ।

ময়দানের বক্তৃতার শ্রোতাদের মত উদ্দাম করতালিকে এখানে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। তাই বক্তৃতার শেষে অত্যন্ত সংযতভাবে করতালি দিলেন সকলে। দুই করের ফাঁকের রুমাল শব্দের ব্রেক্‌ হিসাবে ব্যবহার করলেন অনেকে। বিশেষতঃ মহিলারা। অনুষ্ঠানের শেষে লনে বসলো পার্টি। সময় সংক্ষেপ। তবে ব্যবস্থা চমৎকার। চারিদিকে তাকিয়ে জিতেনের কথাটা আবার মনে পড়ল ক্যাপ্টেনের।

রাজমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথমেই ক্যাপ্টেনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল আনুষ্ঠানিকভাবে। হলঘরের মধ্যে তার গুরুত্ব যত ক্ষুদ্রই হোক, লনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকার দিনে আর তার গুরুত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

এটা মস্ত সম্মান। অনেকে চোখ ট্যারা করে চাইল।

রাজমন্ত্রী সহ বণিক সংস্থার সকল সভ্যকে এই বিশেষ দিনে পার্টি দিচ্ছেন বসাক। তিনি এখানে হোস্ট। এইটুকু গুরুত্ব ছিনিয়ে নেবার জন্য—মাথায় বুদ্ধি খেলিয়ে—অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাঁকে। তবেই এই সামান্য সুযোগ-টুকুকে অসামান্য মহিমায় রূপায়িত করতে পেরেছেন।

অনেক দেখে দেখে বুঝেছেন—গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার পক্ষে এ কায়দা রাজমন্ত্রীর লেবরেটারি পরিদর্শন অপেক্ষা কম কার্যকরী কায়দা নয়।

অভিজ্ঞতা বাড়ছে আর উপলব্ধি করছেন—সরাসরি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ছাড়া—শিল্পক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়া যেতে পারে ; কিন্তু ত্রস্ত উন্নতি যাকে বলে তা অসম্ভব। দেশের মাথা মাথা শিল্পপতিদের স্তরে স্তরে উন্নতির শিখরদেশে আরোহণ করার পুঙ্খানুপুঙ্খ রহস্যের অনেকখানিই তাঁর কাছে এখন উদ্ঘাটিত। তাই নিশ্চিত বিশ্বাস, ইদানীং সে পৃষ্ঠপোষকতা লাভের পথ আর যাই হোক সাতশালায় বর্হিভুক্ত থেকে যাবার পথ নয়।

আসলে শিউনারায়ণের সিভিল মার্কেট তত্ত্ব আঙুর ফল টকের তত্ত্ব ছাড়া আর কী! রাজমন্ত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পার্টি ত্যাগ করে যাওয়ার পরই প্রকৃতপক্ষে পার্টির আবহাওয়া জমে উঠল। সুবিন্যস্ত ছোট ছোট টেবিল ঘিরে চার পাঁচজনের ছোট ছোট জটলা চললো বহুক্ষণ ধরে।

একটা ছোট্ট লনের মধ্যে একটা বিরাট দেশ যেন একাত্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। একাত্ম হয়ে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে বাঙ্গালী আর গুজরাটী, ভাটিয়া আর সিন্ধী, পার্শী আর ইংরেজ। কিছুক্ষণের জন্য—অপস্রিয়মাণ অপরাহ্ণ সূর্যকে সাক্ষী করে।

সম্ভ্রান্ত আর সম্মানী জটলা। এ দরিদ্র দেশের সম্মুখে স্বর্ণ দিগন্ত উন্মোচন করার প্রকৃত ধন যাদের মণিকোঠায়। কাজেই সসম্ভ্রমে চলতে গিয়ে বসাককে লাট্টুর মত ঘুরপাক খেতে হয় প্রত্যেক টেবিলের পাশে পাশে।

ছোট ছোট গোষ্ঠীতে আলোচনা উঠছে নানা রকমের। রাজমন্ত্রীর নীতি-ঘোষণামূলক বক্তব্যের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া মুখরিত বিচিত্র সব আলোচনার টুকরো টুকরো স্রোত একত্রিত হয়ে কেমন একটা গুঞ্জন উঠছে বাতাসে।

ভ্রাতৃত্বসুলভ ঈষদুষ্ণ বাক্ বিনিময় চলছে—রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের ; তুলার সঙ্গে পাটের ; লোহার সঙ্গে তেলের আর কলকাতা বা বোম্বাইএর সঙ্গে বিলেতের।

ইংরেজ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিবর্গ একদিকে কয়েকটা টেবিল দখল করে

বসেছেন পর পর। কেমন যেন কোণঠাসা দেখাচ্ছে তাঁদের। বিচ্ছিন্ন হয়ে বসেছেন তাঁরা—কিন্তু আভিজাত্য বাঁচানোর ভঙ্গীটি অনম্বুকরণীয়।

একটা টেবিল জাঁকিয়ে বসেছেন এণ্ডারসনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ফেয়ার ওয়েল। ডেনকিন তাঁর পাশে। খোসা ছাড়ানো মুসুর ডাল রঙের আর স্থজন সাহেব। এঁদের মধ্যে গেরুয়া রঙের এক পাগড়িকে কেমন যেন দলভ্রষ্ট লাগছে। শিউনারায়ণ। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে—ঝড়ের মত কথার তুবড়ি ছুটছে তাঁর মুখে।

শিউনারায়ণ জমিয়েছেন বোঝা যাচ্ছে। ঘন ঘন পাগড়ী নড়ছে! বসাক পাশ দিয়ে চলে গেলেন। এঁদের কাছে একবার ইতিমধ্যে ঢুঁ মেরে গেছেন বসাক। তখন শিউনারায়ণ জোটেননি এসে। ফেয়ার ওয়েল একটা অরেঞ্জ কোয়াসের বোতল গ্লাসে ঢালতে ঢালতে শিউনারায়ণকে কি যেন বোঝাচ্ছেন। প্রক্ষিপ্ত কয়েকটা শব্দ কানে গেল।—···রেস্ট্রিকশান্,···ফরেন ইনভেস্টমেণ্ট,···ওণ্ট···। —শিওর, শিওর—গেরুয়া পাগড়ি দুপাশেই নড়ছে সমানভাবে।

মনে মনে হাসলেন। সবটা শোনার আর দরকার করে না। ওঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু বোঝার পক্ষে ওইটুকু সূত্রই বসাকের যথেষ্ট।

সরকারের শিল্পনীতিতে বসাকও যে পুরো সন্তুষ্ট এমন নয়। কিন্তু শিউনারায়ণের মত এরকম খোলাখুলি সেই অসন্তুষ্টি বিদেশীদের কাছে জাহির করা, আলোচনা জমানো তিনি পছন্দ করেন না। এ তো হ্যাংলামি দস্তুর মত!

ত্রিশ হাজারের লগ্নিদার মিঃ চকোরভাতি তেলাপোকা হয়েও নিজেকে পক্ষী শ্রেণীর বলে মনে করেন। তাঁর মতে মাইকার ব্যবসায়ের স্কোপ ছোট হলেও গুরুত্ব অসাধারণ। নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে সেটাই বোঝাচ্ছিলেন তিনি বহু কয়লা খাদের একচ্ছত্র পারশী ব্যবসায়ী মিঃ জাহাঙ্গীরকে। জাহাঙ্গীর ঘন ঘন ভ্রূ কোঁচকাচ্ছিলেন দাঁতে পাইপ কামড়ে। দেখে মনে হচ্ছিল—সাবরেজিস্ট্রারের মুখে—সাবরেজিস্ট্রারগিরি যে কত উচুদরের হাকিমী—সেটার উপর বক্তৃতা অসহায় ভাবে গলাধঃকরণ করছেন জেলাহাকিম—নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে। কিন্তু বাঙ্গালী স্বভাব যাবে কোথায়। ফেললেন তালভঙ্গ করে।

—আপনি তো টেগোর পড়েছেন। বাংলাও জানেন।

—তা একরকম জানি বলতে পারেন। কিন্তু টেগোরকে কি এখানে মানাবে মিঃ চকোরভাতি!

সেকথায় কর্ণপাতই করলেন না চকোরভাতি। আকাশী রঙের টাইটা একটু

আলগা করে কণ্ঠে একটা যান্ত্রিক উদাত্তভাব এনে বললেন, আবৃত্তির মত করে—

"দেবে আর নেবে, মিলিবে মিলাবে, যাবে না ফিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

মনে করতে পারছেন মিঃ জাহাঙ্গীর ?

জাহাঙ্গীর ঘাড় নাড়লেন। আর মিসেস ফাতিমা জাহাঙ্গীর ব্রেক কষা হাততালি দিলেন। সঙ্গে মিহিকণ্ঠের হাসি।

উর্দ্দিপরা আর্দালী কয়েকটা বোতল, আর কিছু কাঁচের গ্লাস রেখে গেল। আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে বললেন চকোরভাতি আবার—টেগোরকে কি খুব মিসফিটিং মনে হচ্ছে এ অকেশানে।

বসাক পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। চকোরভাতিকে সবিশেষ জানেন তিনি। পেছন থেকে পিঠে হাত দিলেন। চকোরভাতি চমকে উঠলেন।

—ডোণ্ট স্পিক্ রট চকোরভাতি—তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করলেন—এটা সাহিত্য সভা নয়।

চকোরভাতি ক্ষুব্ধ হলেন। প্রকাশ করলেন না। উল্টে হাসলেন কৃতার্থের হাসি। বসাককে হাতে রাখার সমস্যা তাঁরও আছে। জাহাঙ্গীরকে বললেন ইংরেজীতে যার বঙ্গার্থ সাহিত্য ক্ষেত্রেই চক্কোত্তি খাপ খাওয়াতে পারেন বেশী।

জাহাঙ্গীরে বসাকে অতঃপর হাণ্ডশেক। তারপর মিসেসে বসাকে। চকোরভাতি চাপা পড়ে গেল মুহূর্তে। জাহাঙ্গীর গ্লাস ভরলেন দুটো তিনটে বোতল থেকে—নানা রঙের জলে। তারপর গ্লাস উচু করে বললেন—অন বিহাফ অব মিসেস্ জাহাঙ্গীর অ্যাণ্ড মিসেল্ফ, কন্‌গ্রাচুলেশানস্ টু আওয়ার গ্রেট হোস্ট ক্যাপ্টেন বসাক।

চকোরভাতি এককালে প্রফেসরি করতেন। বিয়ের পর লাইন বদলেছেন যৌতুকের পুঁজি সম্বল করে। সেকথা ক্যাপ্টেন জানেন। এবং মওকা পেলেই পরিহাসচ্ছলে সে কথা শোনান। এটা মোটেই ভাল লাগে না চকোরভাতির। কিন্তু তবু হজম করতে হয়।

শিউনারায়ণ একটা গ্লাস উঁচুকরে ভুঁড়ি সহ দূর থেকে দৌড়ুতে দৌড়তে জাহাঙ্গীরের টেবিলে উপস্থিত। বসাককে অনেকক্ষণ যাবৎ চেষ্টা করছেন ধরতে। জাহাঙ্গীরের টেবিলে বসাককে দেখে তাই ছুটেছেন।

॥ চোদ্দ ॥

সীতার মনের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তা একমাত্র সেই জানে।

বঙ্কিমের সংবাদ বাড়ীর অনেকদিনকার রুদ্ধ গুমোট ভারী বাতাসটাকে কিঞ্চিৎ হালকা করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সীতার মনের অবরুদ্ধ উত্তাপকে লঘু করতে পারছে না বিন্দুমাত্র।

রঞ্জিতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার এমন ভাবে এড়িয়ে চলছে যা অনুভব করা যায়, প্রমাণ করা যায় না

ব্যাপারটা রঞ্জিতের ভাল লাগে না। মণিমার বাড়ীতে অত্যন্ত চেষ্টা করে ধরে ফেলল সে সীতার নাগাল। মণিমা তখন ভিতরে ঘুমুচ্ছেন।

রঞ্জিতের মেজাজটা নানারকম সূক্ষ্ম ওজনের টানা-পোড়েনের পাল্লায় বেশ বিভ্রান্ত।

—ব্যাপার কী? তোমার কি সন্ন্যাসি হবার মতলব নাকি!

—ঠিক বুঝতে পারছি না এখনও।—টিপে টিপে হাসল বলতে বলতে সীতা।

—অবাক করলে একেবারে—

—অকারণ অবাক হলে কী করতে পারি বলুন।

মেজাজের উষ্ণতা কথায় সংক্রমিত করে বলল রঞ্জিত—অকারণ অবাক হচ্ছি!

—তা একটু অকারণ বৈকি। কারণ আমি জানি কাউকে অবাক করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার আপাততঃ নেই।

এই পর্যন্ত বলে সীতা কেটে পড়বার চেষ্টা করল। রঞ্জিত পথ আগলে দাঁড়াল।

বলল—এই যে রোজ বিকেলে হাসপাতালের ডিউটিতে আটকে পড়ছ, এই যে আমার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতের সুযোগগুলো সযত্নে পরিহার করে চলছো, এই যে বঙ্কিম সংবাদে অদ্ভুত নির্লিপ্ততা—এগুলো কি অবাক হবার নয় বলতে চাও?

সীতা নিরুপায় হয়ে বসে পড়লো। বলল—চীৎকার করবেন না দয়া করে। ও ঘরে মণিমা আছেন।

—বেশ বাইরে কোথাও চল—যেখানে মণিমা নেই।

সীতা কী করবে আর কী বলবে বুঝতে পারে না। সে নিজেও নিশ্চিত নয় সব কিছু সম্পর্কে। সে এই লোকটাকে সত্যিই ভালবাসে কিনা সে কথাও যেমন তার হারিয়ে যাচ্ছে, তেমনি হারিয়ে যাচ্ছে এই লোকটার উপর তার শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস—যা তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল তার মনের মধ্যে। সামনে যে মানুষটি, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—আবার অবিশ্বাসও যেনকেমন গুলিয়ে ওঠে। কিন্তু ময়না সংবাদকেই বা সে উড়িয়ে দেবে কি করে।

চেয়ারে ধপ্ করে শব্দ হলো বসে পড়ার। কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। গভীর ভাবে কি যেন চিন্তা করল খানিকক্ষণ। তারপর বলল—যেন চেষ্টাকৃত ভাবে সহজ করতে চাইছে কণ্ঠ—আপনার ট্যাক্সির ঘটনা থেকে কিন্তু দস্তুর মত আতঙ্ক জন্মে গেছে আমার।

রঞ্জিত হেসে ফেলল। মনে হলো মেঘখানা বুঝি কাটল তবে। বলল—বেশ, তাহলে কোথাও গিয়ে কাজ নেই। ট্যাক্সিতে দশজনের চোখের সামনে যদি কেলেঙ্কারিটা সহ্য হয়ে থাকে—একটা ঘুমন্ত মানুষের আচ্ছন্ন চোখ—সে তো সামান্য বস্তু।

সীতা জবাব দিল না কিছু। চেয়ারের পাশে জানালার স্থান দখল করল গিয়ে রঞ্জিত।

রুগ্ন মণিমার ঘুম যে ঘন হয়ে উঠছে—তাঁর ক্রমবর্ধমান নাকডাকার আওয়াজে তা স্পষ্ট। ঝড়ের মত শব্দ করে শ্বাসপ্রশ্বাসের ওঠানামা চলছে তাঁর। ঠিক সীতার পাশে এসে বসে ঐ শব্দটা একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগিয়ে তোলে রঞ্জিতের। মনে হয় পাশের ঘরে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ক্রমক্ষীয়মাণ অতীত যেন বর্তমানের জন্য স্থান করে দিয়ে—আত্মবিলুপ্তির ইঙ্গিত ঘোষণা করছে।

রঞ্জিত সীতার কাঁধে একটা হাত রাখলো। সীতা একটু নড়ে উঠলো। তার পর হাসল। রঞ্জিতও। সীতা টেবিলের উপর রাখা খবরের কাগজের দিকে একটু বেশী করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। অনেক কথা মনে পড়ল তার। এই ঘরে সে অনেক কাল কাটিয়েছে। আর এই চেয়ারে তখন বাবা এসে বসতেন প্রত্যহ এই কাগজ হাতে করে।

তারপর সহসা চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে ফেললো। বলল—ট্যাক্সি দুর্ঘটনা কিন্তু আমার মনে একেবারে গাঁথা হয়ে আছে। আপনার যা বুদ্ধি—তা সম্বল করে বুঝি আপনাকে নিয়ে রাস্তা চলা যায়?

একটু আহত হল রঞ্জিত। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যে বোঝা

গেল সীতার আগ্রহ গভীর নয়। যেটুকু স্বপ্নাবেশের সুষমা লেগে উঠেছিল চোখে—সেটা কেমন ফিকে হয়ে যেতে বসল। অনর্গল একতরফা বকে যেতে লাগলো—এই ফাঁক পূরণ করার জন্য। অনেক খেইহীন সূত্রহীন কথাও।

সীতার চোখে আজ স্বপ্নাবেশের বিন্দুমাত্র আভাস নেই। আজ সে দৃঢ়। কোনরকম উচ্ছ্বাসেই নিজেকে আজ ভাসিয়ে নিতে দেবে না সে!

রঞ্জিত একসময় বলে উঠল এক অদ্ভুত কথা।

—আচ্ছা কালীঘাট প্ল্যান তোমার কেমন পছন্দ বল তো?

—কালীঘাট প্ল্যান! সে আবার কী? আপনার ট্যাক্সি প্ল্যানের মত কোন অভিনব জিনিস নাকি?

ট্যাক্সি প্ল্যানের খোঁচা বেঁধে না রঞ্জিতকে। বরং যেন ভালই লাগে। প্রেমের মাদকতায় এমন করে বাহ্যজ্ঞানরহিত হতে পারে ক'জন। ওটা তার জীবনের একটা অবিস্মরণীয় ইতিহাস স্তম্ভ হয়ে থাক।

বলল—অভিনব কিন্তু সম্পূর্ণ দেশজ। আমারই উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত। এবং আমাদের দিয়েই শুভ উদ্‌বোধন হোক এ প্ল্যানের।

সীতার বেশ মজা লাগল। কিন্তু ঢিপ ঢিপও করছে বুকটা কম নয়।

রঞ্জিত আবার বলল—ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের আপিসে গিয়ে বিয়ে বেজায় বিলিতী—দেশের মাটির সঙ্গে যেন একদম খাপ খায় না। আবার ছাঁদনাতলায় বসে টোপর মাথায় দিয়ে সাতপাক—সেটাও তো সেই রাজা গণেশের আমলের ব্যাপার। কিন্তু······

সীতা চোখ তুলে একবার একটা জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গিয়ে ফিরিয়ে নিল।

—কিন্তু আমার কালীঘাট প্ল্যান যেমন আধুনিক তেমনি দেশের মাটির মধ্যে এর শিকড়। বামুনের ছেলের কালীঘাটে সংক্ষেপে উপনয়ন হয় শুনেছ নিশ্চয়।

রঞ্জিতের আন্তরিকতাকে এতক্ষণে সত্যি সন্দেহ হতে লাগল সীতার। কী উদ্ভট! হ্যাঁ উদ্ভট বৈ কি। ছেলেগুলো কী অদ্ভুত বেহায়া। একটা মেয়েকে কী মনে করে ওরা! যে, যা-তা যখন-তখন বলতে, নির্লজ্জের মত, এতটুকু আটকায় না। পরিষ্কার একটা সম্মতির অপেক্ষা পর্যন্ত করার ধার ধারে না।

কিন্তু সীতার পরিষ্কার সম্মতির অভাব—একথা বললেই কি সত্যি বলা হয়! তাহলে ময়না সংবাদে তার মনে ঝড় ওঠে কেন? আর কেনই বা বঙ্কিমের মুক্তির সংবাদ পর্যন্ত তার মনের গুমোটকে পারে না মুক্ত করতে?

অত্যন্ত সলজ্জভাবে সে শোনে রঞ্জিতকে। উত্তর দেবার আদৌ ইচ্ছে নেই তার।

—রেজিস্ট্রারের আপিসের অনুষ্ঠানের মত পরিষ্কার আর সংক্ষেপ, ছাঁদনাতলার মত বাজে ঝঞ্ঝাট নেই—অথচ পুরোহিত আর বেদমন্ত্র রইল অব্যাহত! বল এবার—

কি বলবে এ কথার—সীতা বোঝে না।

রঞ্জিতের হঠাৎ খটকা লাগে। নিরুত্তর দেখে ওর মুখের দিকে তাকায়। চোখে চোখ পড়তেই জিজ্ঞাসা করে মৃদু হাসির আভায় মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করে—আজও আমার বুদ্ধিবিপর্যয় হয়েছে কিনা লক্ষ্য করছো নাকি?

সীতা বলল—না। আমি সামনে থাকলে, এখন থেকে আপনার বুদ্ধি-বিপর্যয় ঘটবে সেটা আগেই ধরে নিয়েছি। কিন্তু হঠাৎ আমাকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে উঠলেন কেন সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না।

এত উলঙ্গভাবে সীতা অভিযোগ আনতে পারবে সম্ভবতঃ সীতা আগেও ভাবেনি। এরকম সপ্রতিভ সোজা কথা সত্যই ধাক্কা খাবার মত।

বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল রঞ্জিত। অভিমান না প্রকৃতই আঘাত করবার ইচ্ছাপ্রণোদিত এ অভিযোগ সে ঠিক অনুমান করতে পারছে না। তার জন্য সত্যই কোন গ্লানি যদি ইতিমধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে সীতার অন্তরে—ভেবে সহানুভূতিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে রঞ্জিত। হাতখানা টেনে নিয়ে বলল অত্যন্ত মোলায়েম করে।

—যে প্রেম বন্ধনস্বীকারের পরিণতির মধ্যে সার্থকতা খোঁজে না—সে প্রেমকে আর যাই বলা যাক সৎ কিম্বা স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায় কি?

কিছুক্ষণ থেমে আরও ধীরে আরও স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললে রঞ্জিত—কি হয়েছে তোমার বল তো?

—কিছু হয়নি আমার—হাতখানা ছোট একটা ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিল সীতা। কিন্তু স্নেহের স্পর্শে কেমন একটা বাষ্প জমে উঠলো গলার মধ্যে। তা উঠুক। নিজের দুর্বলতার সন্ধান পেয়ে কড়া হাতে তৎক্ষণাৎ নিজেকে শাসন করার চেষ্টায় কণ্ঠে অধিকতর কর্কশতা এনে বলল—কেউ যদি না চায়—জোর করে বন্ধন স্বীকারের শিকল পরাবেন নাকি তাকে?—কিন্তু কথাটা শোনাল ঠিক একটা আর্ত শিশুর মত।

মাঝখান থেকে আগুনের উপর স্বল্পজলের ঝাপ্টা পড়ল। এবং আরও কিস্তুত-কিমাকার আরও আচ্ছন্ন করা ধূমরাশির হল সূত্রপাত। সাময়িক হলেও—অন্তরাল সৃষ্টি করার ক্ষমতাও যে তার আরও বেশী—সেকথাও দু'চারদিনের মধ্যে প্রতিপন্ন হয়ে উঠলো নিষ্করুণভাবে।

মণিমা অসময়ে জেগে উঠলেন। ফলে সেদিনকার মত ওদের অন্তরঙ্গ আলাপে ইস্তফা পড়লো।

কিন্তু দীপ নিভে যাবার আগে দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে ওঠে। বিবেক ত্যাগের ভূতটা ছেড়ে যাবার দিন যত আসন্ন হয়—বিবেক দংশনের জ্বালা তত অধৈর্য করে তোলে রঞ্জিতকে।

সীতার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা পর পর দুদিন নিষ্ফল হলো রঞ্জিতের। অথচ সেদিনের অসমাপ্ত গুঞ্জনকে সমাপ্ত করার তাগিদ অসাধারণ।

ডিউটিতে থাকার সমস্যা এত সবের পরও যে সাক্ষাৎকারের পক্ষে এতবড় অন্তরায় হতে পারে—এটা মনে হয় বিস্ময়কর। তৃতীয় দিন হোস্টেলের দর্শনার্থীর ঘর থেকে স্লিপ পাঠাতে সীতার বদলে মালতী এসে উপস্থিত।

বলল—নমস্কার রঞ্জিতবাবু। সীতার বদলে মালতীর আবির্ভাবে অবাক হবেন না! আপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ নেই। কিন্তু অন্তরীক্ষে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—সেই ভরসাতেই আসা। তাছাড়া আপনি বারংবার সীতার খোঁজে এসে ফিরে যাচ্ছেন—তারই রুমমেট হয়ে এ আর কতদিন দেখা যায় বলুন চুপ করে?

'অবাক হবেন না' হুঁশিয়ার করে দেওয়া সত্ত্বেও রঞ্জিত অবাক না হয়ে পারে না। মনে মনে শঙ্কাও অনুভব করে। কারণ এরকম আবির্ভাব একটু বিচিত্র। হেসে প্রত্যাভিবাদন জানায়। মুখে বলে—আমার কী পরিচয় আপনার জানা আছে বলুন তো।

—সে আলোচনা না হয় আর একদিন হবে। তবে একথা বলতে পারি—আপনি আপাততঃ সীতার রঞ্জিতদা হিসাবে সীতাকে খুঁজছেন।

সীতার রঞ্জিতদা উচ্চারণটা লক্ষ্য করার মত।

—তা খুঁজছি।—হাসল রঞ্জিত।—কারণ এ অবস্থায় তাছাড়া উপায় নেই।

একটু মৃদু রহস্যজনক হাসির বিদ্যুৎ হেনে পুনরায় বলল মালতী—এবং ভবিষ্যতে হয়ত দেখবো ময়নামতীর তত্ত্ব নিতেও আসছেন।

ছাৎ করে উঠল রঞ্জিতের বুক। গম্ভীর হয়ে গেল মুখখানা। বলল—

ময়নামতী বলতে ঠিক কাকে বোঝাতে চাইছেন এবং তার তত্ত্ব নিতে ভবিষ্যতে আমি আসবোই এ তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন জানি না—তবে আপাততঃ সীতার তথ্য যদি কিছু সরবরাহ করতে পারেন বাধিত হবো।

মালতীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত রঞ্জিতের অন্তস্থল পর্যন্ত প্রসারিত। রঞ্জিতের অপরাধী মনের পক্ষে তা অনুভব করতে কষ্ট হয় না।

কেবল সঙ্কল্পমাত্র নয়—চাকরিতে ইস্তফা না দিতে পারা পর্যন্ত, সীতা ও তার আত্মার স্পন্দনকে এক লয়ে না বাজিয়ে তুলতে পারা পর্যন্ত, উভয়ের নিকট উভয়ের আত্মনিবেদন পরিপূর্ণ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত রঞ্জিতের মনের এই অপরাধী ভাব ঘুচবে না সে তা আজ অত্যন্ত করুণভাবে বুঝতে পারছে। অথচ অপরাধ তো সে করেনি!

তা হোক—কিন্তু তবুও প্রথমালাপে এরকম অনধিকার চর্চা চূড়ান্ত অসৌজন্য-মূলক।—তাই উত্তরটা একটু কড়া হল।

মালতীকে তজ্জন্য বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হতে দেখা গেল না।

বলল—বেশ আপনার অনুরোধে ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতেই তোলা রইল্। আপাততঃ সীতার সাক্ষাৎ পেতে হলে সটান লেবার ওয়ার্ডে চলে যান।

বলে বিদায় গ্রহণ করে কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এলো মালতী।

—আচ্ছা রঞ্জিতবাবু, মালতী ময়নামতী এদের কোন পরিচয়ই বুঝি দেয়নি মেয়েটা আপনার কাছে?

রঞ্জিত হেসে বলল—আপনার কি মনে হয়?

—আমার মনে হয় দেয়নি। দিলে আমাকে চিনতে আপনার কষ্ট হবার কথা নয়। কি বিশ্বাসঘাতক মেয়ে বলুন তো? আমাদের কাছে আপনার কথায় যে মেয়ে একেবারে পঞ্চমুখ, আপনার কাছে আমাদের কথায় সে একেবারে বোবা!

এ সকল অপ্রাসঙ্গিক আলাপে রঞ্জিতের আর উৎসাহ নেই। কথা বাড়ানোর অবকাশ না দিয়ে হঠাৎ সে বিদায় গ্রহণ করলো নাটকীয়ভাবে। তারপর লেবার ওয়ার্ড মুখো সটান চালালো তার পা।

পেছন থেকে তার গমন পথে তাকিয়ে থেকে মালতী খুব হেসে নিল আপন মনে। কারণ তার চেয়ে বেশী কেউ জানে না—সীতা মারফৎ রঞ্জিতের সঙ্গে অন্তরীক্ষে গভীর পরিচয় লাভের কাহিনী আর যাই হোক সত্যভাষণ নয়। এমনিতে মালতী গম্ভীর প্রকৃতির। তাছাড়া বয়স হয়েছে কিছুটা। আসলে

ইচ্ছা করলে সব মেয়েই যে অভিনয় করতে পারে নিখুঁত ভাবে—মালতী এ সম্পর্কে আজ নিঃসন্দেহ।

সীতার ইদানীন্তন মনোভাব রহস্তজনক হয়ে ওঠা, আর ময়নামতী-রঞ্জিতের বিবাহ প্রস্তাবের মধ্যে যে একটা নিবিড় যোগাযোগ বর্তমান—সেটা আর এখন তার সন্দেহ মাত্র নয়।

এ ধরনের মেরুদণ্ডহীন ঘটনায় যে সব সুযোগসন্ধানী ছেলেরা জড়িত থাকে (ভগবান করুন তার সন্দেহ মিথ্যা হয়) তাদের নীতিহীন অপরাধী আত্মার প্রতিক্রিয়ার বিষে নীল মুখমণ্ডল মালতীর চোখে ধরা পড়তে বাধ্য। এ আত্মবিশ্বাস সে রাখে। তাছাড়া মালতী সীতা বা ময়নার মত অভিজ্ঞতাহীনা তরুণী মাত্র নয়, সে নারী। সে জানে মার্জারের পদশব্দের বিন্দুমাত্র আভাসে পলায়মান মূষিকের সংকেত—এঁদের চোখের সন্ত্রস্ত তারায়।

কিছু পড়তে পারল কি মালতী—রঞ্জিতের চোখের তারায়? ভগবান জানেন। কিন্তু রুমে যখন ফিরল একটা চাপা উদ্বেগে গম্ভীর হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল। সীতার সঙ্গে বলদবাবুর মাখামাখি সে কোনদিনই দেখতে পারে না। গত কয়েকদিনে সেটা অদ্ভুত ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে সীতা। সত্যিই তো, যাই কেন হোক, সীতা ভেবেছে কী! বাড়ীর বাইরে আছে বলে তাকে আগলানোর কি কেউ নেই নাকি? ময়নার বিবর্ণ মুখখানাও এরই পাশে এসে ভিড় করে তার ভাবনায়।

এই দুটি সহজমতি বালিকার জন্য কেমন একটা নিরুপায় সহানুভূতি মালতীকে সেদিন বহুক্ষণ ধরে পেষণ করতে থাকে। ওরা দুজনই তখন ডিউটিতে।

খুঁজে খুঁজে বার করে লেবার ওয়ার্ডের মধ্যে রঞ্জিত নিঃসংকোচে যখন ঢুকে গেল সীতার সন্ধানে তখন সন্ধ্যা ছটা অতিক্রান্ত। বাইরে কিছুটা দিনের আলো থাকলেও ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। কাউকেই কিছু জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন থাকতে পারে বলে মনে হয় নি রঞ্জিতের।

লম্বা হল ঘর। দুপাশে সারি সারি মায়েরা। প্রত্যেক শয্যার পাশে পাশে এক একটা ছোট্ট খাঁচার মত। তার মধ্যে পৃথিবীতে নতুন আসা অতিথির দল। ভিজিটিং আওয়াস ছাড়া প্রসূতিদের এ ওয়ার্ডে বিনাঅনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ, দেয়ালে নোটিস।

একজন পুরুষ মহিলা ওয়ার্ডে বিনাঅনুমতিতে প্রবেশ করছে অসময়ে দেখে

একজন সিস্টার জিজ্ঞাসা করলেন—কাকে চান আপনি?—মুখে বিরক্তির চিহ্ন তাঁর।

—সীতা সান্যাল—ভ্রূক্ষেপ নেই সে সব দিকে রঞ্জিতের।

হল সুদ্ধ প্রায় সকলের বিরক্তদৃষ্টি এতক্ষণে রঞ্জিতের উপর উন্মুখ। মাঝখানে একটা টেবিল চেয়ার নিয়ে একজন কালো, মোটা, বেঁটে ভদ্রমহিলা, সম্ভবতঃ মেট্রনই—উঠে দাঁড়িয়ে হাইপাওয়ার চশমার ফাঁক দিয়ে শ্যেনদৃষ্টি কুৎ কুৎ করতে লাগলেন। আক্রমণের আভাস। চতুষ্পদেরা যেমন শিকারের উপর আক্রমণের পূর্বে লাঙুল আন্দোলন করে, সিস্টাররা বলেন ইনিও তেমনি বে-আইনী কোন কার্যকলাপকে আক্রমণের পূর্বাহ্ণে অমনি চোখ কুৎ কুৎ করেন।

সীতাও কিছুদূরে একজন নতুন অতিথির আতিথেয়তায় নিবিষ্ট ছিল। নিজের নাম শুনে পিছন ফিরে তাকালো সে। তাজ্জব। রঞ্জিতদা। অপ্রত্যাশিত। আরও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির আভাসে শঙ্কিত হলো মেট্রনের চোখের দিকে তাকিয়ে।

এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ কি আর দুনিয়ায় আছে নাকি! তাছাড়া এই ধড়াচূড়া পরা অবস্থায় বাড়ার লোকের সম্মুখীন হতে—বরাবর একটা অর্থহীন লজ্জা এসে চেপে ধরে তাকে।

হঠাৎ মেট্রন ডাকলেন—বাহাদুর।

সিস্টারেরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে থাকেন। লোকটার মুখে সীতা সান্যালের নাম উচ্চারিত হওয়ায় তারা সকলেই একটু ইতস্ততঃ করছে।

রঞ্জিতের ভ্রূক্ষেপ নেই তবুও। সে ধড়াচূড়া পরিহিত সীতার দিকে তাকিয়ে থাকে মুগ্ধ দৃষ্টিপাতে। এই পোশাকে সে দেখে নি কোন দিন সীতাকে। বাস্তবিক অদ্ভুত মানায় সীতাকে এই পোশাকে। দেহের রংএ আর সাজে হঠাৎ যেন একটা দুর্লভ যোগাযোগ ঘটেছে। অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে এসে দেখা দেয় কার লেখা কোন একটা কবিতার লাইন—শ্বেতবরণা শ্বেতভূষিতা সুন্দরী।

সম্বোধন করতে ভুল হয়ে গেল রঞ্জিতের। তাকিয়েই আছে একনাগাড়ে অন্যের দৃষ্টিতে নির্লজ্জের মত। যেন আটকে গেছে চোখ দুটো।

সীতা সন্ত্রস্তভাবে ছুটে আসে ওর সামনে—কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে ডান হাতে দরজা দেখিয়ে—এখানে নয়, যান বাইরে গিয়ে দাঁড়ান।

রঞ্জিত এতক্ষণে বেকুব বনে যায়। অগত্যা মাথা চুলকোতে চুলকোতে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

হাত ধুয়ে বাইরে আসে সীতা। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ; নিশপিশ করতে থাকে তার মধ্যে তার আঙুলগুলো। বলে—আপনি, আপনি কী! কী যে প্রচণ্ড উষ্মা 'কী' কথাটার মধ্যে প্রকাশ করতে চায় সে তা সীতার মত পরিস্থিতিতে যারা পড়েছে তারাই মাত্র জানে। তবু বাইরের মেয়েদের অপমানের হাত থেকে রঞ্জিতকে সে রক্ষা করতে পেরেছে এইটুকু সান্ত্বনা তার।

—ঠিক এই পোশাকে তো কোনদিন দেখিনি তোমাকে। তাই কেমন আটকে গেলাম। অদ্ভুত রকমের সুন্দর দেখায় তোমাকে এই পোশাকে।—এত কাণ্ডের পর আসামীর মুখে পরিস্থিতি সম্পর্কে এরূপ নিরাসক্ত উক্তিতে জ্বালা ধরে সীতার।

বলে—হাঁ সম্মান যদি বাড়াতে চান এইখানে দাঁড়িয়ে যদি পারেন তো আরও সিন্ তৈরি করুন।

জ্বালাটা আপাদমস্তক ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে কি কদাপি সে আন্দাজ করতে পেরেছে কোন একটা গুরুতর বিষয়ে পর্যন্ত নির্ভরের অযোগ্য এ মানুষ।

রঞ্জিত মৃদু মৃদু হাসে। সীতার মনে হয়, হয় শয়তান না হয় উজবুকের হাসি।

বলে—দোহাই আপনার রঞ্জিতদা, এখানে এভাবে,—চট্ করে থেমে যায় মধ্য পথে। হঠাৎ মনে হয় রাগের বশে অত্যন্ত কুৎসিত ভাষাও হয়ত সে ব্যবহার করে ফেলতে পারে। সুতরাং থেমে কয়েক মুহূর্ত রাগ সামলাতে হয়। রঞ্জিত কি একটা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল। আর রাগ মানাতে গিয়ে ক্রোধটা কণ্ঠে হঠাৎ এমন একটা আর্তনাদাত্মক ধ্বনি উৎসারিত করে—যা সীতার নিজের কাছেও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। রঞ্জিতের প্রশ্ন স্থগিত রাখতে হয়।

—দয়া করে চলে যান এখন রঞ্জিতদা।—দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে বলে ফেলেই চোখের নিমেষে প্রায় দৌড়ে বারান্দা থেকে ঢুকে পড়ল হলঘরের মধ্যে সীতা।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে খানিকক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে—ধীরে ধীরে চলে গেল রঞ্জিত।

॥ পনেরো ॥

চোখ কান বুজে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ পত্রখানা বুড়োর টেবিলে ফাইলচাপা রেখে বেরিয়ে পড়ল রঞ্জিত ওয়ার্কশপে। আর সেই থেকে ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বুড়োকে এড়ানোর জন্য। আর দুটোদিন—ব্যস্। তারপর সে আর কেউ নয় এখানকার।

যেখানে যাচ্ছে বড় বেশী আপনার মনে হচ্ছে সব কিছু। ভাবতে কষ্ট লাগছে—তাকে বাদ দিয়েও চলবে কারখানা।

টিফিনের সময় ক্যানেস্তারার বাক্সের উপর বসে ছিল শংকর। সব চাইতে বেশী বিশ্রী লাগছে শংকরের জন্য। শংকরের সামনে উদয় হলো রঞ্জিত।

—তোমার মালকাটার কিছু সুরাহা হলো শংকর ?

—মালবাবু।—উঠে দাঁড়ালো সে।—না মানে, হলো আর কৈ।—আবার কি ভাবতে লাগল শংকর।

সেদিনের পর থেকে শংকর যেন আর কারখানায় থেকেও কারখানায় থাকে না। মন পড়ে থাকে অন্য জগতে। এই তো এরই মধ্যে একদিন বুদ্ধু ওস্তাদ স্টোর থেকে একটা ডাইস আনতে বলায় ও চা আনার মগ নিয়ে অগ্রসর হতে বুদ্ধু তো মহাখাপ্পা। বলল—তোমার হয়েছে কী ছুকরাবাবু, কান কি বেংকে জমা রেকে এসেছো নাকি।

শংকর তো দস্তুর মত লজ্জায় পড়ে গেল। রাজমন্ত্রীর কারখানা পরিদর্শনকে উপলক্ষ্য করেও তো কত কি কাণ্ড চলছে কারখানার অন্দরমহলে। কিছুই তার মাথায় ঢোকে না। মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে সব ফস্কা ঢেউ-এর মত।

—শুধু ভেবে ভেবেই কি মালকাটার সুরাহা করবে নাকি ?—রঞ্জিত ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

—না মানে ঠিক তা নয়—মাথা নীচু করে নখ খুঁটতে লাগল শংকর।

শংকরের জন্য রঞ্জিত অত্যন্ত মর্মপীড়া অনুভব করলো। কে জানে রঞ্জিত চলে যাবার পর বেচারার মালকাটার অবস্থা কী দাঁড়াবে! ও বলল—তা তোমার ভয় তো বুদ্ধু ওস্তাদকে ?

কিছু উত্তর দিল না একথার শংকর।—তা আমি তো আছি। এই দুটো দিনের মধ্যে শেষ চেষ্টাটা করে ফেল।

—কেন চলে যাবেন নাকি কোথাও আপনি দু'দিন পর ?

—ধর যদি চলেই যাই—তখন তো তোমার মনে পাকা হয়ে থাকবে এই কথাটাই, যে আমি ছিলাম তোমার মালকাটাকে পয়মাল করা এক মালবাবু। সে কলঙ্কের অঙ্কটা আমি মুছে রেখে যেতে চাই।

অফিস থেকে বেয়ারা এসে উপস্থিত। বলল—এই যে রঞ্জিতবাবু আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান সেই কখন থেকে।

—এত লোক থাকতে আমাকে খোঁজাখুজির দরকারটা কী ?

—বড়বাবু—

—কেন আমি না হলে কি কারখানা অচল হয়ে যাচ্ছে বলে ধারণা বড়বাবুর ?

—তা জানি না—

—বেশ, যাচ্ছি।—আর এড়ানো গেল না বুড়োকে। অবশ্য একেবারে এড়াতে সে চায়ও নি। প্রস্তুত করে নিল মনকে।

—আপনি সত্যিই চলে যাচ্ছেন নাকি মালবাবু ? আপনি কিন্তু মানে বড় ভাল লোক ছিলেন।

উচ্চস্বরে হেসে উঠলো রঞ্জিত—ছিলাম নাকি ?—চলে যাবার আগে বলল—তাহলে তোমার হাত টেস্ট করার কাজটা সেরে ফেল।

শংকর অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল একদৃষ্টিতে রঞ্জিতের চলে যাবার পদক্ষেপের দিকে।

প্রত্যেকটা দিন আসে আর চলে যায়। পরের দিনের আশার মরীচিকা সৃষ্টি করে পালিয়ে যায়। হা ভগবান ! বুদ্ধু ওস্তাদ কি কিছুতেই মেসিন ছেড়ে কোথাও নড়বে না ? আর কি ফুরসৎ আসবে না কিছুতেই ?

কাজের চাপে বুদ্ধ ওস্তাদকেও খাটতে হচ্ছে মুখে রক্ত তুলে। থুথু ফেলতে যাবার সময় নেই তার। মেইন সাহেব শেষ পর্যন্ত, ক'দিনের জন্য হলেও টাইট দিয়েই খাটিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন সবাইকে।

রাজমন্ত্রী আসার আগের দিন সকাল বেলা কারখানায় এসেই বুদ্ধু ওস্তাদ জাঁকিয়ে বসে বলল—চুটিয়ে একটা এস্টার্ট মার দিকিন্ আজ ছুকরা বাবু। চামড়ার চোখে একবার দেকি। —বলে মৌজসে একটা বিড়ি ধরালো সে।

ছুকরা বাবু তো অবাক। বুদ্ধু ওস্তাদ বাঘও নয় ভালুকও নয় তবু সে ভরসা পায় না। আর সেই বুদ্ধু ওস্তাদই কিনা খোশ মেজাজে তাকে মেসিনে এস্টার্ট মারতে আহ্বান করছে। মনটা মুহূর্তে হাল্কা হয়ে উঠতে চায় শংকরের। তাহলে

পারবে, সে বোধ হয় পারবে আবার নিজের হাতকে পরখ করবার শেষ চেষ্টা করতে।

বুদ্ধুর মেজাজ প্রসন্ন হবার অবশ্য কারণ আছে। বড় সাহেব ডেনকিন উইনিয়নের একদল প্রতিনিধির সঙ্গে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই দেখা করেছিলেন গতকাল বিকেলবেলা।

রাজমন্ত্রীর পরিদর্শনের দিনটি নিরুদ্বেগে নাও কাটতে পারে—এই মর্মে খবর পেয়েছিলেন ডেনকিন্। যে-কোন ভাবেই যে-কোন ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনাকে সেদিন নিয়ন্ত্রিত করতেই হবে তাঁকে। সেদিনটাকে হতেই হবে একটা পরিচ্ছন্ন দিন। সেদিনের কারখানার আকাশে এক টুকরো ছেঁড়া মেঘও জমতে দেওয়ার সম্ভাবনাকে সাফ করে রাখা দরকার।

ইউনিয়নকে এককালে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। আইনগতভাবে যাই হোক—কার্যক্ষেত্রে বর্তমানে ইউনিয়নকে আমল না দেওয়ার নীতিতে দৃঢ় থাকার কথা।

তবু সেই ইউনিয়নকেই এবার ডাকবেন স্থির করলেন। কারণ হাতে সময় অল্প এবং অন্যদিকে নজর দেবার বহু বিষয় আছে। ওদের দিয়েই ওদের নিয়ন্ত্রণ—এখন সহজ উপায়।

মোহনের ওপর অগাধ আস্থা। অতএব নিজের মতামত যাচাই করে নিতে চান মোহনকে দিয়ে। মোহনকে ডেকে পাঠালেন।

জগমোহন কস্মিনকালেও পূর্বাহ্ণে বড় সাহেবের সমক্ষে নিজ মতামত প্রকাশ করেন না। অত্যন্ত সুকৌশলে সাহেবের মতামত আগে জেনে নেন। তারপর সাহেবের মনোমতভাবে নিজের অভিমত এমন সুনিপুণতার সঙ্গে প্রকাশ করেন যে ওই অভিমতকে মোহনের অভিমত বলে বিশ্বাস করতে সাহেবের বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না।

এবারও ব্যতিক্রম ঘটলো না। সাহেবের মনে মনে ছকে রাখা কার্যক্রমই সুকৌশলে বুঝে নিয়ে—নিজের অভিমতের সীলমোহর মেরে দিলেন তাতে। ফলে সাহেবের আত্মবিশ্বাস বাড়লো ছকে রাখা কার্যক্রমের ওপর। মোহন বললেন বাংলায় ইংরেজীতে মিশিয়ে। ওইভাবেই সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। মোহনের ইংরেজী অপেক্ষা এই ভাষাই সাহেবের বুঝতে সুবিধা।

—সংস্কৃতে আছে স্যার, কার্যসিদ্ধির জন্য যেন তেন প্রকারেণ। একহাত রাখবা গলায় আর একহাত রাখবা পায়ে। যেডা যখন কাজে লাগবো। আদারওয়াইজ স্যার, ম্যানেজিং বোর্ড ভাববো—উই আর ইনএফিশিয়ান্ট—মোস্ট ইনএফিশিয়ান্ট।

ডেনকিন মোহনের বুদ্ধির তারিফ করলেন। তারপর জানালেন যে এযাত্রা ইউনিয়নের লোকজনের সঙ্গেই কথাবার্তা বলবেন তিনি।

মোহন বললেন—কুচ পরোয়া নেই, স্যার।

সাহেবের আমন্ত্রণ এসে পৌঁছুলো ইউনিয়নে যথাসময়ে। মোহিনী সিং উৎসাহিত হয়ে বলল—আখের মে উনিয়নকা পাশ আনা পড়েগা—এ তো জানা হুয়া বাৎ—সাথী।

ভাইসের বড় মিস্ত্রী নন্তর মত মানুষও হঠাৎ আশ্বস্ত হয়ে বলে বসলো—জানা কতা। বিলকুল জানা কতা। মরব কবে শুধু তাই জানিনি।

হর ডিপাট থেকে প্রায় জন কুড়িকের এক প্রতিনিধিদল প্রস্তুত হল। তার মধ্যে রইল ঠাণ্ডা, মোহিনী; নন্তও বাদ গেল না। কিন্তু বুদ্ধুকে অন্তর্ভুক্ত করার বেলা উঠল শোরগোল।

শোরগোল প্রথম তুলল নন্ত। বলল—এটা একটা দায়িত্বজ্ঞানের জিনিস। আর তুই হচ্ছিস চড়মাতাল মানুষ। কি থেকে কোন্ নাইনের কতা বলে বসবি মাঝে থেকে—কিছু তার ঠিক আছে নাকি।

বুদ্ধু গরম হবে উঠল। সামনের দুটো দাঁতের ধাতু উঠলো চিক চিক করে খিচিয়ে কথা বলতে গিয়ে।

—হর কতায় তুমি নাইন দিখাবে না—ইঁ-অ-অ।

নন্ত নরম কেটে গেল। কিন্তু অন্য যারা বুদ্ধুকে চেনে তারা ওজর আপত্তি তুলতে লাগল। বুদ্ধুকে শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিরস্ত করা গেল না। সাব্যস্ত হল সে মুখ বুজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিনিধি দলের শোভা বর্ধন করবে শুধু। কোন রকম বাৎচিতের মধ্যে যাবে না।

তারপরই কথা উঠল—দলের মাথা হিসাবে কথা বলবে কে। নাম উঠল ঠাণ্ডারামের আর মোহিনীর। নন্ত কিন্তু বলল অন্যরকম। বলল—হাঁ ওরাও হচ্ছে তোমার মরদের বাচ্চা। বুদ্ধুর মত কিছু মাতার দোষ নেই ওদের। তবে কতা কী জান—তোমার ওই যতীন বাবুই চলুক মাতা হয়ে।

পাঁচু হাজির ছিল যদিও সে প্রতিনিধি দলে নেই। প্রয়োগ করল তির্যক বাক্য-বাণ—যতীন বাবু একটা বাইরের নোক। কাজই করে না কারখানায়। মাতাই নেই তার। কাজে কাজেই মাতা কর তাকে যার মাতা জিনিসটাই নেই।

বিরক্ত হল নন্ত একথায়। বলল—বেশ বলিছিস বাপু। তবে খামৃখা একটা

অন্য নাইনে নিচ্ছিস কতাটাকে। একটা বাইরে নোক, আর একটা ভিতরের নোক —জানবি—রাত আর দিন তফাৎ। বাইরে নোকের ঝেড়ে কেশে কতা বলার কত সুবিধা। ভিতরের নোক—যতই হোক চাকরি করে মালিকের। কাজেই তার নাকের উপর কতা বলতে দাঁড়িয়ে—তার বহু ন্যায্য কতা গলায় আসবে তো মুখে আসবে না। এই লাখ কতার এককথা বলে দিলাম। ঠাণ্ডারাম, মোহিনী সিং এরা সব আছে বলুক।

যতীন মিস্তির গোঁফ পাকাচ্ছিল আর বিব্রত হাসি হাসছিল। ট্রেডের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন করার একটা আর্তি উঠছিল তার মনে এই প্রসঙ্গে। কিন্তু তাই বলে ওটাকেই একমাত্র সত্য বলে আমল দিলে—ট্রেডকে রপ্ত হয়ত করা যায়—কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নকে রপ্ত করা যাবে এমন গ্যারান্টি নেই।

অবশেষে যতীন মিস্তিরই মাথা হলো। বুদ্ধু সম্পূর্ণ রিজার্ভ রাখল তার মতামত। সম্ভবতঃ তখন থেকে চুপ থাকার মহড়া দেওয়া শুরু করলো সে।

যথাসময়ে ডেনকিনের টেবিলের সামনে উপস্থিত হলেন প্রতিনিধিরা। সাহেব চোখ না তুলেই বসতে বললেন ইঙ্গিতে। অতিথি অভ্যাগতদের বসবার জন্য খান দুয়েক চেয়ার সাহেবের টেবিলের এক পাশে রাখা। প্রতিনিধিরা সংখ্যায় প্রায় কুড়িজন।

প্রতিনিধিরা অনেকে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগলেন নিজেদের মধ্যে ব্যাপার দেখে।

যতীন মিস্তির ফোঁস করে উঠলেন—মিঃ ডেনকিন। আমরা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছি আপনার কাছে।

প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে দেশী ভাষায় কথা না বললে সকলের বোধগম্য হয় না। তাই বাংলায় কথা বললেন যতীন। সাহেব অনেক দিন আছেন এদেশে। বাংলা হিন্দী উভয়ই বোঝেন। তিনি কখনও হিন্দীতে কখনও ইংরেজীতে সওয়াল করলেন।

সাহেব আর একবার চোখ তুললেন। পুরানো ভাব অব্যাহত রেখে মুখ খুললেন মাত্র।—ওঃ, দেন টেক ইয়োর সিট প্লিজ।—আবার চোখ নিবদ্ধ হলো টেবিলে।

কুড়িজনের ভিড়টা চোখে এড়াবার কথা নয়। উপর থেকে ব্যাপারটা নির্দোষ মনে হলেও যতীন এধরনের কায়দার সঙ্গে পরিচিত। সমান আসন থেকে যাতে প্রতিনিধিরা মালিকের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ না পায়—তার জন্য মালিকেরা



হামেশাই এ ধরনের আক্রমণ দিয়েই শুরু করেন প্রথম,—বলে, যতীনের বিশ্বাস। কাজেই প্রথম থেকেই এই আক্রমণকে বিন্দুমাত্র ছোট করে দেখলে—যে সকল শ্রমিক উপস্থিত—তাদের মনের প্রতিক্রিয়ায় সে ছাপ পড়ে।

যতীন আরও দৃঢ় অথচ এটিকেট-দুরস্ত ভাবে বলল আবার—আমরা অপমান হিসাবে গ্রহণ করতে পারি মিঃ ডেনকিন।

তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়লেন সাহেব। তারপর যথাবিহিত বিনয়ের ব্যভিচারের সঙ্গে বললেন সকলের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে—আই অ্যাম একস্‌ট্রিমলি সরি—আপলোক বাইঠিয়ে।—তার আগে পাইপটা হাতে নামিয়ে নিলেন মুখ থেকে।

—কুরশী অপনার দুখানা, ডেলিগেশনে কুড়িজন মানুষ। ইট ইজ ননসেন্স।

সাহেব তাঁর হলুদ বর্ণ দাঁত বার করে একগাল হাসলেন—কেয়া বড় মিস্ত্রী—তোমারা ভি কুরশী লাগে গা বাইঠ্‌নে।—সম্বোধন করলেন নন্তকে, আসলে উদ্দেশ্য করলেন সকলকে।

নন্ত ঘাড় হেঁট করল। অন্যান্য আরও দুচার জনও উসখুস করতে লাগল।

সাহেব বললেন যতীনকে—ইন লোক সব হামারা ঘরকা আদমী, আপনা আদমী। ইনলোগোকা মন হামলোক ভি থোড়া জানতা হ্যায়। আধা ঘণ্টাকে মামলাকে লিয়ে—ইনলোগোকা কুচ গোঁসা নেই হোগা।

তারপর দৃষ্টি ঘোরালেন অন্যান্যদের পানে—দেখতা হ্যায় তো কুরশী নেহি হ্যায়। কেয়া বড় মিস্ত্রী গোঁসা হোগা তুম লোগ্‌কা।

যতীন শান্ত অথচ অনমনীয় কণ্ঠে জানাল—এখানে আপন আর পর আদমী কিছু নেই। অন্ততঃ এই মুহূর্তে আমরা প্রত্যেক ভাই ডেলিগেশানের সভ্য। সমস্ত শ্রমিকদের নোমায়ন্দার। এবং আপনার নিমন্ত্রিত। কাউকে বাদ দিয়ে কারও পক্ষে কুরশীতে বসা সম্ভব নয়। তার চেয়ে আপনি চান—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোচনা হোক—উই আর এগ্রিড।

সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাকালেন সকলের দিকে। কপালের ভ্রূযুগল ক্ষণেকের জন্য কুঁচকে উঠল। তারপর হাঁকলেন—জগদেও—

—হুজুর—জগদেও ভিতরে ঢুকল হাফ দরজা ঠেলে।

—বিশ কুরশী—

জগদেও বেরিয়ে গেল। এইমাত্র যিনি কুরশী নেই বলে ঘোষণা করলেন—তিনিই তার পরমুহূর্তে বিশ কুরশীর হুকুম দিতে কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব

করলেন না। অথবা লজ্জাকে আড়াল দিলেন গাম্ভীর্যের অন্তরাল টেনে বোঝা মুস্কিল।

অল্পসময়ের মধ্যে কুরশী এলো। তারপর শুরু হল আলাপ আলোচনা। শ্রমিকদের ইজ্জৎ সম্পর্কে নাছোড় লোক যতীন মিস্তির।

বড় সাহেবের সঙ্গে দরকষাকষি করে যা সাব্যস্ত হল সেটাতে—আর কারও হোক বা না হোক—বুদ্ধুর একদম মন উঠল না।

মন ওঠার কথাও নয়। একটা জলুস হবে না। একটা হৈ হল্লার ব্যবস্থাও প্রায় বাতিল। তিনচার জন মিলে রাজার কাছে নালিশের একটা চিঠি পেশ করে এস ভিজা বিড়ালটির মত পায়ের শব্দ চেপে। তারপর রাজার ঝামেলা মিটে যাবার পর বড় সাহেব—তাদের ট্রাইবুনালের রায় মানা না মানা অথবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করত সম্মত থাকবেন।

বড় সাহেবের ঘরে নিঃশব্দে অনাসিষ্টি দেখে দেখে পেট ফুলে উঠে তার। বাইরে বেরিয়েই প্রথম কথা বলে বুদ্ধু যেন বাঁচল। প্রথমটা গজগজ করেই কথা বলতে লাগল—এ একটা কারওয়াই হল। সেই দশমাস দশদিনের পো-আতী মাগের ছেলিয়া হবার কহানী আছে—এতো সেই ব্যাপার। ছেলিয়ার বদলে ব্যাং পয়দা।—শুনে আফজল তার পানের ছোপে রাঙ্গানো ঠোঁট উল্টে ধরলো, বলল—উস্তাদের ভুজি হেয়াতেও প্যাড্ ভরল না।

বড় মিস্ত্রী আপত্তি তুলল—ওর কথা ছেড়ে দে দিকিন্। ইউনিয়নের সঙ্গে ফের থেকে কম্পানী কতা চালাচালি করতে রাজী—এটাই তো একটা কতা রে বাপু।

এতসব অনাসিষ্টিজনিত ক্ষোভ সত্ত্বেও সেদিনের অভিজ্ঞতা সত্যাই রোমাঞ্চকর। এধরনের প্রতিনিধি হয়ে আসার অভিজ্ঞতা তার নতুন। বড় সাহেবের ঘরে গিয়ে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকতেই অভ্যস্ত। কুরশী মেরে বসার ইজ্জৎও এই প্রথম।

কারওয়াই-এর দিক থেকে গা গরম করা কিছু না থাকলেও—বুদ্ধু ওস্তাদের ভিতর মহলে সেটাকে ছাপিয়ে উঠছিল প্রসন্নতার রং। ওদিককার ঘাটতি পুষিয়ে যাচ্ছিল যখনই ভাবছিল এদিককার বাড়তির কথা।

শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার কথা নিয়েই হুজ্জুত চলে—ইজ্জৎ নিয়ে হুজ্জুত করে ক'জন।

কড়া লোক যতীন মিস্তির। শেষ পর্যন্ত ডেনকিন সাহেবকে দিয়ে তার অধীনস্থ শ্রমিকদের ইজ্জৎ দিইয়ে ছাড়লো।

কড়ামাঞ্জার কারওয়াই-এর অভাবের নিশপিশানির বুকে হাঁটু মেরে শেষ পর্যন্ত শিরদাঁড়া তুলে দাঁড়ালো মনের মধ্যে—ইজ্জৎ পাওয়ার এক অনাস্বাদিত মহিমাময় অনুভূতি।

এতসব সত্ত্বেও বুদ্ধু তাই বেশ প্রসন্নতার মৌজ নিয়েই এসেছিল সেদিন কারখানায়। আর সেই মৌজের ঝোঁকে খোশ মেজাজে ছুকরা বাবুকে বললো চুটিয়ে এস্টাট মারতে।

পাঁচু শুনে শিস মেরে উঠলো পাশের মেসিন থেকে। তারপর শুদ্ধ করে বাংলা বলতে শুরু করলো আসলে বুদ্ধুকে বিঁধবার জন্যই।

—ছুকরা বাবু আজ কার মুখ দর্শন করে উঠেছিলে গা। নইলে কপাল এমন পেরসন্ন হতে পারে কখনও। হাজার হোক—কপাল বস্তু, যেমন তেমন বস্তু নন : ভাগ্য হচ্ছেন গেরোর হাতে। যখন খুলবেন—তখন কাছা খুলতে বিলম্ব হতে পারেন কিন্তু কপাল খুলে যাবেন এলেকট্রিকের দরজার মত।

কথা শুনে পিত্ত জলে যায়। মেজাজে যেন খটাং করে খিল পড়ে যায়।

পাঁচুর ছাল-কাড়া কথার ঝাঁজে ঠিক থাকার জো আছে। তিড়িং করে দাঁড়িয়ে পড়লো ওস্তাদ। অন্যদিন হলে উস্তুং পুস্তুং করে ঝগড়া করত। আজ তা করল না। সোজা চলে গেল মেসিনের ধারে।

ছুকরা বাবুর অনেক দিনের থমথমে মনের আকাশে মেঘটা সবে কাটো কাটো ভাব। এস্টাট মারার উদ্যোগ করছে খুব একটা খুশী আর হাল্কা মেজাজে।

পেছন থেকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিল ওস্তাদ। আচমকা চমক লেগে গেল শংকরের। থমমত খেয়ে কোন্‌দিকে সরে দাঁড়াবে ঠিক করতে পারলো না সহজে। বলল ওস্তাদ—থাক আর এস্টাট মেরে কাজ নেই।—দাঁতের মধ্যস্থ ধাতুর চিক্‌চিকানিতে শংকরকে ধাঁধিয়ে দিয়ে জবরদস্ত ভাবে মেসিন আঁকড়ে ধরলো বুদ্ধু।

ফিকে হয়ে আসা মেঘেরপুঞ্জ মুহূর্তের মধ্যে ঘন হয়ে উঠল শংকরের মুখাবয়বে। পাংশু মুখে সরে দাঁড়ালো ছুকরা বাবু।

॥ ষোল ॥

বুড়োর সম্মুখীন হওয়ার মুহূর্ত যখন আসন্ন তখন সগৌরবে সম্মুখীন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেইভাবে প্রস্তুত করল নিজেকে রঞ্জিত।

বাবাজীকে ডেকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে জগমোহনবাবু সরাসরি কথাটা উত্থাপন করে উঠতে পারেন না কিছুতেই। বোঝা গেল জগমোহনবাবুরও পরিস্থিতি-বিশেষে চক্ষুলজ্জা বলে বস্তু আছে। মনে মনে অনেক মুসাবিদা করে অবশেষে আরম্ভ করলেন—তোমাগো আজকালকার পোলাপান লইয়া হইছে মহা গণ্ডগোল। মাথা মুণ্ডু কি লিখছ এ সব?

—কাজে ইস্তফা দেওয়ার নোটিস—শূয়োরের মত ঘাড় বাঁকিয়ে জবাব দিল রঞ্জিত।—অবশ্য নোটিস দিয়ে চাকরি ছাড়তে হবে এমন কোন শর্তে এখানে আসি নি। তবু দিলাম। কারণ যাবার সময়ও কোন ত্রুটি রেখে যেতে চাই না।

বাবাজীর ব্যবহারটা বড় দুর্বিনীতই লাগছে বড়বাবুর। ব্যাপার কী! বিস্মিত হলেন। কিন্তু ব্যস্। ধরে ফেলেছেন। বাবাজী উন্নতি চান চাকরিতে। এটা তারই প্যাঁচ।

বললেন—তা এত ব্যাস্ত হইলেই কি সব সময় চলে বাবাজী!

—দেখুন এর মধ্যে ব্যাস্ত-ট্যাস্ত কিছু নেই। এখানকার চাকরি করতে আমার আর ভাল লাগছে না—সোজা কথা।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো রঞ্জিত। অপমান করতে পারলেই যেন গায়ের জ্বালা মিটত তার খানিকটা।

বাস্‌রে—এ কী গোঁয়ার গোবিন্দ অগ্নিশর্মা মূর্তি বাবাজীর—মনে মনে চিন্তা করলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মুখে বললেন—আরে বস, বস মাথা ঠাণ্ডা কইরা। রাগ হইল চণ্ডাল। হারে লাই দিতে নাই।

নারাজভাবে দাঁড়িয়ে রইলো রঞ্জিত।

—আচ্ছা সে কথা যাউক গিয়া—ধীরে ধীরে খুব সাবধানে শুরু করলেন জগমোহনবাবু। তোমরা তো আইজকালকার অ্যাম-এ বি-এ পাশ করনেওয়ালা সব আধুনিক পোলাপান। তোমাগো হাত দিয়া এমনতর হইব ক্যান্। দেখতো ভাল কইরা কি সব ইংরাজী লিখছ।—দরখাস্তখানা এগিয়ে দিলেন বড়বাবু।

উবু হয়ে পড়ল দরখাস্তখানার উপর। বিদেশী ভাষা—হয়ত বা অনবধানতা বশতঃ ভুলই করে থাকবে কিছু।

—ঠিক বুঝতে পারছি না তো কিছু।

বার বার পড়তে লাগল। কিন্তু নিজের চোখে কিছু তেমন একটা আবিষ্কার করতে পারল না।

—আচ্ছা বেশ। উপরালার কাছে পিটিশান লিখত্যাছ। স্বাধীন হওনের মানে কী বিনয় টিনয় জিনিসগুলা একদম উঠাইয়া দেওন। ইয়োর ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট না লিখলেও আসলে তো আমরা ওইডাই।

ঠিক কি বলতে চান বুঝবার জন্য কান খাড়া করে রাখল রঞ্জিত।

—ঠিক কি বলতে চাইছেন বলুন তো।

—আরে বাবা, ভাল কইরা একটু দেখ তো, বিনয়ের একটা বিন্দুবিসর্গ কোথাও নি আছে তোমার পিটিশানে। একটা ব্যাগ ফ্যাগ নাই, কিচ্ছু নাই।

চোখ কপালে উঠলো রঞ্জিতের। ব্যাগ! আকাশপাতাল হাতড়ালো। নাঃ বুঝতে পাচ্ছে না কিছু! অগত্যা জিজ্ঞাসা করল—ব্যাগ কি হবে,—পিটিশান কি বাজারের সদাই যে—

সে কথায় কান দিলেন না তিনি,—তিনটাই তো অক্ষর বি, ই, জি। উপরালাকে সম্বোধন করনের বেলা এই তিনটিমাত্র অক্ষর তোমাদের কলমের ডগায় বাইরায় না আজকাল? যতই বল বাবাজী, এ তোমাদের ফল্‌স্ প্রেষ্টিজ বোধ। বড়র কাছে ছোট হইবা—হ্যাতে আত্মসম্মানের কি আছে!

এই মুহূর্তকাল পূর্বেও ভাবছিল রঞ্জিত আপত্তি জ্ঞাপন করবে বড়বাবুর কিছু কিছু কথায় অন্ততঃ। কিন্তু ব্যাগের অর্থোদ্ধারের পর ধপ করে বসে পড়ল পরিত্যক্ত চেয়ারে। নাঃ এ মানুষের কাছে ওসব অর্থহীন।

দরখাস্তখানা ফেরৎ দিয়ে দিলেন আরও খানিক বকবক করা অর্থাৎ জ্ঞান দেবার পর। বললেন—ভাল কইরা বয়ানটয়ান দুরস্ত কইরা পিটিশান রিরাইট করার পর—আমার কাছে লইয়া আসবা। তখন বোঝলা বাবাজী, আমি নিজে সাহেবের লগে তোমার ক্যাস লইয়া ফাইট করমুনা?

নিরুপায়ের অবলম্বন মাদ্রাজী মাথা নাড়া। অর্থাৎ দুদিকেই ঘাড় সমানভাবে দুলিয়ে মনে মনে প্রার্থনা জানাল ভগবানকে—হে জগদীশ্বর এদের তুমি ক্ষমা কর।

সগৌরবে সম্মুখীন হওয়ার ঝাঁঝ এরকম দিগ্বিজয়ী মূর্খতার কাছে উবে যেতে

পথ পেল না। দরখাস্তখানা নিয়ে পকেটে পুরল। তারপর কোন রকম ওজর আপত্তি না করে সুড় সুড় করে চলে গেল বাইরে।

আর তা দেখে বড়বাবু নিজের মনে উচ্চারণ করলেন নিজেই—ওয়েট ক্যাট। তারপর নড়ে চড়ে বসলেন, একটা বিড়ি ধরালেন, দীপেশকে ডেকে আনলেন। কিন্তু তাকিয়ে থাকলেন অন্যদিকে ঘন ঘন পা নাড়াতে নাড়াতে। বললেন—উনানের পর ডাইলের উতল লাগা ছাখছ দীপ্যাশ।

—আজ্ঞে হাঁ।

—যুবক বয়সের ইস্পিরিট ঐ ডাইলের উতল লাগনের মত। মনে বাসনা কড়াই ছাপাইয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়া পড়ি আর কি।

—সে কথা আর বলতে বড়বাবু—দীপেশের মুখে চোখে সেই কৌতুকাবহভঙ্গী উঁকি মারতে লাগল।

—কিন্তু নতুন রাঁধুনী যারা হারাও এর মন্তর জানে। খুবই সহজ কিন্তু যেন সাপের মন্তর। আচ্ছা বলতো উতল লাগা ডাইলের উতল মারনের সে মন্তরটা কি।

—তাই তো, আপনার কাছে যা সহজ অন্যের কাছেও তা সহজ একথা কি করে যে আপনি ভাবেন বড়বাবু।—মাথা চুলকোতে চুলকোতে চোখ পিট্‌ পিট্‌ করতে লাগল সে।

ফোকলা গালের ভাঁজে ভাঁজে খুশী উদ্ভাসিত করে আজ রহস্য তাড়াতাড়িই মিটিয়ে দিলেন বড়বাবু—ব্যাপার কিন্তু কিছুই না। সামান্য এক ছিটা ত্যাল্। ব্যাস্। সাপের মত ফনা নামাইয়া—উতল মশায় পলাইতে পথ পাইবে না।

ভক্ত যেমন যুক্তিতে যুযুৎসু কসে বিশ্বাস বস্তুটিতে আস্থা স্থাপন করার লক্ষণ-যুক্ত গদগদভাব মুখে আনয়ন করে গুরুর পানে তাকিয়ে থাকে—অবিকল না হলেও খানিকটা তেমনি মুখভঙ্গী সহকারে তাকিয়ে থাকবার চেষ্টা করল দীপেশ।

বড়বাবুর গলা ফলে আরও বড় হবার আশ্বাস পেলো। বললেন—বিশ্বাস না হয় এ্যাক্সপেরিমেণ্ট কইরা দেখতে পার।

তারপর চশমার ফাঁক দিয়ে দীপেশের দিকে কটাক্ষ করলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। বললেন—যাউক গিয়া বাজে ঝামেলা। আই এ্যাম নাউ ভেরী ভেরী বিজি। এখনই আবার ছুটতে হইব বড় সাহেবের ঘরে।

—এই বয়সে এত কাজ কি করে যে করেন আপনি ভেবে পাই না।

—তবেই বোঝ। আমি বইসা আছি এইখানে—কিন্তু হোল কম্পানী

টু দাঁড়ান।—সেই পুরানো দিনের মত সহজভাবে ছুটে চলে গেল সীতা ভিতরে প্রজাপতির মত ডানা মেলে।

এই অবকাশে নিজের মনের মধ্যে হাতড়ানোর চেষ্টা করল রঞ্জিত। আসলে অভিমানই, একটা দুস্তর অভিমানের বাষ্পই প্রকারান্তরে মুখ খুলতে দিচ্ছে না বেচারাকে তেমন করে।

সচেতনভাবে প্রেম করার আর প্রেমে পড়ার প্রসঙ্গটা কেমন যেন আচমকা ঐ বিদ্যুৎ চমকের মতই একটা আলোড়ন সৃষ্টি করল।

লোকশাস্ত্র মতে, পুরুষের পক্ষে অভিমান ব্যাপারটা অশোভন—একমাত্র বৈষ্ণবীয় ব্যাখ্যা ছাড়া। আচ্ছা ওটাকে কী শুধু মেয়েলী বলাটা একপেশে মনোবৃত্তির পরিচয় নয়? না—প্রেমের আকর্ষণে অচেতনভাবে আত্মসমর্পণ অর্থাৎ প্রেমে পড়ার স্বাভাবিক উপসর্গ ওটা? আচ্ছা, তার ইচ্ছানিষ্ঠ প্রেম করার প্রচেষ্টাটা শেষ পর্যন্ত প্রেমে পড়ায় পর্যবসিত হয় নি তো?

বসেছিল রঞ্জিত চিরাচরিত স্থানে জানালার পাশে।

বাইরে অন্ধকার। জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট্ আসছে। হাওয়াও উঠেছে বেশ।

এক প্লেট খাবার আর কফি নিয়ে কে এসে সামনে দাঁড়ালো। আর একটা হারিকেন। নাঃ সীতা নয়—মা কমলা। মাংস রুটি প্লেটে।

—এসব আবার কেন—

—এমনিই। সীতার অনেকদিন থেকে ইচ্ছে, চাকরিতে ঢোকার পর থেকে তোমাকে খাওয়াবে একদিন।

—কিন্তু আমি তো কোন দিন খেতে চাইনি মাসীমা।

—খেতে কী বাবা মুখে ফুটে চাইতে হয়? পাশ করলো চাকরি পেলো—খাওয়া তো তোমার পাওনা। তাছাড়া কাল সকালের গাড়িতে রওনা হয়ে যাচ্ছে। আবার কবে সময় হবে ঠিক নেই।

—কাল রওনা হয়ে যাচ্ছে?

—হাঁ কাল সকালেই তো গাড়ি। হাসপাতালের কাজের পাট তো চুকিয়ে দিয়ে এলো আজ একেবারে। কেন তুমি জান না নাকি এসব?

—না হাঁ তা—আমতা আমতা করল রঞ্জিত।

কমলা প্রশান্ত হাসি হাসলেন একটুখানি।—আমি ভেবেছিলাম তুমি জান সব। কোলফিল্ডে একটা ভাল কাজ পেয়েছে।

—কোলফিল্ডের কাজ ?

হেসে ফেললেন কমলা—খাদ থেকে কয়লা কাটার কাজ নয়। যারা কাটে তাদের ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধান করার কি একটা কাজ। সেও তোমার হাসপাতালেরই মত।

—ক্রেসের কাজ বুঝি—

—ঠিক বলেছো। ইংরাজী নাম কিনা—কিছুতেই মনে রাখতে পারি না। সেই যে—তুমিও চেন—ওর একজন ডাক্তারবন্ধু আছেন। তিনিই ব্যবস্থা করে দিলেন। কে একজন মিঃ জাহাঙ্গীর কলকাতায় এসেছেন। ওদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারই খাদ। চাকরি, কিন্তু থাকবে নিজের লোকের মত। তাছাড়া এখানকার চাইতে উন্নতিও আছে কাজে।

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল রঞ্জিত। লক্ষ্য করলেন কমলা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন হঠাৎ কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত—সব ভাল করে খোঁজ খবর নিয়ে তবেই আমি অনুমতি দিয়েছি যেতে—তাছাড়া ছেলে থাকতেও মেয়ের রোজগারে খাওয়ার ভাগ্য নিয়ে যেসব মায়েরা জন্মায়—তাদের উপায় কি বল—

রঞ্জিত অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ল। চোখাচোখি হল কমলার সঙ্গে। কমলাও লজ্জা অনুভব করলেন কম নয়। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন—তুমি খাও আমি বরং পাঠিয়ে দেই সীতাকে—ওই ভাল বলতে পারবে সব কথা।

ঝড়ের বেগটা বাড়লো। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া সুরু হল।

কতক্ষণ চুপ করে বসে আছে—রঞ্জিত ঠিক জানে না। কি সব চিন্তা করতে করতে কোথায় ডুবে গেছে—তাও ঠিক মনে নেই।

সীতা সেই যে অন্দরে প্রবেশ করেছে—ওকে একা রেখে—ফেরার নামটি নেই।

পাশের ঘর থেকে মায়ের আলাপের রেশ কানে ঢোকার পর থেকে—রঞ্জিতের সম্মুখীন হতে ভয়ানক ইতস্ততঃ করছে সে।

বারংবার অজয় বসাকের কৃতজ্ঞতা পাশে বন্দী হওয়ার কাজটা কি সত্যি ভাল ? তাছাড়া বিদেশ বিভুঁই। একেবারে অপরিচিত পরিবেশ।

আত্মীয় স্বজন নেই কেউ কাছাকাছি। কয়লা খাদের ও ধরণের পরিবেশের কাজে অনেকে অনেকরকম ভয়ও দেখাচ্ছে বটে। কিন্তু তাছাড়া তার উপায়ই বা কি ছিল ?

মালতীদিকে পর্যন্ত সে গোপন করেছে প্রসঙ্গটা। মুখে থমথমে গাম্ভীর্য্য এনে, আর চাকরি করবে না সে—একথা বললেই যে মালতীর কাছ থেকে রেহাই পাবে এ ছিল ধারণার অতীত।

অবাক ব্যাপার ! মালতীদির ব্যবহারও কত পাল্টে গেছে মনে হয়। আগে অতটুকুতেই কি রেহাই দিতেন নাকি মালতীদি।

ঠিক কবে কখন সে ভাল চাকরির কথা বলেছিল অজয়কে মনে পড়ে না সঠিক। হয়ত আলাপের সূত্রে বলেই থাকবে। কিন্তু সেই সূত্র ধরে অজয় যে এরকম অবাক ভাবে সরাসরি চাকরির নিয়োগ পত্র নিয়ে হাজির হবে—এটা ছিল অপ্রত্যাশিত।

চাকরির সর্ত গুলো লোভনীয়। কাজ যাই হোক তার পক্ষে মোটা মাইনেই বেশ, তাছাড়া ফ্রি কোয়ার্টার, র‍্যাশন, বোনাস্ প্রভৃতির সুযোগ! শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারলো না সুযোগ। লোভই জয়ী হল।

দাদার খালাস পাওয়ার কথা শুনছে বটে। কিন্তু সেও তো অনিশ্চিত এখনও। দাদা খালাস পেলেই চাকরি বাকরি করার দিকে মনোযোগ দেবে—বিশ্বাস হয় না তার। বাবার যা শরীরের অবস্থা, তাঁর পক্ষে বিশ্রাম প্রয়োজন। এই শরীরে নিয়মিত চাকরি করতে হলে ক'দিন বাঁচবেন তিনি। এখানে গিয়ে চাকরিতে বসতে পারলে সে বাবা, মা সকলকে হয়ত ক্রমে ক্রমে নিয়ে যেতে পারবে নিজের কাছে। তখন মেয়ের পক্ষে একা বিদেশে থাকবার অসুবিধাও দূর হবে। বাবা বিশ্রাম পাবেন। মেয়ের রোজগারে খাওয়া সম্পর্কে মায়ের খুঁতখুতানি আছে একটু, সেটা কিছু নয়।

তখন মণিমা সম্পর্কে ঠিক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত হবে—সেটা অবশ্য এখনও ভেবে ঠিক করতে পারেনি সীতা।

আরও কত কি রঙীন চিন্তা কল্পনার পাখায় ভর করে মুহূর্তের মধ্যে তার চিত্ত অধিকার করেছিল, প্রভাবিত করেছিল ওকে নিয়োগপত্র গ্রহণ করার সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে। তাছাড়া বঙ্কিমের স্থান সীতার দ্বারা পূরণ হওয়া অসম্ভব, পিতামাতার কাছে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ তাঁর সামনে অবারিত। তার সামনে তখন অবারিত হবে ছেলেদের স্থান মেয়েদের দ্বারা পূরণ হয় না মেয়েদের এই দুরপনেয় কলংক ঘুচানোর সুযোগ।

সিন তৈরীর ব্যাপারটা সে ভয়ানক অপছন্দ করে। এর জন্য সে রঞ্জিতের সঙ্গে চরম, দুর্বিনীত ব্যবহারও করেছে অবশেষে। কিন্তু অজয় বসাক ডিপার্টমেন্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে রোগীদের দৃষ্টিতাপের সামনে বলল বিনিয়ে বিনিয়ে—ভাল চাকরি পেলে করবেন বলেছিলেন সেদিন, ধরুন কাল থেকে ভাল একটা চাকরিরনিয়োগপত্র আপনার হাতে এসে গেল—প্রস্তুত আছেন গ্রহণ করতে মিস্ সান্যাল? কৈ হজম তো করল বেশ নির্বিবাদে। ভাবতে অবশ্য মনটা খারাপ হল কিঞ্চিৎ। কিন্তু সে ক্ষণিকের।

সীতা উত্তরে বলল—বিড়ালের ভাগ্যে কি আর শিকে ছেড়ে মিঃ বসাক। আগে নিয়োগপত্র আসুক পরে ভেবে দেখব।

শুধু হজম করা নয়—মুখে হাসির আভাস এনে জবাবও করতে হল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। সে এতটা ভাবতেই পারে নি যে তৎক্ষণাৎ অজয় বসাক নিয়োগপত্র বার করবে পকেট থেকে। সে চেয়েছিল এড়াতে লোকটাকে তখনকার মত।

—এই আপনার নিয়োগ পত্র। পরশু মিঃ জাহাঙ্গীর রওনা হচ্ছেন কলকাতা থেকে। যদি এ চাকরি গ্রহণ করতে চান তার সঙ্গেই আপনাকে রওনা হতে হবে।

—মিঃ জাহাঙ্গীর কে?

—এখন থেকে আপনার মালিক। কাকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাজমন্ত্রী কলকাতায় এসেছেন। সেই উপলক্ষে এসেছিলেন। কাকার মারফৎ এই সুযোগটা ব্যবহার করলাম আপনার জন্য—

ঠিক বুঝতে পারল না তৎক্ষণাৎ কি জবাব দেওয়া উচিত। কিছুটা চুপ করে থেকে বলল—সো কাইণ্ড অব ইউ মিঃ বসাক, কিন্তু—এখানে থেমে গিয়ে কত কি যে চিন্তা করেছিল সে সব গুছিয়ে মনে আনতে পারে না আর। তবে এটুকু মনে আছে—সম্মতি জানিয়েছিল ঘাড় নেড়ে। আর ঘাড় নাড়ার জন্য যে ধাক্কাটা প্রয়োজন, সেটা যুগিয়েছিল অদ্ভুত একটা আবেগ। রঞ্জিত-প্রসঙ্গের একটা আবেগ ঘাড়কে ধাক্কা মেরে বাঁ দিকে নাড়িয়ে দেবার হাতুড়ীর কাজ করেছিল।

আর কিছু না হোক—রঞ্জিতের সঙ্গে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে—তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে বাইরে যাওয়া—ওর নাগালের সম্মুখ থেকে বাইরে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। দূরে, প্রয়োজন হলে অনেক দূরে।

এই কথাটা শেষের দিকে মনের মধ্যে ঝড় সৃষ্টি না করলে—অন্যান্য সকল বিবেচনাগুলোও শেষ পর্যন্ত ঘাড়টাকে ঝপ করে বাঁদিকে বাঁকিয়ে দিতে পারত কিনা—এ বিষয়ে তার ঘোরতর সন্দেহ আছে।

বসাক যেন প্রস্তুত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে হাণ্ডসেক করার ভঙ্গীতে ওর ডান হাতের মধ্যে হাত গলিয়ে চেপে ধরলো হাতখানা। বসাকের হাতের চাপের মধ্যে—বেশ অস্বস্তি লাগছিল তার।

—উইস ইউ গুড লাক।—তারপর আবার সেই কেতাদুরস্ত ভাষা—যাকে মালতীদি বলতেন—বলদ ভাষা।—অধীনদের নিমন্ত্রণ করবেন।—বলা বাহুল্য

অধীন একজন, গৌরবে এখানে বহুবচনে ব্যবহার করলেন বসাক।—না করেন যেচে নিমন্ত্রণ খেয়ে আসবো মাসে মাসে আপনার ওখান থেকে।

যতক্ষণ বলা শেষ না হল হাওসেকের হাত থেকে নিস্তার পেল না সীতা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত অস্বস্তি সইতে হল কয়েক মিনিট নিরুপায়-ভাবে।

বিরাট হলঘরের মাঝে একরাশ লোকের চোখের উপর দাঁড়িয়ে এই উচ্ছ্বসিত আলাপ—এখনও ভাবতে সংকুচিত হয় সে। এই ধরণের উচ্ছ্বসিত আলাপকে কি চোখে রোগীরা দেখে তা সে জানে। এই রোগীরাই সুস্থ হয়ে বাইরে যায়। ডাক্তার আর নার্সদের সম্পর্কে মনগড়া ঢলাঢলির কাহিনী সাধারণ্যে প্রচারিত হওয়ার আর দোষ কি।

এসব সেদিন হজম করল সে নির্বিবাদে। বলতে পারল না রঞ্জিতের প্রতি দুর্বিনীত ব্যবহারের মত কঠিন করে—চলে যান এখান থেকে।—খচ্ খচ্ করে পীড়া দিল মনকে এই কথাটা।

বসাক চলে গেল। মেট্রন হঠাৎ খাতির দেখানোর ভঙ্গীতে কানের কাছে এসে ফিস ফিস করলেন চোখ মটকে।

—কি সান্যাল। কার হাতে কে খেলছে বলতো ?

চোখ তুলে তাকালো সীতা। আরও অনেকগুলো চোখ বিঁধে আছে তাকে। খট্ খট্ করে জুতার শব্দ করে অশোভনভাবে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল সে রোগীর দিকে।

বৃষ্টি জমাট হয়ে উঠছে সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। মাঝে মাঝের দমকা হাওয়া একনাগাড়ে দমকা হাওয়ায় পরিণত হয়েছে।

জড়তা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়লো সীতা। অন্যমনস্কভাবে বসে আছে রঞ্জিত। সংকোচ আসছিল বড়। ঢুম্ করে উবু হয়ে প্রণাম করে বসলো রঞ্জিতকে। রঞ্জিত চমকে উঠে নড়ে বসলো। অবাকভাবে বলল—আরে একি, একি—আমাকে কি একটা পীর-টির পেয়েছো নাকি ?—

—প্রণামটা আগের ভাগে সেরে রাখলাম রঞ্জিতদা। পরে কথায় কথায় ভুল হয়ে যেতে পারে।

—তা এসবের মানে কি ?

—কাল চলে যাচ্ছি যে।

—সে তো শুনলাম।—আবার গম্ভীর হয়ে গেল রঞ্জিত। সীতা ওর গাম্ভীর্য

দেখে একটু দমে গেল। মনে মনে বলল—শুধু শুনলাম! আর কিছুই না? প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করল—চাকরিটা কেমন, কেমন করে চাকরিটা পেলাম, কত টাকা মাইনে, যায়গাটা একা একা থাকবার পক্ষে সুবিধাজনক কিনা—কিছুই জিজ্ঞাসা করার নেই আপনার?

ম্লানভাবে হাসল রঞ্জিত।

—না।—ছোট্ট উত্তর। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। সীতাও। দুস্তর অন্ধকারের মধ্যে হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলো। বাইরে ঝড়ের মত্ত দাপাদাপি। উভয়ের বুকের মধ্যেও যে ঝড়ের মত্ততা—তারও যেন তুলনা নেই।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বলল রঞ্জিত—দুর্যোগের যোগাযোগটা বড় অদ্ভুত।

কথাটার খাত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সীতা বলল—ঘরের মধ্যে কিন্তু দুর্যোগ লাগার ভয় নেই।

—যাদের ঘরের বার হবার সমস্যা আছে—তাদের তো আছে।

সীতা কথা দিয়ে কথাটার খাত পরিবর্তন করতে পারল না দেখে—কথা বন্ধ রেখে জানালার কপাট বন্ধ করল।

—একি একেবারে ভিজে গেছেন যে?

—ভিজতে কিন্তু মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে না, কি বল?

—থাক আর ভিজতে ভাল লেগে কাজ নেই। একটা অসুখ বিসুখ বাঁধিয়ে বসার সখ হয়েছে নাকি?

আবার চুপচাপ। দুজনেরই কথা মাঝে মাঝে ফুরিয়ে উঠছে কেমন যাচ্ছেতাই ভাবে। এরকমভাবে কথা ফুরিয়ে গেলে বিশ্রী লাগে। আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল রঞ্জিত—কালই যাচ্ছ তাহলে? আচ্ছা আগে বলনি তো কিছু?

সীতার একটা বোঝা নামল মনে হচ্ছে তার। দুষ্টুমী ভরা হাসি হেসে জবাব করল সে—এমনই পরিস্থিতি বলেও ঠিক বোঝাতে পারতাম না কিছু! আলোর চাইতে ধোঁয়াই যে সৃষ্টি হত বেশী রঞ্জিতদা।—একটু তির্যক করে চাইল।

কাঠ হয়ে গেল সকল ভাবালুতা রঞ্জিতের। চপেটাঘাত ফিরে পেলে যেমন রুক্ষ আর কাঠ হয়ে ওঠে মুখখানা বেদনায়।

রঞ্জিত উঠে পড়লো অকস্মাৎ—তাহলে পালাই, আজকের মত—

—এই বৃষ্টির মধ্যে?—বিস্ফারিত নেত্রে সীতা বাধা দিলো।

—বৃষ্টি ধরে উঠেছে। এরপর আবার চেপে আসলে, বেরুনো হয়ত আরও

মুস্কিল হবে। তাছাড়া মণিমাকে দেখতে যাইনা পাকা ছু'দিন। সেখানেও যাওয়া দরকার।

—ক্ষেপেছেন আপনি?—ঠিক যে ভঙ্গীতে রঞ্জিত পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল সেদিন সেই ভঙ্গীতে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সীতা।

টান হয়ে দাঁড়িয়ে গেল রঞ্জিত দরজার সামনে এসে বাধা পেয়ে। ছুমিনিট কি চিন্তা করল। বেশ জোর পাচ্ছে আজ সে নিজের মধ্যে। সীতার প্রতি যেটুকু ক্ষোভ সঞ্চিত হয়েছিল সেটুকু কেমন একটা প্রশান্তির মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। আগে হলে ঠিক কি করত সে জানে না। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে এই নারীর পথ আগলানোর এই আকর্ষণকে অবলীলাক্রমে তুচ্ছ করে চলে যেতে পারে।

বলল শান্ত এবং সমাহিত কণ্ঠে—মিথ্যে ছেলেমানুষী করা কি তোমার সাজে সীতা।

কণ্ঠস্বরে চমকে গেল সীতা। একেবারে অন্য কোন মানুষের স্বর। তবু বলল—কেন আমিও তো কিছু পীর নই—যে ছেলেমানুষীও করতে পারব না কখনও।—একপা এগিয়ে রঞ্জিত পূর্বের কণ্ঠস্বর অব্যাহত রেখে বলল—কাল তোমার গাড়ি কটায়?

এবার দরজার একপাটে পিঠ ঠেকিয়ে সংকুচিত হয়ে সরে দাঁড়ালো সীতা। মুহূর্তেক আগের বাচালতা তার লোপ পেতে বসেছে। একটা বোবা কান্না ঠেলে বেরুতে চাইছে দম বন্ধ করে। যে হাতের চেটোর মধ্যে হাত দিয়ে হাণ্ডসেক করেছিল অজয় বসাক সেটাও হঠাৎ ঠিক এই সময় অসম্ভব জ্বালা করতে শুরু করেছে তার। বাঁহাতে ডান হাতটা চেপে ধরে স্তব্ধের মত দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ ঝিম ধরে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে বলল ধীরে ধীরে—আমার উপর খুব চটে গেছেন মনে হচ্ছে?—কি কষ্টে যে কণ্ঠের স্বাভাবিকতা বজায় করলো তা সেই জানে।

হেসে ফেললো রঞ্জিত—চটবার কি দেখলে এরমধ্যে—

কোথায় একটা বাজ পড়লো। সমস্ত ঘরটা নড়ে উঠলো সে শব্দে। বিদ্যুৎ চমকের অতলস্পর্শী সন্ধানী আলোকের শিখায় ছুজন ছুজনের মুখ দেখল নতুন করে। মুখের প্রতিটি রেখার প্রতিটি ভাঁজের অনধীত অন্ধকার গুহাগুলি স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল উভয়ের চোখে। প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে এক মর্মস্পর্শী উপলব্ধি।

বজ্রাহতাকেও মুহূর্ত্তের আঘাতে পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখিতে যে নতুন সত্য আবিষ্কার করল—এক যুগের ঘনিষ্ঠতাও তা উদ্ঘাটন করতে পারেনি।

এক যুগের অভিজ্ঞতাকে এমনি করেই নস্যাৎ করে—বিশেষ এক একটা মুহূর্ত্তের উপলব্ধি। লক্ষহীরার জ্যোতিকে নিষ্প্রভ করে ধ্রুবতারা। তখন অভিভূত হয়ে হাত কামড়ানো ছাড়া গতি থাকে না।

নিশ্চল প্রতিমা বনে যায় সীতা। বক্ষস্পন্দন থেমে গেছে তার। রঞ্জিতের মত মানুষের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার সংকল্পে ঠিক এই মুহূর্ত্তেও সে দৃঢ়। অথচ তার সকল দৃঢ়তাকে পর্য্যুদস্ত করে কোন অজানা রাজ্য থেকে উঠছে একটা বিশ্রী শূন্যতা। শুধু শূন্যতা হলেও হয়ত সে পারতো।

স্যাঁতে স্যাঁতে আর ভিজে হাহাকারের একটা পচা আবেগ ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে পাক খেয়ে ফিরছে, বাষ্প হয়ে জমছে কণ্ঠনালীতে, চেপে ধরছে কণ্ঠনালী।

অবশেষে এই বিশ্বাসঘাতী আক্রমণের সঙ্গে মোকাবালা করতে সুরু করল বেশ সহজ ভাবেই—মনে হলো উৎরে যাবে ফাঁড়াটা ;—সেদিন হঠাৎ খুব খারাপ ব্যাবহার করে ফেলেছিলাম,—এই পর্যন্ত বলেই স্বরগ্রাম হঠাৎ উদ্বেল হয়ে ভেঙ্গে পড়ল খান খান হয়ে তার সকল ইচ্ছাকে পরাভূত করে।

—আমাকে তুমি ক্ষমা করো রঞ্জিতদা—আর পারল না বলতে। যা বলতে চায় গুছিয়েও বলা হল না সবটা। একটা গভীর লজ্জা এসে চেপে ধরলো। মুখের মধ্যে সেই জ্বালা ধরা হাতখানা ঢুকিয়ে দিয়ে উৎকট শব্দের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করতে করতে সে ছুটে চলে গেল ভিতরের ঘরে।

'তুমি' সম্বোধনের দিকে মনোযোগ বিদ্ধ হয়ে রইল রঞ্জিতের। একবার ইচ্ছা হল সেই প্রবচনটায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে। সেই·········কুতো মনুষ্যাঃ!

তার পর ধীরে ধীরে অল্পস্বল্প বৃষ্টির ছাট মাথায় করে নেমে দাঁড়াল।

আরও একটু রাত্রে বৃষ্টির সামান্য ছাটটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। বৃষ্টি ছেড়ে গেল। আর ছেড়ে গেল সীতার কাঁধের ভূতটা। সহজে কি ছাড়তে চায় ভূত। বহুক্ষণ ধরে ভূত ছাড়ানোর মন্ত্র একমনে জপ করতে করতে তবে রেহাই দিল ভূত। রঞ্জিতের প্রতি তার ঘৃণার মনোভাবটাকে জাগ্রত করার সেকি অপরিসীম চেষ্টা! অবশেষে একসময় মনে হল হাতের জ্বালাটা আর নেই। হাঁ সত্যই তো সে ঘৃণা করে—যতই না ঘনিষ্ঠতা থাক—ওরকম একটা নোংরা মানুষের পাওনা ঘৃণা ছাড়া আর কি হতে পারে।

অল্পক্ষণ আগের সন্ধ্যাটা যদি অন্য কেউ হত সে দস্তুর মত পাঠশালার বংশী

পণ্ডিতের মত নিষ্ঠুর ভাবে তাকে শাসন করতে পারত অবলীলাক্রমে। বংশী পণ্ডিত ঠিকই বলতেন—স্পেয়ার দি রড এ্যাণ্ড স্পয়েল দি চাইল্ড।

ঘৃণার পাত্রের সামনে যে শত্রু তাকে এমন করে বে-আব্রু করে—তার প্রতি বিন্দুমাত্র করুণা জাগে না আর! অথচ সে শত্রুটা তার ভিতরেই বাস করে। তাই বার বার কব্জা করতে গিয়েও অত সহজে ফস্কে পালায়। কিন্তু পারবে, একদিন সে তাকে কব্জা করতে পারবেই। এবং সে দিন বেশী দূরে নয়।

পরদিন সকালবেলা ষ্টেশনে তুলে দিয়ে আসার জন্য যথা বিহিত ভাবে অজয় এলো আর এলো তার গাড়ী। অদ্ভুত সোনালী রোদ্দুর উঠেছে। কে বলবে কাল রাতে বাদল নেমেছিল আর নেমেছিল ঝড়ো হাওয়া। কাল রাত্রের কোন মালিন্যই যেন আর অবশিষ্ট রাখতে দেবে না এ রোদ্দুর।

কমলা আর ভবভূতি দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মণিমার কাছ থেকে আগেই অনুমতি নিয়ে এসেছে সীতা। আজ মা বাবাকে প্রণাম করে অজয়ের পাশে গিয়ে বসল সে। এখন আর কোন মালিন্য তাকে স্পর্শ করছে না। অজয়ের গা ঘেঁষে বসে তার হাত জ্বালা করার স্মৃতিটাকে মনে হচ্ছে ভূতের গল্প। এই তো বসেছে সে অজয়ের গা ঘেঁষে। তার শাড়ীর পাড় মাঝে মাঝে অজয়ের কোটের সীমান্তে গিয়ে আলতো করে আছাড় খাচ্ছে মৃদু হাওয়ায়। কিন্তু কি হয়েছে তাতে! কতটুকু খোয়া যাচ্ছে তাতে! উঃ মাগো—এতদিনেও সংস্কারের ভূতটা নিঃশেষে তাকে রেহাই দিল না।

এই তো চলে আসার ক'টা দিন আগে অজয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কথা তুললেন মালতীদি। সেও শুনিয়ে দিল কড়া করে—শুধু আমার কেন মালতীদি, রুজি রোজগারের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন লোকের সংশ্রবে আসতে হবে তোমাকে, সমস্ত মেয়েকে। নিত্য নতুন লোকের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেকের জন্য এ হাত বাড়িয়েও দিতে হবে বারংবার। এ নিয়ে ওরকম অসূর্যম্পশ্যা মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতে গেলে—আধুনিক কালের মেয়েদের চলবে কেন?

কোথায় এত দিনে পথে চলবার অভ্যাসগুলো রপ্ত করে ফেলবে, সহজ আর সাবলীল হয়ে উঠবে তার ব্যবহার, তা নয় যত সব সেন্টিমেন্টের অসহ্য ভূত। আজ সকালের সীতা কাল সন্ধ্যার সীতার পানে তাকিয়ে রইল নির্ণিমেষে। অজয় তার শূন্য চাউনির দিকে তাকিয়ে বলল—মন খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে তো?

—কৈ না তো—

—মন একটু আধটু খারাপ হবেই একেত্রে।—হুস্ করে স্টার্ট নিল গাড়িখানা।

॥ সতেরো ॥

পায়রারাও পিন্ খুটে নিতে পারে। আয়নার মত এমন ঝকঝক করছে কারখানাবাড়ী। চাতাল আর পথ, দেয়াল আর দরজা, মেসিন আর মাল সব ফিটফাট।

শুধু ফিটফাট! ইয়া এক পালোয়ানকে গোঁফ কামিয়ে আর ঘাঘরা পরিয়ে নর্তকীর বেশে আসরে হাজির করার দিক থেকে আয়োজনের ত্রুটি নাই। রংএ আর ঢংএ, আবরণে আর আভরণে মুড়ে ফেলবার কী দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা!

লালশালু মোড়া বিরাট এক গেট উঠেছে প্রবেশ পথে। কোলাপ্‌সিব্‌ল ফটকের দারোগানী কাঠামোকে আড়াল করে আত্মপ্রকাশ করেছে—বিয়ে বাড়ীর এক বিরাট নহবৎখানা।

অঙ্গ সজ্জায় অসহ্য বাহাদুরী। লাল নীল সবুজ সোনালী ছত্রিশ রকম রং এর কাপড়ে কোথাও ঢেকে দেওয়া হয়েছে ইট বার করা দেয়াল, কোথাও টিনের বেড়া, কোথাও রাজ্যের স্তূপাকার জমানো জঞ্জালের পাহাড়। ফটক থেকে কারখানাঘর পর্যন্ত সুরকীর পা-রাস্তার মাথার ফাকা আকাশটুকু বর্ণবিভূষিত কাপড়ের আস্তরণে বন্ধ।

এক ইঞ্চি পুরু রুজচাপা গালের পালোয়ানী বার করা হাড়, কিম্বা কংকনে সাজা বাহুর পেশী বা আলতা পরা চরণকমলের অব্যবহিত উপরে অবস্থিত গোছের গুলির রুক্ষতা তবু যেন কিছুতেই চাপা পড়ছে না।

পাওয়ার ঘরের বিরাট উঁচু মিশকালো বর্ণের উলঙ্গ চোঙাটা তার জলজ্যান্ত নিশানা।

সকাল থেকে যেমন চলে—তেমনি পুরোদমেই—কাজ চলার কথা। কিন্তু আজ তেমন কাজ করছে না কেউ। সাহেবরা যখন তখন স্বর্গ থেকে মর্ত্যধামে ঘুরে যাচ্ছেন। ডেন্‌কিন্ সাহেব সর্বত্র খুটিয়ে দেখে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে বরকর্তার বেশে জগমোহন। গলা বন্ধ কোট আর পাকানো পাকানো ঘি রং-এর চাদর গলায়।

আজ যে সর্বত্র শিথিল ভাবে কাজ চলবে—এ যেন তাদের জানা কথা। তাই আসলে কাজ চলা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছেন না কেউ।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার চেষ্টা করে রঞ্জিত—অস্বস্তি এড়াতে।—আজকাল আপনি সীতা প্রসঙ্গে অকারণ এত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—যে ঠিক বুঝেই উঠতে পারি না আপনাকে সব সময়।

মণিমা ঠেস দিয়ে নিলেন দেয়ালে। নিরুত্তর হয়ে শুনলেন রঞ্জিতের কথা। —অথচ এতো দস্তুর মত সুসংবাদ। নারী প্রগতির বেশ বড় রকমের দৃষ্টান্ত। অন্তঃপুরবাসী নারীজাতি বাইরে বেরুক, নিজের পথ নিজে বেছে নিক, পুরুষের সমযোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত করুক নিজেদের, স্বাবলম্বী হোক, চাকরী করুক আরও বেশী বেশী সংখ্যায়—এতো আপনারও জীবন সাধনা। মায়েদের ক্ষেত্রে যা শোভন, মেয়েদের ক্ষেত্রে তা বাতিল করতে চান কেন বলুন তো ?

এই পর্যন্ত বলে রঞ্জিত তার বক্তৃতা থামালো। মণিমাকে কিছু বলার সুযোগ দেবার ইচ্ছা তার। মণিমা নিরুত্তর তবুও।

রঞ্জিত সুরু করল আবার—আর চাকরি করতে হলেই ভাল চাকরি মন্দ চাকরির প্রশ্ন আছে। কারণ ভাল করে বাঁচা আর মন্দ করে বাঁচা এর সঙ্গে জড়িত। অতএব ভাল চাকরি করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলে, ঘর ছেড়ে প্রবাস বাসের প্রশ্নও উঠবে কখনও কখনও। অবশ্য মানি—প্রবাসবাসের প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ জনের মনোবেদনার প্রশ্নে এনে হাজির করবে। কিন্তু তা বলে তো আর কিছু করার নেই।

মণিমা হঠাৎ ধমকের সুরে থামিয়ে দিলেন রঞ্জিতকে।

—বক্তৃতা থামাও তো রঞ্জিত। সীতার জন্য আমার এমন কিছু মনোবেদনা উপস্থিত হয়নি যে তোমাকে বক্তৃতা করে আমাকে সান্ত্বনা দিতে হবে।

—সন্তান চোখের আড়াল হলে যে-মায়ের মনোবেদনা উপস্থিত হয় না—তাদের স্নেহকে যে সন্দেহের চোখে দেখতে ইচ্ছে করে মণিমা। আপনি যখন বলছেন—আমি থামাচ্ছি বক্তৃতা। আমার কি ?—বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে রঞ্জিত অভিনয়ের মত করে বলল কথাগুলো।

কিন্তু কথাটা বিঁধল মণিমাকে।

কিছুক্ষণ পূর্বে সেই নিদারুণ বাজপড়ার ছবিটা যেন জাগ্রত হয়ে উঠল চোখের সামনে। আর একটা বাজপড়া জীবনের সূত্রপাত করবে নাকি আজ সন্ধ্যার এই বজ্রপাত।

রঞ্জিত আর ভবভূতির চেহারাটা যেন মিলে একাকার দেখাচ্ছে সেই বজ্রপাতের কল্পিত আলোয়। তারই প্রভায় উত্তেজিতভাবে বললেন—জান রঞ্জিত,

চিরটাকাল দেখে দেখে চোখ আমার পচে গেল। বেশ বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান ছেলে-গুলো পর্যন্ত মেয়েদের বোঝবার বেলা প্রকাণ্ড এক একটা ইডিয়ট সেজে বসে থাকে। মুখের দুটো কথার নজীর টেনে মন-বিচারের চুড়ান্ত হিসাব কষে ফেলে। এর বিহিত কি বলতে পার? সেকাল আর একাল এক্ষেত্রে কিন্তু একাকার।

মাথাটা ঝাকুনি দিয়ে নিল রঞ্জিত। ঠিক ঠিক শুনছে তো সে! কেমন সন্দেহ আসছে। জিজ্ঞাসা করল—আমায় কিছু বলছেন মণিমা?

—শুধু বলছি নয়, বোধহয় কিছু কঠিন কথাই বলছি তোমাকে। কথাগুলোকে নেহাৎ বেচারী মায়ের অসার বকুনি হিসাবে অগ্রাহ্য করোনা, বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়েই গ্রহণ করো।

এত অল্প সময়ের ব্যবধানে এতগুলো দম আটকানো পরিস্থিতি কার ভাল লাগে! অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে রঞ্জিত বলে—আপনার কথাবার্তা সত্যিই বুঝে উঠতে কষ্ট হচ্ছে মণিমা।

চোখের উপর সন্তানের—হাঁ সন্তানের বৈকি—কচি জীবন হয়ত বজ্রপাতে বিধ্বস্ত হতে চলেছে তাঁরই মত। অথচ তিনি অসহায়, কোনরকমেই সাহায্য করতে পারেন না। যত ভাবছেন তত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে মণিমার।

—তোমাকে আমার কথাবার্তার কিছুই আর বুঝতে হবে না বাবা।—হঠাৎ এমন করে কথাটা বলে উঠলেন মণিমা যে আর্তনাদের মত শোনালো।

ঘরপোড়া গরুর লাল মেঘ দেখে আঁৎকে ওঠার মত—একটা আর্তি তাঁকে আকুল করে তুলছে। তাঁর বাজপড়া জীবনের উত্তরাধিকার ছাড়া কিছুই কি দিয়ে যেতে পারবেন না হতভাগা মেয়েটাকে?

কিন্তু তাই বা কেন হবে। বজ্রপাতের আগুন কি তাঁকে অঙ্গার করতে পেরেছে নাকি। না বাজপড়াটাই তাঁর জীবনে একমাত্র সত্য! তাঁর জীবনের অমৃতটুকু বাদ দিয়ে বিষটুকুই মাত্র সীতার জীবনে সঞ্চারিত হবে—তারই বা কি অর্থ থাকতে পারে? নিশ্চয়ই হিসাবে ভুল করছেন তিনি।

উঠে দাঁড়ালেন মণিমা। খুব শান্ত অথচ স্নেহাতুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন অকস্মাৎ—কেবল শ্রদ্ধার দূরাসনেই নয়—বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠাসনেও যদি গুরুজনেরা ছেলেমেয়েদের কাছে প্রতিষ্ঠা পেতেন—পথ চিনে চলার কাজ কত সহজ হয়ে যেতে পারতো বলতো?

হাতের আন্দাজে হাত বাড়িয়ে রঞ্জিতের মাথার উপর হাত রেখে বললেন

এক লয়ে বাজিয়ে তোলার জন্য। ইস্পাত মানুষ নয়, রঞ্জিত তা জানে! কিন্তু ইস্পাতের সঙ্গে প্রেমেপড়া মানুষের চোখও তো তার নেই। তাদের চোখে ইস্পাত জীবন্ত মানুষের রূপ পরিগ্রহ করেনা—তাইবা সে হলফ করে বলবে কি করে! আর সেটা সত্য হলে—এই মুহূর্তে কে জানে শংকরের আত্মমগ্ন আত্মায় উদ্বেল হয়ে উঠছে কিনা—ইস্পাতের আত্মার স্পন্দনকে সমলয়ে ধ্বনিত করে তুলবার আকুল আর্তি। তা না হলে আত্মনিবেদন সম্পূর্ণ হবে কি করে! আত্মনিবেদন সম্পূর্ণ না হলে মালকাটায় সিদ্ধি আসবে কি করে শংকরের!

পাঁচুর মেসিনে গিয়ে দাঁড়াল মালবাবু। পাচুকে কিছু বলবার আগেই পাচু বলল—আপনি কি বলবেন আমি জানি।

—তুমিও থটরিডিং জান দেখছি অর্থাৎ মনের কথা শুনে বলে দিতে পার।

—তা অবিশ্যি জানি না। তবে এখন আপনার কি বলবার বাসনা জানি। জানব না! আমি কি ওস্তাদের মত অন্ধ! এ লাইনে আছি একযুগ। চাউনি দেখে ধরতে পারি কার মধ্যে কি।

—তাহলে তো তুমি দস্তুর মত গুণীলোক।

একথায় একেবারে কাদা হয়ে গেল পাঁচু।

—আচ্ছা তাহলে বলতো, তোমাদের ছোকরাবাবুর চাউনিতে কিছু দেখতে পাচ্ছ কিনা?

শংকরের অব্যাহত কর্মমগ্ন চেহারার দিকে তাকিয়ে একটু সবজান্তা হাসি হেসে নিল পাঁচু। তারপর বলল—তা আর পারি না! তবে পেরে আর কি করতে পারি বলুন। করতো আমার কাছে কাজ।—অন্যদিকে মুখ ঘোরালো। একসঙ্গে বেশী কথা বলার পর হাঁপানীর জন্য দম ঠেকে যায়। কিঞ্চিৎ সময় নেয় আবার দম নিতে। তারপর বলে মাথা নেড়ে—দেখছি তো—মেসিনের গা ছুঁয়েছে কি মরেছে ও ছেলে। তখন সাক্ষাৎ বাবা বিশ্বকরম এসে ভর করে দাঁড়ায়। এ আমি আপনার, বেশ লক্ষ্য করে যাচ্ছি কিছুদিন।

—লক্ষ্য করছ নাকি?

—লক্ষ্য করব না?—তারপর গলার স্বর নামিয়ে নিয়ে বলল—শুধু আপনাকে বলেই বললাম। এসব তো কারিগর জাতের বাইরে কাউকে বলার কথা নয়। আপনিও লক্ষ্য করুন না। তাকিয়ে দেখুন। হুঁস আছে ছেলের! লোহার সঙ্গে পীরিত বিশ্বকরমের দিষ্টি না থাকলে হয় না মালবাবু। লোহাকে জ্যান্ত নাগর মনে করে বাহ্যজ্ঞানলোপ করে তার সঙ্গে পীরিত করা—একি আপনি

চাড্ডিআলা কথা ভাবছেন? নইলে হাড় খাবে, মাংস খাবে, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে ছাড়বে না!—বলে নিজের শীর্ণদেহের দিকে নির্দেশ করে দমবন্ধ করে দাঁড়ালো।

অব্যাহত মনোযোগ এতক্ষণে শংকরের সম্পূর্ণ সংহত।

জ্যান্তনাগর। বেশ বলেছে পাঁচু। ভাষাটা অদলবদল করে সেই রঞ্জিতের ভাবনাটাই তো হুবহু।

কথার মারপ্যাঁচ ছাড়া তার এবং পাঁচুর চিন্তায় যে এরকম ষোলআনা মিল ঘটতে পারে রঞ্জিত ভাবেনি আগে।

অবশেষে একসময় পাঁচুকে বলে—তুমি অবশ্যি জান কি বলতে চাই আমি। তবু খুলে বলাই ভাল, তুমি মিলিয়ে দেখে নাও।

পাঁচু মৃদু মৃদু হাসে।

—ছোকরাবাবুকে এখন কেউ বিরক্ত করে বাধা না দেয় দেখো একটু। আর আমি যাচ্ছি বুদ্ধু ওস্তাদকে আগলাতে!

বুদ্ধু ওস্তাদের কথা উঠতেই পাঁচুর ভুল হয়ে গেল মিলিয়ে দেখার কথা। খপ করে লুপে নিল বুদ্ধু ওস্তাদ প্রসঙ্গ।

—বুদ্ধু ওস্তাদের কথা তুললেন তো বলি।—মহামুস্কিল! যখন শুরু করেচে পাঁচু, শুনতেই হবে শেষ পর্যন্ত।

—হরবখত দেখবেন লোকটাকে ইউনিয়নের ইষ্টিনাম জপ করছে। ঠিক বেশীমাত্রায় মালাটেপা বোষ্টমদের মত। আসলে কিন্তু লোকটার ভেতরটায় এই বুক অবধি ময়লা। নইলে বুঝছেন না? তুই ও এই পথের পথিক। জাত কারিগর। তোকে আগলাতে আজ কেন মালবাবুকে লাগবে র‍্যা? তুই চাউনি চিনিসনা—একথা বল্লে বিশ্বেস যাব আমি? ওকে যতি বিশ্বেস করবেন একটু বুঝেশুনে করবেন মালবাবু—এই বল্লাম একটা কথা।

অধিকাংশ কারিগরদের এই ঝোঁক দিয়ে দিয়ে কথা বলার ভঙ্গীটা বাস্তবিকই অনবদ্য লাগে রঞ্জিতের। ওজন করে কথাবলার অভ্যেস কম বলে— বাহুল্য কথায় ঠাসা ওদের কথার বুনুনী। আসল কথা খুঁজে নিতে অনেক সময় হয়ত ডুবুরীও নামাতে হয়। কিন্তু তবু ওদের অদ্ভুত রসজ্ঞান। এই পাঁচু, ওস্তাদ, নন্দ কাকে রেখে কাকে বাদ দেবে সে।

এই ধরনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অভিযোগ আর একান্ত কথার কিরিস্তি নিত্যই সে ঠায় দাড়িয়ে শোনে। প্রায় ছুঁচোগেলার মত আজও শুনছে, পাঁচুর কথা—ঠায় দাড়িয়ে।

অকস্মাৎ দুষ্ট গ্রহের মত কোথা থেকে একটা শূন্যতা এসে জুড়ে বসে। কিন্তু কাল? কাল থেকে এখানে ড্রপসিন।

ঠায় দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করে। আর ছুঁচো গিলতে হবেনা তাকে। পাঁচু, ওস্তাদ কারুর নয়।

ছুঁচোগেলার মনোভাব মুহূর্তে অন্তর্হিত হতে বসে। পাঁচুর ব্যাখ্যা করে করে কথা বলাকে মনোরম লেগে ওঠে আবার। তার চাইতেও মনোরম হয়ে বেজে উঠে ওস্তাদের আলাপের হিন্দীবাংলায় জগাখিচুড়ী ধ্বনিগুলো। ওস্তাদের মধ্যে আন্তরিকতা যেন আরও সবল, আরও ঋজু।

শংকরের মতন ওদেরই একজন হয়ে গোত্রচ্যুত হয়ে ওঠবার সামর্থ্য তার নেই। কিন্তু নিত্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁড়িকাঁড়ি কথা শোনাবার জন্য ওরা যে রঞ্জিতকে বাছাই করেছে সেজন্য ভিতরে ভিতরে একটা কৃতজ্ঞতা উপছে ওঠে। গভীর মমতার সঙ্গে পাঁচুর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখে। অনুভব করতে পারে একটা কামারশালার হাপর চলছে বেচারীর বুকের ভিতর। ঠেলে বেরুনো কণ্ঠার হাড়টাও হাতে ঠেকছে।

একযুগ ধরে এই লাইনে আছে পাঁচু। অর্থাৎ একযুগ ধরে লোহা ওর রক্ত মাংস শুষে শুষে ছোবড়া করে ফেলেছে, হাড়ের কাঠামোটায় এনে দাঁড় করিয়েছে। পাঁচুর কথাটাই কে যেন কানের কাছে আবৃত্তির মত করে শোনায়—লোহার সঙ্গে পীরিত সে কি চাড্ডিখানি কথা মালবাবু। হাড় খাবে মাংস খাবে, চামড়া দিয়ে ডুগ ডুগি বাজাবে।

কাঁধে হাত রেখে লোকটার প্রতি অদ্ভুত একটা মমতা সাবানের ফেনার মত ফুলে ফেঁপে এত বড় হয়ে ওঠে।

—ওস্তাদ কোথায় কোথায় ঘুরবে—হয়ত ধরতেই পারব না তাকে শেষটায়। এগিয়ে একটু দেখি, কি বল।—অনুমতি প্রার্থনা করার মত করে রঞ্জিত কথা বলে।

কৃতার্থ হয়ে যায় পাঁচু। কোমরে হাত দিয়ে বেল্টের বদলে দড়ি বাঁধা হাফ প্যান্টের কোমর উপরে টেনে তুলতে তুলতে উত্তর দেয়, নিশ্চিন্তে।

একসময় ওস্তাদের পাত্তা খুঁজে বার করল রঞ্জিত। কিন্তু মালবাবুকে দেখে ওস্তাদ ভাবলো নিশ্চয়ই মালের হিসাব। বলল, ছুকরা বাবু আছে মেসিনে। মালের হিসেবের রফা করে লিবে তো লিবে সিকেনে। রাজাকে না দেকে হামিলোক আর লড়চি নি হঁ—অ—অ।

—শোনই না ওস্তাদ। কথা আছে তোমার সঙ্গে। জরুরী কথা।

একপা বাড়িয়েই কথা বলছিল ওস্তাদ—কতা কি হবে? কাটায় কাটায় ইগারোটা বেজে তিশ মিনিট তক্ ওস্তাদ মাল কেটেছে—এর পর ফিন কতার কি হবে। বুকে হাত রেকে বলুক আজ কে কতক্ষণ মাল কেটেছে হুঁ—অ—অ! কোন কতার তোয়াক্কা নেই আকুন। আকুন ঘুরে ঘুরে হামি লোক একটু দেকে লিবে সব। আর হাওয়া ভি খেয়ে লিব থোড়া— বলে হিহি করে হাসল উজবুকের মত।

রঞ্জিত একদিকে থেকে নিশ্চিন্ত। কাজেই ঘাঁটাল না ওস্তাদকে।

কারখানা বাড়ীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে আসতে ঘণ্টা কাবার হয়ে যায় অথচ টের পাওয়া যায় না।

বাংলোটাকে পরিণত করা হয়েছে ডিনার অথবা টি পার্টির হলে। রাজা পদার্পণ করলে চা এর দ্বারা সম্ভবতঃ তাঁকে এখানে আপ্যায়িত করা হবে। তার পাশে একজিবিশন ঘর খোলা হয়েছে একটা। মাননীয় অতিথিকে দেখানোর জন্য এখানে এনে হাজির করা হয়েছে কারখানার কাজকর্মের নমুনা। স্থানটা সাহেব সুবোয় গিজগিজ করছে।

প্রায় ভোরবেলা থেকেই—কারখানাবাড়ীতে পুলিশ পড়েছে। শত শত পুলিশ বাহিনীর লালপাগড়ীপরা লোক চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে রেখেছে কারখানাবাড়ী। পাঁচিলের এপাশ থেকেও দু'চারটা চলন্ত লালমাথা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

রঞ্জিতও ঘুরতে বেরিয়েছিল একটু। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। দেড় ঘণ্টা কাবার প্রায়। শংকরের দেড় ঘণ্টায় নামানোর হিসাব মনে পড়ল! শংকরের ব্যাপারে তার অবশ্য দায়িত্ব নেই কিছু। তবু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রায় ছুটে চলল ভাইস্ শপের দিকে।

কারখানাবাড়ীর মধ্যবর্তী প্রধান সুরকীর রাস্তাটার দুধারে সারা কারখানার লোক ভেঙ্গে পড়েছে। আফজলকে দেখা যাচ্ছে। কয়েকবার মাথা গলিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টার পর বিরক্তিসহকারে পেছিয়ে এল আফজল। একটু উঁচু জায়গা দেখে দাঁড়ালো তার উপর।

রঞ্জিতের সঙ্গে মুখোমুখি। আফজল হাসলো। ডিঙি মেরে উঁচু হয়ে দেখার চেষ্টা করল।

—আসছেন নাকি কেউ?—আফজলের কাছে জিজ্ঞাসা করল রঞ্জিত।

—উহুঁ আসবো আসবো করত্যাছে!—নেমে দাঁড়ালো আফজল। বোঝা গেল সুবিধা হচ্ছে না।

এবার সত্যিই ফাঁকা লাগছে সমস্ত শপ। মাথার উপর অবিশ্রান্ত ঘুরে চলেছে শ্যাফট। আর তার সঙ্গে লট্‌কানো চাকাগুলো চক্কোর খাচ্ছে সমানে। বিভিন্ন মেসিনগুলোয় কাজ করার কেউ নেই। ঠিক যেন সেই রূপকথার রাজপুরীর চেহারা।

সি শার্পে সা তোলাই আছে। কিন্তু আসল সুরের সাক্ষাৎ নেই। বিশটা মেসিন থেকে বিশ রকম শব্দবৈচিত্র্যের ঝঙ্কারের অভাবে সুরসঙ্গত জমছে না।

পাঁচু তার কথামত শুধু আসর জাগিয়ে রেখেছে। আর বাবা বিষকরমের চাউনি মেসিনের গায়ে বিদ্ধ করে—ষ্টিয়ারিং হুইলে মোচড় মারছে ধীরে ধীরে শংকর—কখনও এদিকে কখনও ওদিকে।

রঞ্জিতে পাঁচুতে দৃষ্টি বিনিময় হল।

—বাবা বিষকরমের ভর ছাড়াতে রোজা লাগবে নাকি?

জিভ কাটল পাঁচু।—নাগর একবার যতি জ্যান্ত হয়ে ওঠে—পীরিত কী অত সহজে চটতে চায়—মালবাবু। এগিয়ে দেখুন না স্বচক্ষে।

রঞ্জিত এগিয়ে গেল। ঠিক পিছনে এসে দাঁড়ালো। ডিজাইনের কাগজটার সঙ্গে মিলাচ্ছে মালের সদ্যকাটা বডিটা। সদ্য-প্রসূত বৎসের সর্বাঙ্গ লেহন করার সময় গাভীর চোখে যেমন বাৎসল্য ও বন্যতা একই সঙ্গে এসে মেশে—তেমনই একটা আদিম বন্য বাৎসল্যের উদ্ভাস শংকরের আচরণে। বারংবার জুট দিয়ে পরিষ্কার করছে বডিটা। তাতেও তৃপ্ত না হয়ে ফুঁ দিয়ে ঝাড়ছে বারংবার। আবার মিলোচ্ছে।

পেছন থেকে রঞ্জিত সন্তর্পনে আর ভয়ে ভয়ে কাঁধে হাত রাখলো শংকরের। কার হাত লক্ষ্য করার বিন্দুমাত্র গরজ না দেখিয়ে পত্রপাঠ এক ঝট্‌কায় ঠেলে ফেলে দিল হাতখানা। পর মুহূর্তেই আবার কি মনে করে তাকালো পেছনে। —মালবাবু আপান, আমি ভাবলাম—জিভ কাটল।

—মালবাবু কি আজও হাতের মাল পয়মাল করল নাকি!

—কি যে বলেন—সলজ্জ উত্তর দিল প্রথম। তারপর বলল মাথা নেড়ে—আজ জানেন, মানে এই হাত—দাঁতে ঠোট কামড়ে ভিতরের উচ্ছ্বাস বন্ধ করল—এই হাত আর কি।

কথা বলতে এরকম ঠোক্করের খাওয়ার সঙ্গে রঞ্জিতের পরিচয় আছে।

—হাঁ হাঁ এই হাত।

—এই হাত আর কি, মানে এই হাত। যাকে বলে একদম কাঁটায় কাঁটায়

ঠিক। কোন ফাঁক পাবেন না।—হিহিকরে হেসে হাতের শীর্ণ কব্জিটা উঁচু করে ধরল।

হাত বাড়িয়ে হাতখানা নিজের হাতের চেটোর মধ্যে চেপে ধরল রঞ্জিত। পাঁচু এগিয়ে এসে বলল—দেকি।—বডিটা শংকরের হাত থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিল সে। তারপর ফেরৎ দিয়ে দিল শংকরকে একটু নেড়ে চেড়ে দেখে। গম্ভীর হয়ে বলল—তা হাত তো তোমার বাপু, বেশ ভালই! তবে কতা কি জান—কলির এখনও সন্ধ্যে। এতো সবে পয়লা এষ্টেজ। সবে বডির কাজে হাত পাকৃলো। এরপর কতরকম এষ্টেজে হাত পাকিয়ে তবে একটা পুরো মাল—একটা পুরো কারিগর। আর মালের ও কি অবধি আছে নাকি আজকাল। এই লাইন এখন হচ্ছে অগাধ সুমুদ্দুর। যত নামবে তত জল, যত নামবে তত জল। তবে তুমি পারবে ছোকরাবাবু—কেন না তোমার চাউনি আছে।—হাতের বডিটা খাঁকি প্যাণ্টের পকেটে রাখল শংকর সন্তর্পণে।

রঞ্জিত প্রায় একাগ্র হয়ে পড়েছিল পাঁচুর বর্ণনা শুনতে শুনতে। অকস্মাৎ শংকরের মেশিনে স্টার্টার গর্জন করে উঠলো শুনে তাকিয়ে দেখলো। শংকর আবার মেসিনে। জিজ্ঞাসা করল—আবার মেসিন কি হবে শংকর।

ঘুরে দাঁড়ালো সে। বাঁ হাতে হ্যাণ্ডেলটা ধরা আছে তার। সেই সলজ্জ ভাঁজটা যেন উঁকি দিচ্ছে আবার নাকের দুকোল দিয়ে।

—জানলেন—মানে, ঠিক এই হাত, এই মাল কেটেছে,—বিশ্বেস করুন বিশ্বেস আসছে না কিছুতেই। মানে ঠিক জোর পাচ্ছি না আর কি।

রঞ্জিতকে এবার সত্যিই হেসে ফেলতে হল। পাঁচুও তার ঝিঙের বিচির মত দাঁত বার করে বলল—মাথা নেড়ে—নতুন নতুন ওরকম মনে হতেই হবে।

—অ, এবার কি তাহলে বিশ্বেস আনার চেষ্টা?

মাথা নীচু করল বেচারা।—আরও দু' দুশখানা কেটে দেখব ভাবছি। মানে হাতটা ঠিক বিশ্বাসী কিনা।

—বিশ্বাসী কিনা!—শংকরের কথার মানে বোঝাই দায়। রঞ্জিতের এরকম কণ্ঠস্বরে কেমন একটা সন্দেহ জাগল শংকরের। বলল—ঠিক বোধহয় বোঝাতে পারছি না আপনাকে।—কেশে গলা সাফ করে আরও পরিষ্কার আরও উচ্চৈঃস্বরে জানাল—মানে, যত কাটব, তত সেট্ হবে হাত। আর তত হাতের উপর বিশ্বেসের জোরও বাড়বে হুহু করে।

এবারকার কথার মধ্যে ঠেক্‌-খাবার ভাব নেই তেমন। শংকর নিমেষে ঘুরে

দাঁড়ানো মেশিনের মুখোমুখি। মনে হচ্ছে ওস্তাদের সমস্যা, রাজার সমস্যা, কারখানার এই পরিবেশের সমস্যা—তার চিন্তার কোন অতলে তলিয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে কখন রাজা এসে গেছেন ওরা জানে না। রাজদর্শনের আকাংক্ষায় যারা ভিড় করেছিল কারখানা ঘরের জঠর খালি করে—তাদের অনেককে ফিরতে দেখা যাচ্ছে।

আফজল ফিরছে। ঠাণ্ডারাম, নন্তু, ওস্তাদ, এদের পাত্তা নেই সারাদিন।

—দর্শনলাভ হল রাজার?

—বহুত কষ্টে। আরে দূর—রাজা তো না য্যান্ খয়দি।

—কয়েদী?

—কই কি! আগে পাহারা, পিছে পাহারা, পাশে পাহারা। নিথুচি করছে অমন রাজা হওনের। হার চেয়ে খয়েদখানার খয়দিরও ঢের সুখ।

একথার উত্তর কিই বা দেবে রঞ্জিত। শুধু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল—তা কয়েদাই বলতে পার একরকম।

—বলতে ফ্যারি মানি!—একশবার বলতে ফ্যারি।—এরকম আত্মপ্রত্যয়ের সুরে কথা বলতে বড় একটা দেখা যায় না আফজল মিঞাকে।

আফজলের মুখের কথা শেষ হতে না হতে হাঁপানীর রোগী পাঁচুকে ছুটতে দেখে রঞ্জিত ঘুরে দাঁড়ালো। দূরে শংকরের মেসিনে একটা জটলা। চারদিক থেকে ধীরে চলা লোকগুলোর পা হঠাৎ ত্রস্ত হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে।

পাঁচু থামলো এসে রঞ্জিতের সামনে। তারপর হাঁপালো দুমিনিট।—এক্সিডেণ্ট মালবাবু।

—এক্সিডেণ্ট!—কার?—বুকটা ধড়াস ধড়াস করে উঠল।

—আর কার? ছুকরাবাবুর।

—হঠাৎ?

—আপনিও চলে আসলেন আর আমিও একটু চোখ ঘুরিয়েছি—ব্যাস্।

রাজদর্শন মাথায় উঠলো রঞ্জিতের। ও শংকরের মেসিনের পাশে এসে যখন দাঁড়ালো—অচৈতন্য শংকরকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে একটা স্ট্রেচারে। ঠাণ্ডারাম আর নন্তুর হদিস পাওয়া গেল এতক্ষণে। খবর বেশ রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে। হৈ হৈ করে লোক ছুটে আসছে চারিদিক থেকে। কিছু লোক ভিড় হটাতে লেগে গেছে। সাহেবরাও হয়ত এসে পড়বেন কিছুক্ষণের মধ্যে।

ভিড় ঠেলতে ঠেলতে ওস্তাদ কখন এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে মালবাবুর পাশে।

বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। মালবাবুকে দেখেই স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতার সঙ্গে উত্তেজনা প্রকাশ করল সে।

—এই যে মালবাবু। তোমাদের ভদ্দর আদমীদের মনের কতা কি হামিলোক হেকিমী দাওয়াই করে খেয়ে লিব। হঁ-অ-অ।—তারপর ঘাড় বাঁকাতে বাঁকাতে স্ট্রেচারের কাছে পৌঁছানোর জন্য ব্যস্তসমস্তভাবে আবার অগ্রসর হলো ভিড় ঠেলতে ঠেলতে।

নাঃ যতটা গুরুতর মনে হয়েছিল—ততটা গুরুতর নাও হতে পারে আঘাত। রক্তের চিহ্ন নেই কোথাও। কোমর থেকে বগল পর্যন্ত জামাটাসহ চামড়া বেশ থেথ্‌লে গেছে। স্থানে স্থানে বিশ্রী সাদা চামড়া বেরিয়ে পড়েছে। সামান্য রক্ত ঠিক ঘামের মত গড়াচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে।

—দেখছেন কি। তেপ্‌খুনি যতি না নজর পড়ত, আর চোখের পাতা পড়বার আগে যদি না এস্টাট বন্ধ করতাম—এসে দেখতেন মানুস নয় রক্ত মাংসের একটা পিণ্ডি।—তাকিয়ে দেখল পাঁচু বলছে।

—কি করে হলো এমন?

—লোহালক্কড়ের পীরিত বড় কাঁচাখেকো পীরিত মালবাবু। বেহুঁসিয়ার হলে আর রক্ষে নেই। নজর দিতেই দেখি বাঁ-ধারের জামার ধারটা কখন ধরে লিয়েছে বেল্ট। আর পত্তরপাঠ আকর্ষণ করতে লেগে গেছেন উন্মত্ত নাগরের মত। উঃ দেখা যায় নাকি সে দিশ্য।—চোখ বুজলো পাঁচু।

রাজা কোনদিক দিয়ে এলেন আর কোনদিকে গেলেন খেয়াল করবার ফুরসৎ পেল না কেবল তিনটি প্রাণী। রঞ্জিত, ঠাণ্ডারাম আর শংকর।

ডাক্তার অভয় দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। বললেন—শকটই প্রধান। গুরুতর কিছু নয়। এক সপ্তাহেই ঠিক হয়ে যাবে। তবে এক সপ্তাহ কম্‌প্লিট রেষ্ট।

তারপর কোম্পানীর এ্যাম্বুলেন্সে করে শংকরকে তার বস্তিঘরের চাতালে—বামুনদির গার্জিয়ানির এক্তিয়ারের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত সোয়াস্তি পেল না ঠাণ্ডারাম আর তার সঙ্গে রঞ্জিত।

এ্যাম্বুলেন্সের পেছন পেছন নন্ত এলো ছুটতে ছুটতে। ফটক খুলবার অপেক্ষায় কিছুক্ষণ দাঁড়াল গাড়ি। শংকরের একপাশে রঞ্জিত বসেছে। বাইরের দিকে মুখ। নন্ত ভিড় ঠেলে রঞ্জিতের মুখোমুখী এসে উপস্থিত একেবারে। বলল —বলেছিলাম কিনা মালবাবু!

মালবাবু অন্য কথা ভাবছিলেন।

আবার বলল নন্ত—বলেছিলাম কিনা ভূত আর রাজা এক জাতের। ভূতও ঘাড় মটকায়—

রঞ্জিতের মনে পড়ে গেল বটে কথাটা। পাদপূরণ করার মত করে বলল—আর রাজাও—

শংকরের জ্ঞান ফিরে এসেছে অনেকক্ষণ। শুয়ে শুয়ে কথাটা শুনে এক-টুকরো পাংশু হাসি হেসে ফেলল সে।

শংকরকে পৌঁছে দিতে গিয়ে বামুনদিদির যেটুকু চাক্ষুষ পরিচয় লাভ হল—তাতেই চক্ষু চড়কগাছ রঞ্জিতের।

গন্‌গনে তাপে চড়ানো খালি কড়াইয়ের মধ্যে জলের কোঁটা পড়ার প্রতিক্রিয়ার মত গর্জন করে উঠলেন বামুনদি শংকরকে দেখে।—হ্যাঁরে ঠাণ্ডা, তোরা কি সিংহের পাঁচ পা দেখেছিস নাকি?

ঠাণ্ডারাম ঘরে নিয়ে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিলো শংকরকে। তারপর সেখান থেকে ধীরে সুস্থে জবাব ছুড়লো বামুনদির উদ্দেশে,—গ্রামোফোনে পিন্ চড়লো বুঝি।

বামুনদির কিন্তু শংকরের কাছে গিয়ে দেখবার বিন্দুমাত্র গরজ দেখা গেল না। তার ঘরের দেড়হাত বারান্দা থেকে দেড়গুণ গলা চড়িয়ে—ঠাণ্ডারামকে উদ্দেশ করলেন,—ভেবেছিস্ মরা মেরে বামুনদিকে খুনের দায়ে ফাঁসাবি—সে গুড়ে বালি। একটা জ্যান্ত মানুষকে রুগী তৈরী করে—ফেলে দিয়ে দেখ্‌গে না নিজের মাগের কাছে। বামুনদি তো পরের মাগ।

ঠাণ্ডারাম্ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো দূরত্ব বজায় রেখেই—কে বল্‌ছে বাপু তোমাকে রুগীর গায়ে হাত দিতে।

কে শোনে ঠাণ্ডারামকে। অব্যাহত বামুনদির গলা। রঞ্জিতের মনে হতে লাগলো পালাতে পারলেই ভাল হয়।

—কে বল্‌ছে! প্রায় ভেঙ্গিয়ে ওঠার মত করে বামুনদি বললেন।—বলবি কিরে, বয়ে গেছে আমার। ও রুগী কাঠি দিয়ে যদি আমি ছুঁয়েছি তো আমার নাম মিথ্যে।

শংকরকে উপজীব্য করে বামুনদির এহেন বচনবিন্যাসে শংকরের হাত পা সেঁধিয়ে যেতে লাগলো বিছানায় শুয়ে শুয়ে!

ডাক্তার অবশ্য অভয় দিয়ে বলেছেন—সেরে উঠতে এক সপ্তাহের বেশী

লাগবে না। চোটটা মুখ্যতঃ বাহ্যিক। ধাক্কায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল মাত্র। কিন্তু তার সম্পূর্ণ বাম অঙ্গ বেদনায় যে রকম বাম হয়ে আছে—তাতে বিশ্বাস কি!

এরপর যত কম সময়ের জন্যই হোক, আর যত গুরুতর কারণেই হোক, সেই অনুগৃহীত হয়ে, সম্পূর্ণ পরনির্ভর হয়ে পড়ে থাকবার লাঞ্ছনারই তো রকমফের। মন খারাপ হয়ে ওঠে।

—কেমন বোধ করছ এখন—ঠাণ্ডারাম জিজ্ঞাসা করলো।

—ভাল—শংকর ডানদিকে আরও একটু ঝুঁকে শোবার চেষ্টা করল চোখ ঢেকে।

রঞ্জিত আর ঠাণ্ডা বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। নিজ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন বামুনদি। সেখান থেকেই তার নিশানা পাওয়া যাচ্ছে।

বাইরের ঘেঁসঢালা পথের উপর উঠে রঞ্জিতকে বিদায় দেবার সময় ঠাণ্ডারাম বলল—ভাগ্যিস আপনাকে দেখেননি বামুনদি। একটা অচেনা ভদ্দরলোকের ছেলে বিনা নোটিশে বাড়ীতে ঢুকেছে জানলে—বাব্বা।

এই বামুনদি সম্পর্কে এইটুকু ছাড়া বিশেস কিছু জানে না রঞ্জিত। তবু জানতে চাইল না কিছু। শুধু হাসল বিচিত্রভাবে।

ঠিক পৃথিবীর সমতলে দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে নাই বা দেখলো। তবু এই যে উড়োজাহাজে চড়ে আকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখছে সে—যতীন মিত্তির স্বীকার করুক আর নাই করুক—এরও এক ধরনের মূল্য আছে। সমতলে হয়ত পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি বাড়ে, কিন্তু আকাশেও তো সমতল অপেক্ষা দৃষ্টিশক্তির সীমানা অধিক প্রসারিত হয়।

যতীন মিত্তির তো অনেক কিছুই স্বীকার করে না। এই যে চাকরি ত্যাগের প্রসঙ্গ—এটাও কি সে হৃষ্টমনে গ্রহণ করতে পেরেছে?

শুনে যতীন শ্লেষ করে জিজ্ঞাসা করল—বিবেক ত্যাগের এক্সপেরিমেণ্টটা—এমন মধ্যপথে শেষ করছ যে—

শ্লেষের জবাব শ্লেষেই দেয় সে।

—সেটা সত্যিই আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কারণ যেটুকু এক্সপেরিমেণ্ট করার সুযোগ পেয়েছি—তাতে একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই—বিবেক ত্যাগের মত মহৎ আত্মত্যাগ আর কিছুই হতে পারে না। দেহত্যাগের যন্ত্রণাও এর কাছে শিশু। অথচ দধীচি থেকে তোমাদের ক্ষুদিরাম পর্যন্ত আত্মত্যাগের শ্রেষ্ঠ সার্টিফিকেট পেয়ে আসছে দেহত্যাগে।

যতীনের গোঁফের ফাঁকের হাসি কিঞ্চিৎ প্রসারিত হল একথায়। ছদ্ম-গাম্ভীর্যের আড়ালে সে হাসি অবশ্য পর মুহূর্তেই লুকিয়ে ফেলল সে, বলল—আরও যুক্তি আছে কিন্তু তোমার পক্ষে। ধর দেহ অপেক্ষা বিবেক বড়—এটা হ'ক কথা। অতএব যুক্তিশাস্ত্র মতে বড় জিনিস ত্যাগের মূল্য ছোট জিনিস ত্যাগের মূল্য অপেক্ষা নিশ্চয়ই বেশী।

রঞ্জিতকে হেসে ফেলতে হল। এবং যতীনকেও সঙ্গে সঙ্গে।

সে সব কথা থাক। বেশ পরিশ্রান্ত রঞ্জিত। অথচ একটা মুক্তিও যেন অবাধে পাখা মেলতে পারছে এখন। সখের নাটকের শেষ ড্রপসিন পড়বার পর যেমন পরিশ্রান্ত মনে হয় নাটুকেদের। আর অভিনয়ের ভালমন্দ বিচার অপেক্ষা সেই মুহূর্তে প্রবল হয়ে ওঠে মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্যবোধ। দীর্ঘ দিন ধরে ধারন করা একটা গুরুদায়িত্বের বোঝা থেকে নিষ্কৃতির এক অপূর্ব স্বাচ্ছন্দ্য।

বিদায় নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রঞ্জিত। তারপর ছুটে চলার মত লম্বা লম্বা করে পা চালিয়ে দিল। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না।

নেশায় আচ্ছন্নের মত ঘুমিয়ে পড়েছিল শংকর। অনেক রাত্রে আধোঘুম আধোজাগরণের মধ্যে মনে হল তার—মা এসে বসেছেন তার পাশে। মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। উঃ কতদিন সে মাকে দেখে না। বাঁ দিকটা বেদনায় অক্ষম। তাই ডান হাত দিয়ে চেপে ধরলো মার একখানা হাত।

মাথা হেলিয়ে মায়ের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে গিয়ে দেখল মায়ের স্নেহ করুণ মুখখানা অস্পষ্ট হয়ে গেল। স্নেহমুগ্ধ স্থির দৃষ্টি মেলে ধরেছে অন্য এক-খানা ঘনিষ্ঠ মুখ।

কেমন একটা খট্‌কায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে চাইল শংকর। দরজা খোলা। বাইরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি আর বাবুপুকুরের শান্ত জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদ।

মাঝে মাঝে বাতাস তরঙ্গ তুলছে জলে। এক চাঁদ খান খান হয়ে কেঁপে কেঁপে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে জলময়। বৈরাগী বাবা কোথায় চলে গেছে। তবু তার একাকী এক তারার টুং টাং সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়াও সে শুনতে পাচ্ছে যেন।

হঠাৎ ডান হাতের কনুই হাফপ্যান্টের ডান পাশের ভারী পকেটে একটা ঠোকা খেল। মনে পড়ে গেল মালের বড়িটা রেখেছিল পকেটে। সেটা অটুটই আছে।

হাতখানা নাড়তে গিয়ে অনুভব করল—স্বপ্নের চেপেধরা দক্ষিণ হস্ত তেমনিই চেপে ধরে আছে আর একখানা হাত।

বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়া জ্যোৎস্নার মোহবিস্তার করা আলোয় শংকর অবাক হয়ে দেখল—মা নয়, বেবীও নয়, মুখখানা বামুনদির। পা ছড়িয়ে মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বসে বসে দিব্যি ঘুমুচ্ছেন তিনি।